Dhaka University Institutional Repository

ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা

(Spiritualism in Persian Literature)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
চেয়ারম্যান
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোছাঃ নাজমুন নাহার
এম. ফিল গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা

(Spiritualism in Persian Literature)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোছা: নাজমুন নাহার

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

তারিখ: জুন ২০২১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

শিরোনাম	**পৃষ্ঠা নম্বর**
প্রত্যয়নপত্র	iv
ঘোষণাপত্র	v
প্রথম অধ্যায়	১
ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি	২-১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	১১
আধ্যাত্মিকতা: উৎপত্তি ও বিস্তার	১২-৬৬
তৃতীয় অধ্যায়	৬৭
ফারসি সাহিত্য: বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য	৬৮-১০৪
চতুর্থ অধ্যায়	১০৫
ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা: সূচনা ও প্রসার	১০৬-১৪০
পঞ্চম অধ্যায়	১৪১
বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদ-সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাব	১৪২-১৯০
ষষ্ঠ অধ্যায়	১৯১
উপসংহার	১৯২-১৯৬
গ্রন্থপঞ্জি	১৯৭-২০৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম. ফিল গবেষক মোছা: নাজমুন নাহার কর্তৃক *ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা (*Spiritualism in Persian Literature*)* শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি মোছা: নাজমুন নাহার-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম হিসেবে রচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম রচিত হয়নি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটি পুরোপুরি পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ও

চেয়ারম্যান

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি মোছা: নাজমুন নাহার এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, *ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা (*Spiritualism in Persian Literature*)* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভটির কোনো অংশ কোথাও সনদ লাভ বা প্রকাশের জন্য জমা দিইনি।

(মোছা: নাজমুন নাহার)

এম. ফিল গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৭০/২০১৪-২০১৫

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা

(Spiritualism in Persian Literature)

সার-সংক্ষেপ (Abstruct)

অতীন্দ্রিয়বাদ বা অধ্যাত্মবাদ মানবমনের এক সহজাত প্রকৃতি। আর সাহিত্য হলো মানুষের মনোজাগতিক অনুভূতির নান্দনিক প্রকাশের প্রকৃষ্ট এক মাধ্যম। ফারসি সাহিত্যে রয়েছে অধ্যাত্মবাদের স্পষ্ট প্রভাব। যার ফল, ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী ধারার সাহিত্যকর্মে প্রকাশ পায়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে ফারসি সাহিত্যে বিশেষত এর কাব্যধারায় রচিত হয়েছে এক বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভার (যেমন– মসনভি, তাযকেরাতুল আউলিয়া, পান্দনামে ইত্যাদি)। যে অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যসম্ভার ফারসি সাহিত্যকে করেছে সমাদৃত ও পরিচিত; একইসাথে তা এ সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ এবং একে পৌঁছে দিয়েছে উৎকর্ষের শীর্ষে ও বিশ্বসাহিত্য সভার অতি উচ্চমার্গে।

অধ্যাত্মবাদের প্রভাবে ফারসি সাহিত্যের এই বিশ্ববিস্তৃত পরিচিতি ও সমাদরের অংশ হিসেবে বাংলা সাহিত্যেও রয়েছে এর চর্চা ও কদর। বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের চর্চা ও কদরের মূলে ইসলামি অধ্যাত্মবাদী ভাবধারাই কাজ করেছে। কেননা, ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী ধারার সাহিত্যকর্মগুলোতে ইসলাম ধর্মের মর্মবাণীরই প্রকাশ দেখা যায়। মূলত পারস্যে ইসলামি সভ্যতার সূচনাই এর প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী ধারার রচয়িতাগণ ছিলেন মুসলিম পারিবারিক আবহে লালিত ও শিক্ষিত; তাই তাঁদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনে এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। আর তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্মগুলোও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে যেমন ছিল আল্লাহপ্রেম ও শরিয়ত পালনের প্রকাশ; তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্মগুলোও ছিল তেমনই। বঙ্গীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রচারক মুসলিমদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী ধারার সাহিত্যকর্মগুলো এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে এক বিস্তৃত স্থান দখল করতে সক্ষম হয়। মূলত, ইসলাম প্রচারক মুসলিম সাধকগণ এ অধ্যাত্মবাদী ফারসি সাহিত্যকর্মগুলোকে ইসলাম প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী হিসেবেই নিয়ে আসেন এবং তাঁদের সে উদ্দেশ্য সফলও হয়। এ অঞ্চলে ফারসির সর্বজন গ্রহণযোগ্যতার প্রেক্ষাপট উত্তরকালে যখন এ ভাষা রাজ-ভাষার মর্যাদা পায় তখন তা হয় এক 'মাইলফলক'। যার ফলে, এতদঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ সর্বত্রই এর প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আর এরই মাধ্যমে সুদূর পারস্যের অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যের ধারা এ অঞ্চলে নতুন করে চর্চা ও আলোচনার বিষয় হতে শুরু করে; যা একইসাথে ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী ধারার বিস্তৃতির অনন্য প্রকাশ হিসেবে কাজ করে এবং অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যেও সৃষ্টি হয় ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত বিভিন্ন ধারা (যেমন– সুফি সাহিত্য, মরমি সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য ইত্যাদি); যা বাংলা সাহিত্যে এনে দেয় প্রভুত সমৃদ্ধি। আর এর মাধ্যমে উভয় ভাষার সাহিত্যের মাঝে সৃষ্টি হয় সুদৃঢ় মেলবন্ধন; যা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

'ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা' শিরোনামে রচিত এ থিসিসে ইরানিয় সাহিত্যে সুফিতাত্ত্বিক সাহিত্যের পাশাপাশি উপরিউক্ত বিষয়াবলি বিশ্লেষিত হয়েছে।

মোছা: নাজমুন নাহার
এম. ফিল গবেষক
রেজি. নং ৭০/২০১৪-২০১৫
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি

অতীন্দ্রিয়বাদী বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি মানব হৃদয় ও আত্মার সহজাত, চিরন্তন ও অনির্বচনীয় এক অনুভূতি; যা প্রতিটি মানুষ সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে স্বীয় সত্তা, আত্মা ও হৃদয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আর অনুভূতির প্রাবল্যে যখন তার আত্মা ও হৃদয় এ আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, তখন তার হৃদয়ে এ গূঢ় রহস্যমণ্ডিত অনুভূতির রহস্যভেদপূর্বক স্বীয় হৃদয়ে প্রশান্তি প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিন্তু তার এ ব্যাকুল হৃদয় বুঝতে সক্ষম হয় না যে, তার এ যন্ত্রণাকাতরতার চিরস্থায়ী প্রশমন কেবল পবিত্র সত্তা মহান রাব্বুল আ'লামিনের সন্নিধ্যান লাভেই নিহিত রয়েছে। কেননা, মানব আত্মা বা রূহ এর সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আ'লামিনের হুকুমের মধ্য হতে অন্যতম একটি হুকুম। এ রূহ আল্লাহর কাছ থেকেই আগত এবং তা পুনরায় তাঁর কাছেই প্রত্যাগত হবে। আর প্রকৃতপক্ষে, এ প্রত্যাবর্তনেই রয়েছে পরম প্রশান্তি ও চিরস্থায়ী মুক্তি। এ জাগতিক জীবনে আগমনের পূর্ব আবাস্থল 'রূহের জগত'-এ সে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও দর্শন লাভে প্রশান্তিময় এক জীবন অতিবাহিত করেছে। যেখানে পবিত্র রব এবং তাঁর হুকুমে রূহের অধিকারী হওয়া মানবাত্মা এক সূত্রে গাঁথা ছিল। কিন্তু, জাগতিক জীবনে আগমনের ফলে পবিত্র আত্মা মহান রব ও মানব আত্মার এ বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর তাই, মানব আত্মা তার জাগতিক জীবনে সে বন্ধন ছিন্নতার ব্যাকুল করা ব্যথা ও যন্ত্রণাই তার হৃদয়ে অনুভব করে।

প্রতি যুগেই, বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতায় কিছু মানুষের উদ্ভব ঘটে; যারা এ অনির্বচনীয় আত্মিক প্রশান্তি লাভের নিমিত্ত নিরত চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারে নিজের জীবনকে ব্যাপৃত করে থাকেন। যারা জাগতিক জীবনে এ ধরনের ত্যাগ ও সাধনায় রত থেকে মহান আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'য়ালার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেন তারা অধ্যাত্মবাদী সাধক হিসেবে অভিহিত হন। বিশ্বের খ্যাতনামা ও প্রসিদ্ধ অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকদের মধ্যে রয়েছেন হযরত হাসান বাসরি (র.), হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র.), রাবেয়া বাসরি (র.), ইবনুল আরাবি (র.), হযরত শাহ মখদুম (র.) প্রমুখ। তাঁদের প্রভাব ও অনুকরণে উত্তরকালে তাঁদের যোগ্য অনুসারী হিসেবে আবির্ভূত হন পারস্য তথা ইরানের আবু সাঈদ আবুল খায়ের, হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.), মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (র.), মাওলানা ফরিদুদ্দিন আত্তার নিশাবুরি (র.), হাফেজ শিরাজি, আশেকে রাসুল আল্লামা আবদুর রহমান জামি প্রমুখ। পারস্যের এসব প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক কবিগণ তাঁদের জীবনের আধ্যাত্মিক অনভূতিগুলোর লিখিতরূপও দান করেছেন। ফলে, পারস্যের সাহিত্য জগতে সৃজিত হয়েছে এক বিশাল ও সমৃদ্ধ কাব্য ভাণ্ডার। আর এই কাব্যের রতভাণ্ডার হতে তাঁদের পারসিক আধ্যাত্মিক কাব্যকর্ম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনূদিত হওয়ায় সেসব দেশের

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সম্ভারও হয়েছে সমৃদ্ধ। একই সঙ্গে তৈরি হয়েছে হাজারো ভক্ত-অনুরাগী ও অধ্যাত্মবাদী ধারার সাহিত্যপ্রেমীর; যারা পারস্যের আধ্যাত্মিক কাব্য-কর্মের নির্মাতা কবি-সাহিত্যিকদের অতীন্দ্রিয়বাদী সাধনার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা হতেই তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকেন। আর, ফারসির মতো এক সুমিষ্ট ভাষা এর বাহন হওয়ায় সে ভাষার প্রতিও স্বভাবতই সেসব ভক্ত-অনুরাগীদের হৃদয়ে অনুরাগের অনুরণন হয়ে থাকে।

ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যকর্মের মূলে রয়েছে ইসলামের প্রভাব। প্রকৃতপক্ষে, পারস্যে ইসলামি সভ্যতা ও শাসনের পত্তনই এর প্রধান কারণ। ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক সাহিত্যকর্মগুলোর মূল সারমর্ম পবিত্র কুরআন ও হাদিস হতেই লব্ধ। মুসলিমগণ ইসলাম প্রচারার্থে পারস্যে অবস্থান করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণকারী পারসিক কবি-সাহিত্যিকদের অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যের ভাবরস দ্বারা প্রভাবিত হন।

শুধু তাই নয়, ফারসি মতো মিষ্টি-মধুর ভাষায় রচিত এসব অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যকর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য সহায়ক হওয়ায় তাঁরা এসব সাহিত্যকর্ম প্রচার ও প্রসারেও ভূমিকা রেখেছেন। ইসলাম প্রচারের অংশ হিসেবে এ উপমহাদেশে আগমনকালের প্রাক্কালে ইসলাম প্রচারক সেসব মুসলমানদের বিরাট একটি জনগোষ্ঠী পারস্য তথা ইরানে অবস্থান করার ফলে; তাঁদের ওপর থাকা পারস্যের ফারসি ভাষায় রচিত আধ্যাত্মিক সাহিত্যকর্মের প্রভাব এতদঞ্চলের মানুষের মাঝেও বিস্তার লাভ করে। আর এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীও তা সাদরে গ্রহণ করে। ফারসি সাহিত্যের প্রভাব বঙ্গীয় সাহিত্যকেও সমভাবে প্রভাবিত করে। ইসলাম প্রচারক মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং কালক্রমে তাঁদের নির্দেশে ফারসি এ অঞ্চলের রাজ-ভাষা হয়ে ওঠায় এ ভাষার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও এর সাহিত্যরীতি এ অঞ্চলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। যার প্রভাব বর্তমানকাল পর্যন্তও পরিলক্ষিত হয়। সুদূর অতীত হতে বর্তমানকাল অবধি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবপ্রসূত হয়ে বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠেছে এক সুবিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার; যা কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও ধারা। ফলে, রচিত হয়েছে অনেক গ্রন্থ। আবার, ফারসি গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে বাংলার অনুবাদ সাহিত্যও হয়েছে সমৃদ্ধ ও উন্নত; যা এতঞ্চলে ফারসির প্রভাবপূর্ব সময়ে ছিল অনুপস্থিত। বঙ্গীয় অঞ্চলে সুদীর্ঘসময় ধরে ফারসি রাজ-ভাষা থাকার সুবাদে এ অঞ্চল, ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ফারসির এক সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে। এরই ফলস্বরূপ এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে ফারসি সাহিত্যের প্রতি সহজাতভাবেই রয়েছে অপরিসীম আগ্রহ। শুধু বাংলায় নয়, ফারসি'র সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্যের কারণে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রয়েছে এর অনুরাগী। বিশেষত অধ্যাত্মবাদী ও মানব কল্যাণমুখী সাহিত্যের দরুণ এর খ্যাতি অবিসংবাদিত।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গীয় অঞ্চলের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ভাষাভাষী পাঠক, লেখক, আলোচক, গবেষক এবং ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ এবং এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি পরিচিত তুলে ধরাই আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আলোচ্য গবেষণার শিরোনাম '*ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা*' নির্ধারণ করা হয়েছে। ফারসি ভাষার একটি বিশাল অংশ জুড়ে থাকা এ অধ্যাত্মবাদী ধারা সম্পর্কে এ অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত অনুরূপ শিরোনামে আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোনো মৌলিক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। আর এ অভাব পূরণার্থেই এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের প্রয়াস পেয়েছি। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি এবং উপসংহারসহ মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে মূল বিষয়বস্তু ও আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে । অধ্যায়গুলো হলো-

১. ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি

২. আধ্যাত্মিকতা: উৎপত্তি ও বিস্তার

৩. ফারসি সাহিত্য: বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৪. ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা: সূচনা ও প্রসার

৫. বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদ-সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাব

৬. উপসংহার

অভিসন্দর্ভের শুরুতেই গবেষণাকর্মের তত্ত্বধায়কের প্রত্যয়নপত্র, গবেষকের একটি ঘোষণাপত্র সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি অভিসন্দর্ভের শেষাংশে সংযোজিত রয়েছে। '*ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি*' শিরোনামের প্রথম অধ্যায়টিতে অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে সারসংক্ষেপ অলোচনা স্থান পেয়েছে। একইসাথে ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা, ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী রচনার মূল উৎস ইসলাম এবং ফারসি সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বঙ্গীয় অঞ্চলে ফারসি সাহিত্যের অনুপ্রবেশ এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও ফলাফলও আলোচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্বাচন, অভিসন্দর্ভ রচনা এবং তা সফলভাবে সম্পন্ন করার প্রাথমিক প্রেক্ষাপট, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং অভিসন্দর্ভ রচনার নানা কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়াও যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর সেটি হলো অভিসন্দর্ভের অধ্যায় পরিচিতি যা প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এর মাধ্যমে পুরো অভিসন্দর্ভের একটি রূপরেখা (outline) সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়টি '*আধ্যাত্মিকতা: উৎপত্তি ও বিস্তার*' শিরোনামে রয়েছে। এতে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয়, অধ্যাত্মবাদের বৈশিষ্ট্য ও সাধনা, অধ্যাত্মবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেবা ও আধ্যাত্মিকতা, অধ্যাত্মবাদে মেহমানের সেবা ও খিদমতের স্বরূপ, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সৃষ্টির সেবা, অধ্যাত্মবাদে সৃষ্টির সেবার আওতা ও পরিধি, আধ্যাত্মিকতা ও সৃষ্টির সেবার ব্যাপকতা, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, মাখলুকের খিদমত ও মানবদেহের যাকাত আদায়, সমন্বিত ব্যক্তি মানস গঠনে অধ্যাত্মবাদ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, সুফি শব্দের উৎপত্তি, তাসাউফ বা সুফি শব্দের উৎস, সুফি শব্দের প্রথম ব্যবহার, তাসাউফের তাত্ত্বিক জ্ঞান, তাসাউফের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের স্তর প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষন স্থান পেয়েছে। অধ্যাত্মবাদ তথা ইলমে তাসাউফ ইসলামের মৌলবাণী কুরআন ও হাদিসের আলোকে পরিশুদ্ধ চিন্তা-পদ্ধতি ও জীবনাচরণের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন ও মানব কল্যাণে প্রভাব বিস্তারের দ্বারা শান্তিময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণে; ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও ইবাদত লাভে জীবনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং বর্তমান বস্তুবাদী সমাজ-সভ্যতার যুগেও যে এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য সে সম্পর্কে আলোচনা ও তথ্যবহুল বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা তুলে ধরাই এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে '*ফারসি সাহিত্য: বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য*' শিরোনামে সাহিত্য কী, এর আলোচিত সংজ্ঞাসমূহ, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয়, ফারসি সাহিত্যের বিস্তৃতি, বিকাশ ও উৎকর্ষ, ফারসি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণ, যথা: হামাসে (প্রাচীনতার দিক থেকে-সনাতন বীরত্বগাথা, সাহিত্যিক বীরত্বগাথা, পরবর্তীকালের বীরত্বগাথা; বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে-রূপকথার বীরত্বগাথা, বীরদের বীরত্বগাথা, ধর্মীয় বা মাযহাবী বীরত্বগাথা, আধ্যাত্মিক বীরত্বগাথা প্রভৃতি), গীতিসাহিত্য (যেমন: রোবাঈ-প্রেমধর্মী বা প্রাচীন রোবাঈ, মরমী বা আধ্যাত্মিক রোবাঈ, দার্শনিক রোবাঈ; দোবেইতী, কাসিদা, গযল, মসনভি, তারকীববান্দ, তারজীবান্দ, কেতয়া', মুসাম্মত, মুফরাদ, মুস্তাযাদ প্রভৃতি), শিক্ষামূলক সাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, ইরানি গল্পসাহিত্য (যেমন: প্রেম ও গীতিধর্মী গল্প, সুফিবাদী ও আধ্যাত্মিক গল্প, বীরত্ব ও সাহসিকতার গল্প, ধর্মীয় ও মাযহাবী গল্প, ব্যঙ্গাত্মক গল্প, দার্শনিক ও প্রতীকী গল্প, লোকজ বা সর্বজনীন গল্প, বাস্তবধর্মী গল্প বা বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী, মাকামে গল্পসম্ভার, উপমাধর্মী গল্প-কাহিনী) প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য নির্ভর আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

ফারসি সাহিত্যের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণসমূহের মধ্যে আধ্যাত্মিক ধারার সাহিত্যকর্ম ও রচনাসমূহের ওপর বিশেষভাবে আলোচনা করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ফারসি সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় অধ্যাত্মবাদের মর্মকথা ও উপাদানের উপস্থিতির বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো '*ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা: সূচনা ও প্রসার*'। এ অধ্যায়ে ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার সূচনা, ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ, প্রসার ও বিকাশ, আবু সাঈদ আবুল খায়ের (মৃত্যু ৪৪০ হি. / ১০৪৮): আধ্যাত্মিক দর্শন ও রুবাঈ (আবু সাঈদ আবুল খায়েরের জন্ম ও বংশ পরিচয়, আবু সাঈদের আধ্যাত্মিক জীবন ও দর্শন, আবু সাঈদের জীবনাবসান, আবু সাঈদ আবুল খায়েরের আধ্যাত্মিক রোবাঈ), শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার (মৃত্যু ৬২৭ হি./ ১২২৯ খ্রি.): আত্মদর্শন ও কাব্যবৈশিষ্ট্য (শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের জন্ম ও পরিচয়, ফরিদুদ্দিন আত্তারের জীবনাবসান, আত্তারের শিক্ষা, ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্মিক দর্শন ও সাহিত্যকর্ম), মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (মৃত্যু ৬৭২হি./ ১২৭৩ খ্রি.): আত্মাদর্শন ও কাব্যবৈশিষ্ট্য (রুমির জন্ম, শৈশব, জ্ঞানার্জন ও পারিবারিক জীবন, রুমির পিতৃআসন লাভ, আধ্যাত্মিক জীবন ও দর্শন এবং সাহিত্যকর্ম, রুমির ইন্তেকাল) আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম '*বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাব*'। এ অধ্যায়ে বঙ্গীয় অঞ্চলে অধ্যাত্মবাদ এবং মুসলিমদের প্রবেশ ও প্রভাব, বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব (মুসলিমদের বঙ্গবিজয় ও ফারসি চর্চায় ভূমিকা, মুসলিমদের বঙ্গবিজয় পরবর্তীকালে ফারসি চর্চা এবং বাংলা উপাখ্যান ও অনুবাদ সাহিত্য, ফারসি সাহিত্যের প্রভাবপ্রসূত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন: বাংলা রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান, মর্সিয়া সাহিত্য, দোভাষী বা পুঁথি সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, সওয়াল সাহিত্য; আঠারো ও ঊনিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসির অবস্থান, বিশ শতক ও তৎপরবর্তীকালে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় কবি-সাহিত্যিকরা), বঙ্গীয় অঞ্চলে ফারসি সাহিত্যের সূচনা, বিকাশ ও বিস্তৃতি (ইরানিদের ভারত শাসন ও মুসলিমদের সিন্ধু বিজয়, মুসলিম শাসকদের আমলে ফারসির চর্চা ও বিকাশ যেমন: গজনবী আমলে ফারসি চর্চা, ঘোরী রাজত্বকালে ফারসি চর্চা, সুলতান অব দিল্লীর শাসনকালে ফারসির চর্চা ও বিকাশ যথা: মামলুক রাজত্বকালে ফারসি চর্চা, খলজি আমলে ফারসি চর্চা, তুঘলক রাজত্বকালে ফারসি চর্চা, লোদী ও সাদাত শাসনকালে ফারসিচর্চা; মোঘল ও নবাবী আমলে ফারসি চর্চা, ইংরেজ আমলে ফারসি চর্চা, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ফারসি চর্চা) সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ অধ্যায় '*উপসংহার*' শিরোনামে রয়েছে এবং এর মধ্য দিয়েই '*ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা*' শীর্ষক শিরোনামে রচিত বর্তমান অভিসন্দর্ভটির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এতে বর্তমান গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফলাফল বর্ণনা করা ছাড়াও বর্তমান সময়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও নিজস্ব অভিমত, বাস্তবমুখী বক্তব্যসহ বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে। আশা করা যায়

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াসটি বাংলা ও ফারসি ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং গবেষণার নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে অভিসন্দর্ভে তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতির পর সূচক নম্বর ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে সূচক নম্বর অনুসারে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ের পর তথ্যসূত্র ও টীকা সংযোজিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত এ তথ্যসূত্র ও টীকা অংশ থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের লেখকের উপনাম ও মূলনাম, গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, স্থানের নাম, প্রকাশের সাল এবং পৃষ্ঠা নম্বরসহ বিস্তারিত বিষয়ে অবহিত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষাংশে সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে লেখকের উপনাম ও এরপর মূলনাম, গ্রন্থের নাম, প্রকাশনার স্থান এবং সবশেষে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও সাল উল্লেখ করা হয়েছে। বানান রীতির ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত চলিত বাংলা বানান রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি, উর্দু উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূল গ্রন্থকে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচিত বিষয়ের বোধগম্যতার নিরিখে সহজতা, সাবলীলতা ও সহজবোধ্যতার প্রয়োজনে বিভিন্ন কবিতা, কুরআনের আয়াত ও হাদিসের বাংলা অর্থের সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণাকর্ম সম্পাদনার্থে বিভিন্ন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সমালোচক ও গবেষকের ভাষ্য, উদ্ধৃতি ও বক্তব্যের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

বিস্তৃত ও সারগর্ভ আলোচনায়পূর্ণ বর্তমান অভিসন্দর্ভটিতে প্রতিটি অধ্যায়েই ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতির বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রয়োজনে বাংলা, ফারসি, ইংরেজি ও উর্দু গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ফারসি ভাষার মৌলিকত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা। গবেষণার এ পদ্ধতিটি ইতিহাস ও বিশ্লেষণধর্মী। অর্থাৎ ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি, ফারসি সাহিত্যে এর প্রভাব এবং ফারসি সাহিত্যের প্রভাবপ্রসূত বাংলা সাহিত্য ও এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি ইতিহাসের আলোকে বর্ণনা করা।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের লাইব্রেরি, বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরির গ্রন্থাবলি ব্যবহারপূর্বক তথ্য অনুসন্ধানের প্রয়াস পেয়েছি। এসকল

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের সহযোগিতার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করত ইন্টারনেট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট-এ আমার শিক্ষকগণের (বিশেষত অধ্যাপক শামীম বানু ও অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার), ঢাকাস্থ ইরানি কালচারাল সেন্টারে পার্শিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের শিক্ষকগণের, আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; যাঁদের হাত ধরেই আমার ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার হাতে-খড়ি।

আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় এম.ফিল তত্ত্বাবধায়ক ও দীক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন স্যারের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা ও অন্তরের অন্তঃস্থল হতে পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। যিনি সদাসর্বদা আমার গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষত, এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে ব্যক্তিগত জীবনের কোনো পর্যায়ের কোনো সমস্যা বা বাঁধা-বিপত্তিও যাতে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেসব বিষয়েও তিনি সর্বদা সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। ঢাকাস্থ ইরানি কালচারাল সেন্টারে পার্শিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে অধ্যয়নকালে আমি তৎকালীন কোর্স শিক্ষক হিসেবে আমি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন স্যারকে পেয়েছিলাম। স্যার খুবই যত্ন সহকারে ফারসি শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি ফারসি ভাষা শেখার ব্যাপারে আমার আগ্রহের প্রশংসা করেন এবং আমাকে অধিকতর উৎসাহ দান ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে আমার ফারসি শেখার পথকে সহজতর করে তোলেন। আর স্যারের সেই উৎসাহ সবসময় আমার কাছে 'দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহের স্মরণিকা' হিসেবে কাজ করে। এমনকি যখন ভিন্ন একটি দেশের ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের কাঠিন্য আমার মনে নিরুৎসাহের উদ্রেক ঘটাতো তখন স্যারের 'দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহের স্মরণিকা' আমাকে আঁধারে আলোর মশাল হয়ে পথ দেখাত। আর সেই পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যিনি আমার কাছে 'আলোকবর্তিকাতুল্য' তাঁকে আমার গবেষণার তত্ত্বধায়করূপে পাওয়া আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের। আর মুসলিম হিসেবে ফারসি সাহিত্যের সঙ্গে ইসলামের সাযুজ্য লক্ষ করার পর থেকেই আমার মনে এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, অধ্যয়ন ও গবেষণার বাসনা কাজ করতে থাকে। এ লক্ষ্যে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালেই এম.ফিল গবেষণার 'সিনপসিস', প্রশ্নপত্র ও বইপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। আমার পরম দীক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন '*ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা*' শীর্ষক শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করত গবেষণাকর্ম সম্পাদনের অনুমতি মঞ্জুর করে এবং সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে; ইসলামের বিষয়াবলি অধ্যয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর উচ্চতর গবেষণাকর্ম সম্পাদনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দান করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমার অশেষ ঋণ। আমার অভিসন্দর্ভটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ, সমৃদ্ধ অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

রচনার স্বার্থে বারংবার বিভিন্ন বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজনসহ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে শ্রদ্ধেয় স্যারকে করেছি পেরেশান। পরম শ্রদ্ধেয় দীক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন স্যার'কে মহান রাব্বুল আলামিন দুনিয়া ও আখিরাতে 'জাযায়ে খায়ের' (সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান) দান করুন (আমিন)। 'সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?'[১]

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এম. ফিল গবেষণার তত্ত্বীয় কোর্স চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ইরানি ভিজিটিং প্রফেসর ড. ফরহাদ দোরূদ গারিয়ান স্যারের প্রতি। যিনি গবেষণাকর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন উৎসের সন্ধান প্রদান করেন; যা আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভকে সমৃদ্ধকরণে ভূমিকা রেখেছে। আল্লামা তাবাতাবায়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও তৎকালীন ডীন ড. নেয়ামাতুল্লাহ ইরানযাদেহ্ স্যারের প্রতিও জানাই আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। যিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আল্লাহভীরু, মাধুর্য্যময়, আন্তরিকতাপূর্ণ, সদাচারী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী; একই সাথে যিনি শিক্ষক হিসেবেও অত্যন্ত যত্নশীল ও আন্তরিক। তাঁর এই আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব ও ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আন্তরিকতা এবং সে বিষয়গুলো বুঝাতে তাঁর যত্নশীল আচরণ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন আমাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মর্মার্থ বুঝতে সাহায্য করেছে। তাঁর মতো সুযোগ্য শিক্ষকের সান্নিধ্য পাওয়া ও তাঁর নিকট হতে ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ছিল আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের। ইরান সরকারের বৃত্তি নিয়ে তেহরানে অবস্থিত আল্লামা তাবাতাবায়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে প্রফেসর ড. নেয়ামতুল্লাহ ইরান যাদেহ্ স্যারের পরামর্শে আমার আগ্রহের অংশ হিসেবে ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিভিন্ন বই-পত্র সংগ্রহ করি; যা পরবর্তী সময়ে এম.ফিল গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছে।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান স্যারের প্রতি। যিনি এম. ফিল গবেষণার তত্ত্বীয় কোর্সের শিক্ষক থাকাকালীন ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির ওপর সারগর্ভ আলোচনা ক্লাসে উপস্থাপনের মাধ্যমে আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের পথটি সহজীকরণে প্রাথমিক পর্যায়েই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-উপদেষ্টা সহকারি অধ্যাপক জনাব আহসানুল হাদী স্যারের প্রতিও; যিনি আমার গবেষণাকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা, পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিক-নিদের্শনা দিয়ে আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনের পথকে সহজ করতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। এছাড়াও আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বর্তমান সভাপতি ও প্রফেসর ড. মো. ওসমান গণী স্যারের প্রতি; যিনি আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনের নানা

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধকরণে ভূমিকা পালন করেছেন। আর এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অগ্রজগণ বিশেষত বিভাগের প্রশাসনে কর্মরত সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল ভাইয়ের কথা না উল্লেখ করলেই নয়; যিনি বিভাগের প্রশাসনিক কাজের শত ব্যস্ততার পরেও আমাকে থিসিস কম্পোজের কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও এসিস্ট্যান্ট সিস্টেম এণ্ড আইটি অফিসার আব্দুল ফাতির ভাইয়ের থিসিস কম্পোজ ও প্রিন্ট করার কাজে সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়াও আরো অন্যান্য যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে নানান পর্যায়ে আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী ও বোনতুল্য মেহজাবিন ইসলাম তার সংসার ও ছোট শিশু-সন্তান সামলানোর শত ব্যস্ততার পরও গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে সহযোগিতার জন্য তার প্রতিও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সর্বোপরি সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের যিনি আমাকে এমন শিক্ষানুরাগী পিতা-মাতা দান করেছেন যাঁরা সর্বদা আমার অধ্যয়নে সহযোগিতা, সৎ পরামর্শ, চেষ্টা-শ্রম-সাধনা ও দোয়ার মাধ্যমে আমার সাফল্য কামনা করেছেন, আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণাকর্ম সম্পাদনে তাঁদের উৎসাহ দান কিছু ক্ষেত্রে আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফলে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁদের দোয়া ও সহযোহিতায় এবং আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানিতে আমার এই এম.ফিল গবেষণার অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্তরূপে সফলতায় রূপ দিতে সক্ষম হই। আলহামদুলিল্লাহ। আমার সব ক্ষমতার উৎস ও প্রাচুর্যের মালিক মহান এবং পবিত্র রবের প্রতি সমস্ত প্রশংসা ও তাঁরই প্রিয় হাবীব, রাসুলে আকরাম, হাশরের ময়দানে উম্মাহর জন্য সুপারিশের অনুমতিপ্রাপ্ত একমাত্র ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করে এবং আমি আমার অভিসন্দর্ভটি রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি। আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এ সমর্পণকে কবুল ও মঞ্জুর করুন (আমিন)। ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।’[২]

তথ্যসূত্র

১. *আল-কুরআন, সুরা আর-রাহমান, আয়াত-৬০।*

২. *আল-কুরআন, সুরা আল আনআম, আয়াত-১৬২।*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধ্যাত্মিকতা: উৎপত্তি ও বিস্তার

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিকতা: উৎপত্তি ও বিস্তার

আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয়

ইংরেজি সোল শব্দের বাংলা রূপান্তর 'আত্মা' (Soul) এবং আরবি 'রূহ'। 'আত্মা' ও 'আধ্যাত্মিকতা' পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই 'আত্মা' বা 'রূহ' গূঢ় রহস্যমণ্ডিত এবং প্রাণ ও চেতনার উৎস। যার আদি আবাস্থল পরমাত্মার সান্নিধ্যধন্য ও প্রশান্তিময়তায় পূর্ণ এক জগত যাকে 'আলমে আরওয়া' বা 'রূহের জগত' বলা হয়। সৃষ্টির প্রথম মানব থেকে কিয়ামত সংগঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমনকারী সকল মানবাত্মার আদি নিবাস এ 'আলমে আরওয়া' বা 'রূহের জগত'। এ পৃথিবীতে আসার পূর্বে 'রূহ' 'আলমে আরওয়া' বা 'রূহ'-এর জগতে ছিল; আবার সে চলে যাবে, কেননা সে চিরন্তন।[১] তবে যাওয়ার পর তার এ রূহের বাসস্থান কিন্তু নির্ধারিত হয় ইহলৌকিক জীবনের সকল কর্মকান্ডের প্রতিদান বা পরিণাম হিসেবে। 'কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে'।[২] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে দেহ হলো রূহের জাগতিক বাহন।[৩]

'আলমে আমর' বা 'বস্তুহীন হুকুমের জগতের জিনিস' আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছায় গতিমান হয়।[৪] 'আল্লাহ তা'য়ালা আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করলেন। তারপর এই মাটির প্রতিমাকে বললেন জীবিত হও। অত:পর সে জীবন্ত হয়ে গেল।'[৫] 'অত:পর এক অভিনব আকৃতিতে তাকে দন্ডায়মান করলাম।'[৬] 'আমি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করি তখন কেবল বলি 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।'[৭] আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'আলার হুকুমে মানবদেহ 'রূহ' লাভের ফলে সসীম শক্তির অধিকারী হয়। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, শক্তি ও মেধা প্রয়োগে আল্লাহর বিধি-বিধান ও সীমরেখা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে ধন্য হয়; যা তাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করেছে। বিবেক ও চেতনাকে করেছে জাগ্রত, মনকে করেছে অনুসন্ধিৎসু। আর মানুষ তার এই অনুসন্ধানী মন নিয়ে 'রূহ' সম্পর্কে প্রাচীন যুগ থেকে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে আসছে, আজও তা অব্যাহত রয়েছে; হয়ত কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। 'রূহে'র সৃষ্টিতত্ত্ব, অস্তিত্ব, উপাদান সম্পর্কে আমাদের অনুভূতিতে আসতে পারে এমন অনেক জিনিসেরই সৃষ্টিতত্ত্ব ও মৌলিক উপাদান সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ [৮] 'হে আমার প্রিয় নবী ! আপনাকে তারা 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন যে 'রূহ' আল্লাহর হুকুমের মধ্য থেকে একটি হুকুম। আর তোমাদের অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।'[৯] 'রূহ' বলতে সাধারণত মানবদেহের এমন এক অস্তিত্ব বা জ্যোতিকে বুঝায় যা কখনো ধ্বংস হয় না।[১০] Soul: 'religious conception of an important element in man, capable of existence apart from the body, and immortal seat of the personality and of life.'[১১] মানবাত্মায় যখন পরমাত্মার গূঢ় অর্থপূর্ণ ও গুপ্ত রহস্য তার কাছে অন্তহীন জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দেয় তখন এর জবাব খুঁজতে গিয়ে সে যে সাধনায় সমর্পিত হয় তাই

আধ্যাত্মিকতা বা অধ্যাত্মবাদের সাধনা। আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত লক্ষ্য পরমাত্মাকে চেনা ও জানার মাধ্যমে তাঁকে পাওয়া। আর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই শুধু পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করা যায়। ইসলামে পরমাত্মা বলতে শুধু আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'আলাকেই বুঝায়।

মানুষের ধর্মীয় জীবনের অপরিহার্য অনুসঙ্গ এ আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ মানুষের মননে এবং যার বিকাশ পরিলক্ষিত হয় তার কর্মকান্ডে। আধ্যাত্মিক মানস দ্বারা অনুধাবন করতে পারা এ অনুভূতিকে মানুষ তার জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে এসে আবিষ্কার করতে পারে। আর মানুষ তার নিজের মধ্যে এ অনুভূতির উন্নয়ন ঘটিয়ে পরমাত্মার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর প্রেম ও সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হতে পারে। মানবীয় সকল দুর্বলতা ও পাশবিকতাকে

বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর গুণে বিভূষিত হবার মাধ্যমেই তা সম্ভব এবং এর মাঝেই নিহিত মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। 'তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।'[১২] 'তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।'[১৩]

আধ্যাত্মিকতা আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'য়ালা কর্তৃক মানুষকে প্রদত্ত সহজাত এক অনুভূতি। যিনি আল্লাহ প্রদত্ত এ অনুভূতি শক্তিকে জাগ্রত করে শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে পরম সত্তা রাব্বুল আ'লামিনের সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি পেতে সে অনুযায়ী জীবন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে এবং চিন্তা-চেতনা ধারণ করতে চান তিনিই একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, তার কাজটি আধ্যাত্মিক কাজ এবং চিন্তাটি একটি আধ্যাত্মিক চিন্তা। এজাতীয় ব্যক্তি, তার চিন্তা ও কর্ম আধ্যাত্মিকতার পর্যায়ভূক্ত। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রচলিত ধারণা ও গণ্ডির বাইরে এসে আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক-চেতনা সমৃদ্ধ প্রকৃত অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সেই; যে ব্যক্তিত্ব কোন কর্ম সম্পাদনের প্রাক্কালে স্বীয় হৃদয়ে স্রষ্টার ভয়ের উপলব্ধি ও শরী'আতের সীমার স্মরণ করে তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং তা হতে কখনোই বিস্মৃত ও বিচ্যুত হয় না। ফলে স্রষ্টা কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তার হৃদয়ে এক আত্মতৃপ্তি অনুভূত হয় ও পরমাত্মার সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট ও ধন্য হয়। স্রষ্টার হুকুম আহকাম পালনের বৈপরীত্য তার অন্তরে অস্বস্তির উদ্রেক ঘটায়। আর আল্লাহর অনুগত্য পালন হৃদয়ে প্রশান্তি আনয়ন করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে-

'মুমিন তো তারাই আল্লাহর কথা আলোচিত হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।'[১৪] 'তারা বলে আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি।'[১৫] 'জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মুমিনের হৃদয় প্রশান্ত হয়।'[১৬] প্রাত্যহিক জীবনাচরণের কোনো না কোনো সময়ে মানুষ তার হৃদয়ের গভীরে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় এক যন্ত্রণা উপলব্ধি

করতে পারে। এ যন্ত্রণানুভূতির কারণ মূলত স্রষ্টার সান্নিধ্যধন্য আদি নিবাস 'রূহের জগত' থেকে বিচ্যুতি এবং জাগতিক জীবনে স্রষ্টা কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে টানাপোড়েন। বস্তুত, রূহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি আর দেহ তার বাহন মাত্র।[১৭] দেহের মাঝে আল্লাহর যে শক্তি বা রূহ আছে, তা মূলত পৃথিবীতে এসে স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শিশু পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে কাঁদে রূহের জগত বা স্রষ্টার নিকট থেকে বিচ্ছেদের কারণে, বাঁশী কাঁদে তার ঝাড় থেকে বিচ্ছদের কারণে ঠিক তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথও এ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে রুমীর ন্যায়ই বলেছেন: 'তুই ফেলে এসেছিস্ কারে মন মন রে আমার, তাই জনম গেল শান্তি পেলি না রে.....।'[১৮]

'রুমির মতে, আল্লাহ থেকেই মানবাত্মার উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর মতে, আল্লাহ থেকে পৃথক হওয়ার পর অস্থায়ীভাবে হলেও আত্মা আবার সাধকের ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে আবাস খুঁজে নেয়। মূল উৎস স্থল থেকে পৃথকীকৃত হওয়ার ফলেই আত্মা দেহের পিঞ্জরে বন্দী অবস্থায় থাকে। মানব দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ অবস্থায় আত্মা ততটা স্বাতন্ত্র্য বোধ করে না। এ কারণেই, আত্মার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আদি উৎপত্তি স্থলে ফিরে যাওয়া এবং আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে তার আদি উৎপত্তি স্থলে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তার দেহের অবসান বা মৃত্যু হয়। তবে জীবনের অবসান হয় না। জীবন ফিরে যায় আল্লাহর কাছে। আল্লাহই শুরু এবং আল্লাহই শেষ। আর তাঁর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করি।'[১৯]

প্রকৃতপক্ষে, সুফীবাদের মূল কথাই হল আল্লাহ বস্তুজগতের সব কিছুর স্রষ্টা এবং সব কিছুই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।[২০] এ জন্যই কুরআনে বলা আছে–'আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতিই সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল।'[২১] 'তিনিই প্রথম তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।'[২২] মানব হৃদয়ের এ যন্ত্রনণাকাতরতার কিঞ্চিৎ প্রশমন লাভ শুধু তখনই সম্ভব; মানুষ যখন স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত হুকুম-আহকাম পালনের মধ্য দিয়ে ইহকালৌকিক জীবনে অতৃপ্ত আত্মার পরিতৃপ্তি সাধনে সক্ষম হয়। আর চিরন্তন ও চিরস্থায়ী আত্মিক তৃপ্তি তো কেবল পারলৌকিক জীবনে পরম ও পবিত্র সত্তা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ফলেই সম্ভব। তাই 'রূহ'কে তার মূল শক্তির উৎস স্রষ্টার সাথে সংযুক্ত করতে হলে বিশেষ ইবাদতের প্রয়োজন।[২৩] আর স্বাভাবিক ইবাদতের স্তর বা পরিমাণ অনুযায়ী রূহের শক্তির পর্যায় নিরূপণ করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে ইমাম গাযালী (র.) (১০৫৮-১১১১ খ্রিস্টাব্দ) সমগ্র অস্তিত্বকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন; যেমন: আলমে মুল্ক, আলমে মালাকুত' ও আলমে জাবারূত।[২৪]

আলমে মুল্ক:

এটা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত, যা রূপ-রস, শব্দ-গন্ধ ও স্পর্শময়। রূহে'র স্বাভাবিক শক্তি এটা দ্বারা বোধগম্য হয়। এ জগত সদা পরিবর্তনের অধীন।

আলমে মালাকুত:

এটা জ্যোতির্ময়, অলৌকিক এবং অপরিবর্তনীয় জগত। বিপুল শক্তি সম্পন্ন রূহ'ই এ জগতে বিরাজ করতে সক্ষম হয়। এ জগতের কোন কিছুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যেহেতু এ জগত বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না, তাই সাধারণ জ্ঞানে এটাকে কাল্পনিক মনে হতেও পারে, কিন্তু ইবাদতলব্ধ রূহে'র জন্য এটা বাস্তব। বস্তুত, এটা বাস্তব ও চিরন্তন অপরিবর্তনীয় জগত।[২৫]

দেখা না গেলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এমন বহু বিষয় আছে, যার ক্ষমতা অপরিসীম; যেমন প্রেম বা ভালবাসা, যা দিয়ে বাহ্যিক দেহের মানুষকে এমনভাবে আকর্ষণ করা যায় যে এর কারণে মানুষ মানুষের জন্য প্রাণ দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যায়; অথচ এমন শক্তিশালী বিষয়টিকে দেখা যায় না। আরো কাছের একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, বায়ু বা বাতাস যা না হলে মানুষ বাঁচে না, আবার যার এত শক্তি যে তুফানের আকার ধারণ করলে সুকঠিন প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়, তা দেখা যায় না; এটা যেমন দেখা যায় না অথচ শক্তি সম্পন্ন অস্তিত্ব, তেমনিভাবে রূহ্ও স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় না। কিন্তু সাধনা দ্বারা একে বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন বানানো যায়। যেমন দুধের মধ্যে রসগোল্লা বা মাখন দেখা যায় না, কিন্তু যথাযথ নিয়মের মাধ্যমে তা থেকে রসগোল্লা ও মাখনসহ আরো অনেক কিছু পাওয়া যায়।

আলমে জাবারূত:

'এটি আলমে মুল্ক ও আলমে মালাকুতের মধ্যবর্তী জগত। এখানেই মানবাত্মার বাস। আর সাধকগণ তাদের সাধনা বলে আত্মার শক্তির মাধ্যমে এখান থেকেই উচ্চ রাজ্য অর্থাৎ আলমে মালাকুত-এর অলৌকিক জগতে বিরাজ করে থাকেন।[২৬] আধ্যাত্মিক সাধকগণ বিশেষ ইবাদতের মাধ্যমে নিজেকে মহাশক্তি অর্থাৎ সকল শক্তির উৎস আল্লাহতে 'ফানা' (বিলীন) করে দিয়ে তাঁরা আল্লাহর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে থাকেন। লোহা যেমন নিজেকে আগুনে বিলিন করে দিয়ে অগ্নি-শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, মানুষও আল্লাহর ইবাদত, রিয়াযত ও প্রেম দিয়ে এ উৎস থেকে শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়।'[২৭]

আগুনের শক্তি অর্জন করতে হলে লোহাকে আগে আগুনের মধ্যে জ্বলতে হয়–লয় করে দিতে হয় তার সত্তাকে আগুনের মধ্যে। একটি সাধারণ লোহার টুকরো বা পাতে হাত রাখলে পোড়া যায় না; কিন্তু লোহার সে টুকরো বা পাত টি কয়েক ঘন্টা আগুনে জ্বলার পর যখন সে অগ্নিবরণ হয়ে যায় এবং দাহন ক্ষমতা অর্জন করে, তখন তাতে

হাত রাখা যাবে কি? লোহা যেমন নিজেকে জ্বালিয়ে অগ্নি ক্ষমতা সম্পন্ন হয়; তেমনিভাবে মানবদেহে রক্ষিত রূহে'র চেতনা-শক্তিকেও ইবাদতের মাধ্যমে এর মূল শক্তি থেকে বিপুল শক্তি-সম্বলিত করা যায়।[২৮]

মানবদেহ হলো সৃষ্টি-জগতের বাহ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাই তিনি প্রত্যেক মানুষও বানিয়েছেন একক ও অদ্বিতীয় রূপে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ছয়'শ কোটির মত মানুষ রয়েছে। অথচ এদের একজনের সাথে অপর জনের চেহারা-সুরত, চাল-চলন ও আচরণে মিল নেই। প্রতিটি মানুষ এককভাবে মহান আল্লাহর একত্ববাদেরই নিদর্শন বহন করছে। বস্তুত, মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিরাজমান।[২৯] পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন: 'আমি তার (মানুষের) ঘাড়ের রগের অপেক্ষাও নিকটতম।'[৩০] ইসলামে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অসীম ক্ষমতাবান স্রষ্টা তাঁর সীমিত ক্ষমতাবান সৃষ্টি মানুষের মধ্যেই বিরাজ করেন।[৩১] কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথেই রয়েছেন।'[৩২] রাব্বুল আ'লামিন মানুষের মাঝে বিরাজ করেন কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না কেন? প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেখার দু'টি পদ্ধতি আছে। একটি হলো চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা, যার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টিগোচর সব বস্তু বা দৃশ্য অবলোকন করা যায়। দেখার অপর উপায়টি হলো অন্তর্দৃষ্টি বা রূহে'র চোখ দিয়ে দেখা।[৩৩] যার মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে যা কিছু দেখা সম্ভব হয় তার সবকিছু এবং অক্ষির অগোচরে যা দেখা সম্ভব নয় উভয়কেই দেখা যায়।

আর এ দৃষ্টিশক্তি স্রষ্টা কর্তৃক অসীম ক্ষমতা হতে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা সসীমরূপে পেয়ে তাঁকে অনুধাবন করার ও দেখার জন্য অসাধারণ বা বিপুল ক্ষমতাবান অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়ে ওঠে। কেননা, স্রষ্টা অসীম হওয়ায় তাঁকে দেখতে এমন বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তরদৃষ্টির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সসীম ও অসীমের ধারণা এভাবেও দেয়া হয়েছে, 'জীবাত্মার জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মকান্ড ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ আর পরমাত্মা অর্থ: মহান স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং দেশ ও কালের অতীত বলেই তিনি পরমাত্মা[৩৪] এখানে বলা হচ্ছে যে, জীবাত্মা পরমাত্মার শক্তিতেই বলীয়ান হয়ে পরমাত্মা হতে প্রাপ্ত সীমিত ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। বস্তুত, মানুষের এ সীমিত ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের ওপর প্রতিদান এবং এর অপব্যবহারের ওপর তার পরিণাম নির্ভর করে।[৩৫] হৃদয়ে আল্লাহ প্রেমের প্রকৃত উপলব্ধি অনুপস্থিত অথচ পোশাকে ও বাহ্যিকতায় আধ্যাত্মিকতার আবরণ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান সেটি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নয় বরং তার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ে নিহিত ও কর্মে তা প্রকাশিত। হৃদয়ে অন্তরীণ থাকা এ অনুভূতি 'তাকওয়া' এবং হৃদয়ানুভূতির প্রকাশমানরূপ 'আমল বা ইবাদত' হিসেবে পরিগণিত। আধ্যাত্মিক সাধকদের নির্দিষ্ট কোন পোশাকের বাধ্যবাধকতা দ্বারা আবৃত থাকার কোন আবশ্যকতা নেই। একজন আধ্যাত্মিক সাধককে 'আলখাল্লা বা দরবেশি' পোশাকে আবৃত করেই নিজের অধ্যাত্মবাদের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটাতে হবে এমনটি মুখ্য নয় বরং সেটি গৌণ। যদি তথাকথিত দরবেশি পোশাক পরিহিত আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ বলে দাবিকারী সাধক অন্তরে

কলুষতা ও আমলে কপটতা ধারণ করে তবে তার আধ্যাত্মিকতার পবিত্র সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বলেই বিবেচিত হবে। এ সাধনা ও পরিশ্রমের কোন মূল্য মহান রবের কাছে মিলবে না। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে এসেছে-'যা কিছু রাসুলের সুন্নাহ অনুসৃত নয় তা বাতিল।'[৩৬] মহান রব বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজ আত্মাকে বিশুদ্ধ করেছে, সে সফলকাম হয়েছে, আর যে একে কলুষিত করেছে সে অকৃতকার্য হয়েছে।'[৩৭]

রাসুল (সা.) আধ্যাত্মিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাপস ও প্রাণ পুরুষ। তাই যদি কেউ সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সাধক হতে চায় তবে তাকে অবশ্যই রাসুল (সা.)-এর পথ ও পদ্ধতিই অনুসরণ করেই সে পথের কামেলিয়াত লাভে সচেষ্ট সাধক-পুরুষ হতে হবে। কেননা, মহান রব পবিত্র ও সত্য। তাই তিনি সত্য ও পবিত্রতাকেই পছন্দ করেন এবং তার-ই নির্দেশ দিয়ে থাকেন। স্রষ্টা সত্য ও পবিত্রতার সাথে অসত্য ও অপবিত্রতার সংমিশ্রণে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিয়ে ফেলো না।'[৩৮] 'নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন।'[৩৯]

ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নয়, হৃদয়ের প্রেমই স্রষ্টাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়।[৪০] সাধারণ পোশাকে দেহাবৃত একজন মানুষও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারেন যদি তার হৃদয় 'তাকওয়া'র উত্তম পোশাক দ্বারা আবৃত থাকে। আবার, সামাজিক দিক থেকে তুলনামূলক কম মর্যাদাসম্পন্ন একজন সাধারণ পেশার মানুষও তার রবের দৃষ্টিতে উচ্চ আসনে সমাসীন হতে পারেন যদি তিনি তার আমল, ইহসান ও ইবাদতে উত্তম হতে পারেন। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে হৃদয়ের 'তাকওয়া'র পোশাকই হচ্ছে উত্তম আর শ্রেষ্ঠ পোশাক।

আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'আলা বলেন,

'বস্তুত তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।'[৪১] আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'আলা আরো বলেন, 'আজকে ধনবল ও জনবল কোন কাজে আসবে না। শুধু কাজে আসবে শুধু বিশুদ্ধ আত্মা।'[৪২]

অন্তরের তাকওয়ার গুরুত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে তাকান না, দেখেন তোমাদের হৃদয় ও কর্ম।'[৪৩]

শুধু দরবেশি পোশাকধারী তথাকথিত সাধুদের কটাক্ষ করে খৈয়্যাম বলেছেন-

'তুমি মদ খাও না বলে অহংকার করো না,

তুমি এমন অনেক কাজ করো মদ যেগুলোর গোলাম।' (রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়্যাম)[৪৪]

অধ্যাত্মবাদের বৈশিষ্ট্য ও সাধনা

অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাস, হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা পরম সত্যকে জানা এবং আত্মবিলয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্মিলিত হবার আকুল ইচ্ছা অধ্যাত্মবাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। অধ্যাত্মবাদী এ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি 'আত্ম' দিয়ে উপলব্ধি করার বিষয় যা শুধুমাত্র আত্মার বিশেষ অবস্থার উদ্রেক হলেই অনুভব করা সম্ভব। অধ্যাত্মবাদ পার্থিব-জাগতিক প্রামাণ্য দলিল দ্বারা উপস্থাপনের মত কোন বিষয় নয়। বরং তা এক অপার্থিব বিষয়। এ এক বিশেষ ধরনের মানবীয় অনুভূতি, মহিমময় বোধশক্তি, বিষয়বুদ্ধি থেকে মুক্তির প্রয়াস এবং সর্বোচ্চ মোক্ষলাভের সাধনা।[৪৫]

এটি অনুভবের বিষয়; অনুভব করানো যায় না। বুঝবার বিষয়; বুঝানো যায় না। উপলব্ধ হবার বিষয়; উপলব্ধি করানো যায় না। সহজভাবে বলতে গেলে, 'বন্ধনের মুক্তির আস্বাদ, দেহ থেকেও দেহাতীতের স্পর্শানুভব, নীরবতার মধ্যে থেকে দেহ-মনের ক্রিয়াশীলতা, বিরহের মধ্যে মিলনের রস উপভোগ, সুদূরকে নিকটতম পাওয়া, নিকটতমকে সুদূর-ভ্রমে ধারার আকাঙক্ষা, প্রাপ্তির মধ্যে অপ্রাপ্তির বেদনা, একাকীত্বের মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদ, বিষাদের মধ্যে আনন্দের প্লাবন এবং সর্বোপরি সর্বপ্রয়াসী প্রেম এর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।[৪৬] 'স্থুল দেহের মধ্যে বন্দী মানব সর্বদা স্থান-কালের দ্বারা পীড়িত ও আহত। যখন আধ্যাত্মিক তপস্যা দ্বারা অতিমানস সত্তার দিব্যজ্যোতি পরিস্ফুট হয়, তখন দেহের কাঠিন্য যেন খর্বতা প্রাপ্ত হয়। তখনই আত্মার বিমল কিরণ প্রকটিত হয়।'[৪৭]

অধ্যাত্মবাদ প্রেমের এমন এক পদ্ধতি যা রহস্যঘেরা এ মহাবিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্ব ও মহান আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের সাধনায় সাধককে নিয়ত সচেষ্ট থাকতে প্রেরণা যোগায়। বৈষয়িক ও জাগতিক জীবনধারার চেয়ে আল্লাহ-প্রেম ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের প্রাধান্য দেয়ার এবং আল্লাহ-প্রেম ও তাঁর সৃষ্টি-রহস্য উন্মোচনের ধ্যানে নিবিষ্ট থাকার স্বতন্ত্র এক সাধনা।

'জ্ঞানভিত্তিক আমলী চর্চার এ বিশেষ ধারা ইসলামে এক বিশেষ বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামে 'ইলমে তাসাউফ' নামে মুসলিম সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে।'[৪৮] 'তাসাউফ ইসলাম বহির্ভূত কিছু নয় বরং ইসলামেরই অবিচ্ছেদ্য ও প্রধান অঙ্গ। এ হলো ইসলামের বাতিনী (অন্তর্নিহিত) বা আধ্যাত্মিক ও মিস্টিক দিকের পরিচায়ক। প্রতিটি বস্তুরই দু'টো দিক রয়েছে-জাহিরী ও বাতিনী, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ।'[৪৯]

একটি বাহ্যিক বা যাহিরী দিক এবং অন্যটি বাতিনী বা অভ্যন্তরীণ দিক। ইসলামের এ দিক দুটি পরস্পর নির্ভরশীল, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। যাহিরী ও বাতিনী দিক দুটির সম্মিলনই ইসলামের পূর্ণরূপের অভিব্যক্ত। আর অধ্যাত্মবাদী সাধক তিনিই যিনি ইসলামের বাহ্যিক (যাহিরী) ও অভ্যন্তরীণ (বাতিনী) দিকের সমন্বিত রূপকে ইসলামের পূর্ণরূপ বলে বিশ্বাস করে উভয় দিকের প্রতি সমান গুরুত্বারোপ করেন এবং সেভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে আল্লাহর পথে ধাবিত হন। 'যাঁরা সাংসারিক নানা পাপ হতে মুক্ত এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, তাঁরাই সুফি নামে অভিহিত হবার যোগ্য। যাঁরা ঐশী প্রেম, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও ধর্মের দিক দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রথম শ্রেণীতে অবস্থান করেন, তারাই সুফি।'[৫০] 'মানুষের তৃষ্ণা, বাসনা সীমাহীন। অসীমকে জানার জন্য অনন্তকাল ধরে কিছু অসাধারণ সাধকসত্তা রহস্য উদ্ধারের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত।'[৫১] যুগ যুগ ধরে 'ইলমে তাসাউফ' চর্চায় যারা সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং আল্লাহ প্রেমের সাধনায় ধন্য হয়েছেন তারা আরেফ তথা সুফি বলে খ্যাত।[৫২] ইসলামি পরিভাষায় তিনি সুফি নামে অভিহিত হন।[৫৩]

অধ্যাত্মবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকৃতপক্ষে তাসাউফ হলো সৃষ্টির সেবা ও চরিত্র গঠনের নাম। আর তাসাউফের এই মহান উদ্দেশ্যকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত প্রত্যেক দেশ ও যুগেই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা পরম স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিবেদিত প্রাণ হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাস করেন এবং হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা পরম সত্যকে জানতে চান ও আত্ম বিলয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্মিলিত হতে চান।

'মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী তারাই 'সূফী' নামে পরিচিতি। মূলত, ইসলামে সূফীবাদকে বলা হয় 'আত্তাসাউফ'। 'তাসাউফ' শব্দ-ব্যুৎপত্তি বাব তাফাউলের ওজনে মূল ধাতু, 'সূফী' হতে উৎপন্ন। 'সূফী' অর্থ পশম, আর তাসাউফরে অর্থ পশমি বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। অতপর মরমী তত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় 'তাসাউফ'।'[৫৪] যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামী পরিভাষায় তিনি সূফী নামে অভিহিত হন।'[৫৫]

'সূফী মতে ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য হল আত্মার সংযম; কেবলমাত্র কতকগুলো বাহ্যিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। 'আত্তাসাউফ' বা 'সূফীবাদ হচ্ছে', স্রষ্টার জন্য গভীর ও তীব্র ভালবাসার মাধ্যমে আত্মার উন্নয়ন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনা। সূফীদের মতে, জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তি সত্তার চেতনার বিলোপ এবং পবিত্র সত্তায় অব্যাহত অস্তিত্ব তাসাউফের লক্ষ্য।'[৫৬]

আবার তাসাউফ জীবনে আত্মার পবিত্রকরণের জন্য মানুষের দৈহিক আবেদনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না। ইসলামি শিক্ষাই এই যে, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দিককে সে বিচ্ছিন্ন করে না, পার্থিব ও অপার্থিব জীবনকে ভিন্ন মনে করে না। অধ্যাত্মবাদ জীবনের পূর্ণাঙ্গ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্মবাদী সাধকগণ পার্থিব তাৎপর্য নষ্যাৎ করে আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা মোক্ষ লাভের অনুসন্ধান করেন না। ইসলাম মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক এ উভয়ের যৌথ ভূমিকা ও অভিন্নতা স্বীকার করে। আর আধ্যাত্মিক সাধকরা এ দর্শনের অনুসারী। তাসাউফ জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য সাধনার সাথে শ্রেয় ও প্রেয়ের সাধনাকে আলাদা করে না এবং জীবনের প্রত্যেক স্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর সমান গুরুত্বারোপ করে। আধ্যাত্মিক সাধকগণ পরিবার ও তাঁর সমাজের সদস্য এবং রাষ্ট্রের নাগরিক, এজন্য তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বমানবের প্রতি যথাযত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেন। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন বা ইনসানে-ই-কামেল হওয়ার সাধনাই ইলমে তাসাউফ বা সুফি সাধনার মূল বিষয়বস্তু। এজন্য খাঁটি ইসলামি জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলমান হিসেবে তাঁরা জীবনের প্রত্যেক দিক ও স্তরের পরিক্রমার ওপর জোর দেয়। যে-কোন একটি দিকও বাদ দিলে জীবনের পূর্ণতার রূপ বিকোশিত হতে পারে না। এজন্য তাসাউফ তথা ইসলাম জীবনের সামগ্রিক দিকের ওপর সমানভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। 'তাসাউফ'-এর সাধকগণ শুধুমাত্র 'ফানা'তে (আত্মবিলয়েই) সন্তুষ্ট নয়। তারা এরপরে আরো একধাপ ওপরে উঠে আল্লাহর 'যাতরূপ' অনুভূতির উপলব্ধি করেন এবং মহাশক্তিধর সত্তার অধিকারী হন। অর্থাৎ এ স্তরে ('বাকা') সুফির নিজস্ব কোন দাস-রূপ গুণ বা সত্তাই বর্তমান থাকে না বরং স্বয়ং 'যাত' পাক আল্লাহই এসময় সুফির মাধমে প্রকাশ হন এবং এ সত্তার বাণী, যে কর্ম যা কিছুই প্রকাশ হয়ে থাকুক না কেন, তা দাসের নয় বরং প্রভুর।

এ প্রসঙ্গে হাদিসে কুদসিতে এসেছে-

'আল্লাহ শব-ই-মেয়ারাজেরই দিন আমাকে বলিলেন, 'হে মুহম্মদ! যাহারা আমার সান্নিধ্য লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সর্বোত্তম উপায় হইতেছে আমি যে কার্যাবলী তাহাদের ওপর ফরজ করিয়াছি তাহার সুসম্পাদন। আমার সেবক আমার অনুগ্রহ লাভের আশায় সকল কাজ করে যে পর্যন্ত না আমি তাহাকে ভালোবাসি; এবং যখন আমি তাহাকে ভালোবাসি তখন আমি তাহার নিকট তাহার কর্ণ, চক্ষু, দন্ত এবং সাহায্যকারী; আমার মধ্য দিয়াই সে দর্শন করে, আমার মধ্য দিয়াই সে শ্রবণ করে।'[৫৭]

অর্থাৎ একজন মুমিন মুত্তাকী বান্দা যখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তখন তাঁর অন্তরের প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর হুকুম-আহকাম-এরই প্রতিফলন দেখা যায়। তার নিজ সত্তা সে আল্লাহ-তে বিলিন করে

পরম প্রশান্তি লাভ করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'আলা উক্ত বর্ণনায় তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের স্থান দিয়েছেন। কারামাতের যে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে তা এস্তরেরই প্রকাশ। বরং যা ঘটে তা স্বয়ং 'যাত-পাক'ই ঘটিয়ে থাকেন। এ স্তরে দাস অবলুপ্ত হন এবং প্রভু প্রকাশিত হন। অধ্যাত্মবাদ, আল্লাহ ও জগতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

এ শ্রেণীর সাধকদের মতে, আল্লাহ ব্যতীত পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি শূন্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এ শূন্যতার রূপ ও অস্তিত্ব; অধ্যাত্ববাদে উদঘাটন এবং একে নিত্য রূপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অধ্যাত্মবাদে সাধকগণ আত্মবিলয়ের পরও এক অব্যক্ত স্তরে প্রবেশ করেন এবং এ স্তরে স্বয়ং আল্লাহ পাকই বিদ্যমান থাকেন। এ স্তরে সুফি যে নব জীবন লাভ করেন তা 'যাত' ও 'সিফাত'কে অভিন্নভাবে প্রকাশ করে; যেমন ফুলের 'রং' ও 'গন্ধ' ফুল-এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আধ্যাত্মিক সাধকগণ পুরোহিতবাদকে স্বীকার করেন না। তারা পীর বা শায়েখ বলতে শুধুমাত্র শিক্ষক বা আধ্যাত্মিক পথের পথ-প্রদর্শক বা গুরু'কে বুঝেন। আধ্যাত্মিক প্রথার শিক্ষক পথের সর্বপ্রকার নকশা ও দিশাকে দেখিয়ে দেন মাত্র। সাধককে ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষভাবে (Direct) সে পথের পথিক হতে হয় এবং সরাসরি আল্লাহর দরবারে উপনিত হতে হয়। পীর মধ্যস্থতা (ওসীলতা) করেন বটে কিন্ত তা বৈবাহিক ঘটকের ঘটকালীর ন্যায় বর কনের মিলন পর্যন্তই তার সীমাবদ্ধ সীমারেখা। মিলনের বাসর শয্যায় শুধু প্রেমিক ও প্রেমিকাই (প্রেমাস্পদ) উপস্থিত থাকেন। তৃতীয় কারোরই উপস্থিতি সেখানে অনুমোদিত নয়।

সাধকগণ সাধনার যত ওপরেই ওঠেন না কেন কোনো মতেই তাঁরা ইসলামের অনুশাসন ও শরীআ'তের এতটুকু বিরোধিতা করেন না। বরং আরো বেশি করে ভয়ভীতি সহকারে বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান (শরীআ'ত) সম্পাদন করে থাকেন। ধর্মীয় ব্যাপারে বাহ্যিক (যাহিরী) ও অভ্যন্তরীণ (বাতিনী) দিকের সুসমন্বয় অধ্যাত্মবাদের মূলকথা। যাহিরী অনুষ্ঠানাদি (শরীআ'ত) বাদ দিয়ে বাতিনী অধিকার (মারিফাত বা বিলায়াত) লাভ অসম্ভব। আধ্যাত্মিক সাধকগণ সেজন্যই বাহ্যিকভাবে নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, দান-সাদাকা, পরোপকার, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতিসহ ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সার্বিকভাবে পালন করে থাকেন এবং এসবের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যান (ইহসান), আল্লাহর প্রেম, আল্লাহর জ্ঞান প্রভৃতি বাতিনী (অভ্যন্তরীণ) সাধনাকে সুন্দরভাবে অনুশীলন করেন। ইসলাম যাহিরী ও বাতিনী দিকের সুসমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে এবং এর একটিকে অবজ্ঞা করলে বা বাদ দিলে তাকে ফাসিক ও যিন্দিক (প্রায় কাফির) রূপে অভিহিত করে। অধ্যাত্মবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক মনসুর হাল্লাজ (র.) যখন 'আনাল হক' (আমিই সত্য) বাণী প্রচার করেন, তখনও এমনকি মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত দিনে রাতে পাঁচ শতাধিক রাকাত নামায আদায় করেন। হযরত বায়েজিত বোস্তামি (র.), হযরত ইবনুল আরাবী (র.) (১১৬৫-

১২৪০ খ্রিস্টাব্দ), হযরত জালালুদ্দীন রুমী (র.) (১২০৭-১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ), হযরত সাবিস্তারি (রহ.) (১২৫০-১৩২০ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী সাধকগণ নামায, রোযা, প্রভৃতি তো অধিক পরিমাণে আদায় করতেনই বরং পরহেযগারী ও শরীআ'ত পালনের ব্যাপারেও যুগের অগ্রনায়ক ছিলেন। অধ্যাত্মবাদী সাধকগণ সাধারণ সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেও অন্যান্য মরমিবাদীর ন্যায় ধর্মীয় বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি (শরীআ'ত) পরিত্যাগ করেন না।

আল্লাহ পাকের মিলনই আধ্যাত্মিক সাধকদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। এই ইপ্সিত লক্ষ্যে উপনিত হওয়ার জন্য সাধককে অনেক বাধা বিপত্তি ও দুস্তর পারাবার অতিক্রম করতে হয়। সহ্য করতে হয় অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ ও সুগম নয়; বরং যেমন কণ্টাকীর্ণ ও দুর্গম, তেমনি দীর্ঘ। সাধক প্রেমশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পীর ও মুরশিদ প্রদত্ত পথ ও মঞ্জিল অতিক্রম করে প্রেমাস্পদের সন্নিধ্যানে মিলিত হবার আশা বুকে নিয়ে অভিসার করে ছুটে চলেন সম্মুখে। শরীআ'ত, তরীকাত, মারিফাত, হাকীকাত ও ওয়াহেদানিয়াত-এ পাঁচটি পথ বা মঞ্জিল তাকে অতি সন্তর্পণে অতিক্রম করতে হয়, আর অতিক্রম করতে পারলে তবেই তার পক্ষে প্রেমাস্পদের (আল্লাহকে) সন্নিধ্যান সম্ভব। আর এটিই অধ্যাত্মবাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আল্লাহকে পাবার এটাই 'সিরাতাল মুস্তাকীম' বা সরল, সঠিক ও সুন্দর পথ। এর একটিকে পরিত্যাগ করলে আল্লাহকে পাওয়া সুদূর পরাহত। এর একটিকে বাদ দিলে ইসলামের অঙ্গহানি হয়, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ইসলামের পথ হতে সরে পড়তে হয়। তাই শরীআ'তকে মাশায়েখগণ ইসলামের ভিত্তি এবং তরীকাত, মারিফাত, হাকীকাত ও ওয়াহেদানিয়াতকে সাধারণভাবে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ বলে গণ্য করে থাকেন। সর্বোপরি এই পঞ্চমঞ্জিলের সমন্বিত রূপের মধ্যেই ইসলামের পূর্ণরূপ বিদ্যমান।

শরীআ'ত আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার প্রারম্ভিক স্তর ও অপরিহার্য অঙ্গ। শরীআ'ত ছাড়া মারিফাত সম্ভব নয়। শরীআ'ত মারিফাতের ভিত্তি। সাধকগণ তাদের অধ্যাত্মবাদী সাধনার পথ পরিক্রমায় হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক)-এর সাথে সাথে হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক)-এর পর্যায়ভূক্ত তিনটি স্তর অর্থাৎ ব্যক্তির অধিকার, সামাজিক অধিকার এবং অন্যান্য জীবের অধিকরের প্রতি সতর্ক ও দায়িত্বশীল থাকেন। এই সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজকে তারা পরম ইবাদত মনে করে পালন করে পরম পরিতৃপ্তি লাভে ধন্য হন।

সেবা ও আধ্যাত্মিকতা

মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা মন্ডিত করেছি'[৫৮] মানুষের উদারতা, মহানুভবতা, পরোপকার, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধ তথা একজন

অপরজনের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তার দুঃখ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টার মত মৌলিক মানবিক গুণগুলোই তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে। উল্লিখিত মানবিক গুণগুলো সৃষ্টির প্রতি সেবা ও খিদমত হিসেবে পরিগণিত। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত প্রাণ হওয়া অনন্য ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'আলা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'আমি মানুষ ও জ্বিনকে আমার ইবাদত ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করি নি।'[৫৯]

ব্যাপক অর্থে ইবাদত শব্দটি স্রষ্টার আনুগত্য ও সৃষ্টির খিলাফতের গুরু দায়িত্বকে নির্দেশ করে। যাকে ইসলামি পরিভাষায় হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ বলা হয়।[৬০] একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও আবেদকে (যিনি ইবাদত করেন তাকে আবেদ বলা হয়) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উভয়বিধ হক (প্রাপ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য) আদায়ে সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। এ শর্ত পূরণ করা ব্যতীত ইবাদত পূর্ণ হয়নি বলে বিবেচিত হবে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী সম্বলিত পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সর্বত্রই হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদকে সমান্তরালভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

'সেই নামাযীদের জন্য পরিতাপ যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানো নামায আদায় করে এবং যারা নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।'[৬১]

উল্লিখিত আয়াতের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশে আল্লাহর হক সম্পর্কে এবং তৃতীয় ও শেষাংশে বান্দার হক সম্পর্কে বর্ণনা স্থান পেয়েছে। রিয়াহীন আন্তরিকতার সাথে আদায়কৃত নামায, বিশেষ সময় ও প্রয়োজনে মানুষকে ছোটখাট জিনিস দিয়ে সাহায্য করা এসব কিছুই হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের পর্যায়ভূক্ত।

ইরশাদ হচ্ছে,

'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশঙ্কায় এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।'[৬২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক সালাত আদায়কারীদের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে সৃষ্টির সেবায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দানের মহিমাও উল্লেখ করেছেন। হযরত আনাস (রা.) (ওফাত ৯১ হি.) বলেন,

'আমি একাধারে দশ বছর প্রিয় নবী (সা)-এর খিদমতে ছিলাম। কখনো তিনি উহ্ কথাটি বলেননি। এসময় তিনি (রা.) তাঁর (সা.)-এর যে পরিমাণ খিদমত করেছেন তার চেয়ে তিনি (সা.) দ্বিগুণ উপকার করেছেন।'[৬৩]

অধ্যাত্মবাদে মেহমানের সেবা ও খিদমতের স্বরূপ

মহান আল্লাহ বলেন,'এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।'[৬৪] অর্থাৎ যারা তার দুয়ারে চায় তারা দানের অংশ তো পায়ই, যারা লজ্জা ও ব্যক্তিত্বের কারণে ঘরে বসে থাকেন তারাও তাদের অংশ পান।

মহান রব আরো বলেন, 'আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়।'[৬৫] প্রিয় নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।'[৬৬]

মহানবী (সা.) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সৃষ্টির সেবা করতেন এবং তিনি (সা.) সৃষ্টির প্রতি সেবা ও খিদমতের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। 'একদিন এক লোভী ইয়াহুদি রাসুল (সা.)-এর মেহমান হয়। রাসুল (সা.) সযত্নে তার মেহমানদারী করেন। লোকটি পরিবারের সব খাবার খেয়ে ফেলে। ফলে তার পেটে পীড়া হয়। রাতে বিছানায় মল-মূত্র ত্যাগ করে ভোরে অন্ধকার থাকতেই লজ্জায় সে সরে পড়ে। কিছুদূর যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি যাওয়ার কারণে তার পেছনে ফেলে যাওয়া মূল্যবান তরবারির কথা মনে পড়ে এবং সে নবী (সা.)-এর বাড়ির দিকে ফিরে। সেখানে পৌঁছে দেখে, নবী (সা.) নিজ হাতে তার নাপাক বিছানাগুলো পরিষ্কার করছেন। এদৃশ্য দেখে সে হতবাক। প্রিয় নবী (সা.) দূর থেকে তাকে দেখেই বললেন: 'বাবা! রাতে তোমার কতইনা কষ্ট হয়েছে। আমার উচিত ছিল রাতে দু'একবার এসে তোমার খোঁজ-খবর নেয়া। কিন্তু আমি তা করতে পারিনি বলে দুঃখিত। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমার ফেলে যাওয়া মূল্যবান তরবারিটি নিয়ে যাও।' ইয়াহুদি লোকটি আরো হতবাক হয়ে গেল। সে এই অভূতপূর্ব ব্যবহার দেখে সাথে সাথে কালিমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।'[৬৭]

'জনৈক ব্যক্তি প্রিয় নবী (সা.)-এর মেহমান হয়। নবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন: আজ রাতে আমার এ মেহমানকে কে গ্রহণ করতে পারে? উত্তরে আবু তালহা (রা.) বললেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি মেহমানকে সঙ্গে করে নিয়ে হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) নিজ ঘরে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, নবী (সা.)-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, আল্লাহর শপথ! বাচ্চার খাদ্য ছাড়া ঘরে অতিরিক্ত কিছু নেই। আবু তালহা (রা.) বললেন, বাচ্চা রাতে খানা চাইলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিও। মেহমান মেজবান ছাড়া খেতে চাইবে না, তাই তুমি বাতিটা নিভিয়ে দিও। তাহলে রাসুল (সা.)-এর মেহমানকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ানো যাবে। স্ত্রী তাই করলেন। এভাবে অন্ধকারে নিজে না খেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও রাসুলের (সা.) সন্তুষ্টির জন্য মুখে শব্দ করে খাওয়ার ভান করেন। সকালে নবী (সা.) সাহাবীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ এ কাজে খুবই খুশি হয়েছেন।'[৬৮]

আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সৃষ্টির সেবা

আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টির সেবার মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি নিহিত রয়েছে। একদিকে, যেমন সৃষ্টির সেবা ও তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদাসীনতার ফলে অনেকের জীবনেই কাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে, তেমনি এক জাতীয় দারিদ্র ক্লিষ্ট বুভুক্ষ ও সর্বহারা নাস্তিক এবং অমুসলিমদের অপপ্রচারে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে তাদের কাতারভূক্ত হচ্ছে। সুতরাং সহায়-সম্বলহীন, ছিন্নমূল ও বাস্তুহারাদের সেবায় নিজেকে নিবেদিত প্রাণ করার মধ্য দিয়ে খোদাপ্রেম ও সান্নিধ্য লাভের নিমিত্ত সদা সর্বদা সচেষ্ট হওয়া সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে প্রয়োজন বিশেষত অধ্যাত্মবাদী সাধকদের জন্য অপরিহার্য ও অবধারিত। আত্মত্যাগ ছাড়া আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা মানুষকে হীনতা, নীচতা ও পরিণতি স্বরূপ জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, 'মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি।'[৬৯] তাই প্রতিনিধি হিসেবে সারা জাহানের তামাম মাখলুকের প্রতি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সমগ্র জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

অধ্যাত্মবাদে সৃষ্টির সেবার আওতা ও পরিধি

সৃষ্টির সেবাকে ইবাদত বলা হয়। আধ্যত্মিকতায় সাফল্য লাভ করার ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার জন্য ইসলাম সর্বোচ্চস্তর হতে সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত সকল শ্রেণীর সৃষ্টিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর ইবাদত, রাসুল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ, মাতা-পিতার খিদমত করা এবং মাতা-পিতার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী স্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট মাতার অগ্রাধিকারকে সর্বাধিক ইহসানের সাথে আদায় করা ইত্যাদি এর আওতাভূক্ত। কালামে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে: 'তোমরা আল্লাহর অনুগত্য কর ও রাসুলের আনুগত্য কর।'[৭০] আরো বলা হয়েছে: 'যে রাসুলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।'[৭১] রাসুল (সা.) আল্লাহর প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। প্রিয় হাবীব (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে: 'যখন নবী তোমাদের ডাকে, তখন তার ডাকে সাড়া দাও।'[৭২]

ইসলামে রাসুল (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে ইবাদত হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অধ্যাত্মবাদী সাধকগণ আধ্যাত্মিকতার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে অভিহিত করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন।

আবু সাইদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) হতে বর্ণিত,

'তিনি বলেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসুল (সা.) আমার পাশ দিয়ে যেতে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট তৎক্ষনাৎ না গিয়ে সালাত শেষ করে গেলাম। এতে তিনি আমাকে বললেন, তোমার আসতে কি বাধা ছিল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি সালাতে রত ছিলাম। এ রিওয়ায়েত, আবু যর (রা.), উসাইলী (র.) ইবন আসাকির (র.) প্রমুখের রিওয়ায়েতে আছে।[৭৩] তখন তিনি বললেন: আল্লাহ কি বলেন নি? হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও।'[৭৪]

সাহাবী সা'দের (রা.) মা তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আহারাদি ছেড়ে দিয়ে মরণাপন্ন হলে ইসলাম ও রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য ত্যাগ করার কথা বলা হয়নি বরং ভাল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছিল। রাসুল (সা.)-এর পরে মা-বাবার সেবা সবার আগে প্রাধান্য পাবে। আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'য়ালা বলেন: 'তোমাদের প্রতিপালক আদেশ দিচ্ছেন, তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।'[৭৫] এ আয়াতের মর্মানুসারে যদি সন্তান নফল ইবাদতে রত থাকে এবং মা সে অবস্থায় তাকে ডাকেন, তবে নফল ইবাদত ছেড়ে মায়ের ডাকে সাড়া দিয়েও তার সেবা করতে হবে। কেননা, তাদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।[৭৬] হযরত ওয়ারেশ কারনী (রা.) (মৃ.৩৬ হি.), জুনায়েদ বাগদাদী (র.) (মৃ.২৯৭ হি.), বায়েজিদ বুস্তামী (র.) (মৃ. ১৩৩৪ হি.) ফরিদুদ্দিন আত্তার (র.) (মৃ. ১২২৯ খ্রি.) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত ওলীগণ মায়ের সেবার বিনিময়ে এত বড় মর্যাদা লাভ করেছেন।

সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'তোমার পিতামাতা যদি পীড়াপীড়ি করে আমার সমক্ষ দাঁড় করাতে চায় তবে যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তাদের কথা মেনো না। পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।'[৭৭] এই আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হয়। আমি আমার মা'র প্রতি অনুগত ছিলাম যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন মা আমাকে বললেন, 'হে সা'দ ! তুমি নাকি নতুন দ্বীন গ্রহণ করেছ? তুমি এ দ্বীন ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি পানাহার করব না এবং সে অবস্থাতেই মারা যাব। আর তখন তোমাকে সবাই ডাকবে 'হে মায়ের খুনী বলে'। আমি বললাম আপনি একাজ করবেন না। কারণ কোন অবস্থাতেই আমি দ্বীন ছাড়তে পারব না। এভাবে একদিন ও একরাত কেটে যায়। মার অবস্থা চরমে পৌঁছে। আমি অবস্থা লক্ষ্য করে বললাম, 'মা, আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহর কসম, যদি আপনি একশ'টি প্রাণের অধিকারী হন আর একটি একটি করে তা বের হয়ে যায় তবু আমি এ দ্বীন ছাড়ব না। এখন আপনার ইচ্ছা হলে খেতে পারেন, না ইচ্ছা হলে না খেতে পারেন। তখন তিনি খাবার গ্রহণ করেন।'[৭৮]

ইসলাম মানুষের সেবার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপের সাথে সাথে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা তথা যাবতীয় সৃষ্টিকুলের প্রতি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত স্বরূপ যে জীবনোপকরণ লাভ করে তা থেকে সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করলে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে এবং সেই ব্যক্তি মুত্তাকী হিসেবে সম্মানিত হবেন।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে: 'এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এ মুত্তাকীদের পথ দেখায়; যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত আদায় করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে।'[৭৯]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইমান বিল গাইব (অদৃশ্যে বিশ্বাস) ও সালাত কায়েমের পর সৃষ্টির সেবায় মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ও নিয়মের মধ্যে যাকাত ও দান খয়রাতের মাধ্যমে সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। যারা এটি যথা নির্দেশে করে তারাই সফলকাম হয়। অধ্যাত্মবাদের মহান উদ্দেশ্য হল আল্লাহর প্রেম লাভ করা। আর সে প্রেম ও ভালবাসা হাসিল হতে পারে সৃষ্টির সেবা ও পরোপকারের মাধ্যমে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত,

'উক্ত আয়াত হযরত আলী (রা.)-এর সম্পর্কে নাযিল হয়। আলী (রা.) ইয়াহুদির কাজ করে কিছু খাদ্য যব সম্মানীস্বরূপ লাভ করেন। তারপর এক তৃতীয়াংশ পিষে পরিষ্কার করে খাদ্য তৈরি করে খেতে বসেন। এমতাবস্থায় একজন মিস্কীন এসে খাদ্য চায়। তখন তিনি (রা.) মিস্কীনকে খাদ্য দান করেন। তারপরদিন দুই তৃতীয়াংশ খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। তখন এক ইয়াতীম এসে খাদ্য চায়। তিনি তাকে খাদ্য প্রদান করেন। অতঃপর তৃতীয় দিন বাকী অংশ পাক করা হলে একজন মুশরিক বন্দী এসে খাদ্য চায়। তিনি তাকে তা দিয়ে দেন এবং রাত ও দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকে যান। তখন এ আয়াত তার শানে নায়িল হয়।'[৮০]

আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন: 'তারা আহার্যের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্দীকে দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্য তোমাদের আহার্য দান করি; আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও চাই না।'[৮১] এই আয়াতে কারীমার শানে নুযূলের সাথে সংশ্লিষ্ট আলী (রা.) (শাহাদত ৪০ হি.)-এর দানশীলতার ঘটনা উল্লোখযোগ্য। 'তিনি রোযা অবস্থায় ইফতারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সামনে থেকে ইফতারির সামগ্রী ক্ষুধার্ত মিস্কীনকে দান করে দেন।'[৮২] হযরত আবু তালহা (রা.) নবী (সা.)-এর মেহমানকে পেট পুরে ও তৃপ্তি সহকারে আহার করানোর জন্য বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে নিজে না খেয়ে মুখে খাওয়ার শব্দ করেন।

হিজরতের পর আনসারগণ মুহাজির ভাইদের জন্য এতদূর মহানুভবতা প্রদর্শন করেন যে, নিজের দু'স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে অন্য মুহাজির ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। ইবন উমর (রা.) বর্ণনা করেন,

'জনৈক সাহাবীকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়া পেশ করা হলে তিনি বললেন, অমুক ভাই ও তার পরিবার-পরিজন অতি কষ্টে আছে তার কাছে পাঠিয়ে দিন। একে অপরের নিকট এভাবে পাঠাতে থাকায় সাতজনের নিকট পৌঁছে। শেষে হাত বদল হয়ে ফের প্রথম জনের নিকট ফিরে আসে।'[৮৩]

এ মহানুভব ব্যক্তিদের উদারতা ও দানশীলতা উম্মতের উত্তরকালের প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে ভাস্বর হয়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির প্রতি অনন্য সাধারণ ও অতুলনীয় এ দানশীলতার দৃষ্টান্ত সাহাবী বিশেষত: হযরত আলী (রা.)-কে শাহে বিলায়েতের সর্বোচ্চ মার্গে পৌঁছে দিয়েছে। তাই অধ্যাত্মবাদী সাধকগণ এ ধারায় তাঁদের সার্বিক উন্নতির জন্য এ পথকেই বেছে নেন।

রাহমাতুল্লিল আ'লামিন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন: 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রোগীর সেবা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর।'[৮৪] তিনি (সা.) আরো ইরশাদ করেন: 'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।'[৮৫] রাব্বুল আ'লামিন বলেন: 'সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?'[৮৬]

একজন অধ্যাত্মবাদী সাধককে ইবাদত ও যিকরে ইলাহীতে রত থাকার সাথে সাথে মানব কল্যাণ ও মানব সেবায় নিবেদিত প্রাণ হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'আলা আরো বলেন: 'তুমি পরোপকার করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'[৮৭] পৃথিবীবাসীর ওপর অনুগ্রহ প্রদর্শনের তাকীদ দিয়ে রাসুল (সা.) বলেন: 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।'[৮৮]

আধ্যাত্মিকতা ও সৃষ্টির সেবার ব্যাপকতা

'একজন জ্ঞানহীন পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক জ্ঞানের আলো দান করা এবং তাকে ইল্‌ম ও আমলে সঠিক সন্ধান ও সবক দিয়ে আল্লাহর মনযীলের পথের পথিক করে দেয়া উচ্চস্তরের 'রূহানী খিদমত'। পক্ষান্তরে, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক ও জৈবিক চাহিদার সংস্থান ও ব্যবস্থা করা বৈষয়িক সেবা বা দুনিয়াবী খিদমত।'[৮৯]

ব্যাপক অর্থে এবং যুগপৎভাবে সৃষ্টির সেবা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় দিককেই নির্দেশ করে। প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী সাধক দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জীবনে সফলতা লাভের নিমিত্ত সর্বদা নিজেকে সচেষ্ট ও হৃদয়কে

নিবিষ্ট করার মাধ্যমে সার্থকতা খুঁজতে চেষ্টা করেন এবং সেটিকেই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। সাধারণত মানুষ স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। তাই সে নগদ যা পায়, তাই হাত পেতে নিতে চায়। আর আখিরাতের স্থায়ী প্রতিদান আপাত দৃষ্টিতে বাকী ও অদৃশ্য। সেজন্য সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না বরং ক্ষণস্থায়ী ও সীমিত জীবনের উন্নতি ও সুখ-শান্তির জন্য জাগতিক ও বৈষয়িক বস্তুগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয়; পারলৌকিক নিয়ামতের ওপর গুরুত্বারোপ করে না।[৯০]

মানুষের এ স্বভাবজাত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে পারস্যের কবি ওমর খৈয়্যাম[৯১] (ওফাত ১১২৪ খ্রি.) বলেন,

'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও,

বাকীর খাতায় শূন্য থাক।'–(রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়্যাম)

"ওঠো, চলমান জগৎ নিয়ে দুঃখ কর না,

প্রফুল্ল থাক, একটি মুহূর্ত কাটাও আনন্দের মাঝে

জগতের স্বভাবে যদি থাকত কোনো বিশস্ততা

তোমার কাছে আসত না পালা অন্যদের কাছ থেকে।" (রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়্যাম)

এই রোবাঈয়াতে খাইয়ামের উক্ত চিন্তা দর্শনই পরিস্ফুটিত হয়েছে।[৯২]

কবি কোন পরিবেশে একথা বলেছিলেন, অনেকে এতত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকে মনোযোগী না হয়ে পার্থিবতামুখী ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। অপরপক্ষে, একশ্রেণীর মুরশিদীন, যাকিরিন–যিকর, তাসবীহ, মুসল্লা নিয়ে আত্মতুষ্টি ভোগ করেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে গুরুত্বহীন মানসিকতা পোষণ করেন। ফলে সমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে দেখা যায়। উদারতা, দানশীলতা, পরার্থপরতা ইত্যাদি মৌলিক মানবিক গুণগুলোর চর্চা ক্রমেই হ্রাস পাবার পরিবেশ ও প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে প্রকটভাবে হীনতা, নীচতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও দুনিয়ামুখিতা বৃদ্ধি পায়; যা সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যধন্য হওয়ার সাধনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। অপরকে কিছু দেয়ার চেয়ে তার থেকে কিছু গ্রহণের মনোবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেন: 'ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।'[৯৩] বস্তুত: দানশীল ব্যক্তির হাত গ্রহীতার হাত হতে শ্রেষ্ঠ উল্লিখিত হাদিসে একথারই ইঙ্গিত রয়েছে, আর এ পথেই আধ্যাত্মিক উন্নতি একথারই গুঞ্জন কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে:

'তাসবীহ এবং সিজদাহ দেখে আল্লাহ তা'লা ভুলবে না,

মানব সেবার কুঞ্জী ছাড়া বেহেশ্‌ত দুয়ার খুলবে না।'[৯৪]

এপ্রসঙ্গে উর্দুতে আরো বলা হয়েছে: 'দরদে দিলকে রিয়ে পয়দা কিয়া ইনসান কো' অর্থাৎ মানুষের সেবার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যথায়, ইবাদত বন্দেগীর জন্য মানুষ ছাড়াও অগণিত সৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহর যিক্‌র ও ফিক্‌র আলমে আরওয়া-এ চলতে পারতো। তবুও কেন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হলো? এর কারণ, মানুষ মানুষের সেবায় জান-মাল বিলিয়ে দেয় কিনা তা দেখা এবং যমীনে আল্লাহর রবুবীয়াত প্রতিষ্ঠা করা।[৯৫] মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার প্রতিনিধি হিসেবে।

মহান রব এ প্রসঙ্গে বলেন,

'আমি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছি এটা পরীক্ষা করতে যে তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ?'[৯৬]

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, মাখলুকের খিদমত ও মানবদেহের যাকাত আদায়

মানুষ তার আকৃতি, গঠন, মানবীয় গুণ, বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা ও বোধ এই গুণগুলোর কারণে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর মানুষ তার এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে উৎকর্ষ সাধন করে চরম সীমায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। একজন অধ্যাত্মবাদী সাধকও তার সাধনায় উৎকর্ষ লাভে সক্ষম হয় যদি তিনি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরুষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন এবং অনুসরণ করতে পারেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা হবার অন্যতম কারণ হলো মহান সৃষ্টিকর্তা মানবদেহকে ২০৬ টি অস্থি যুগলে সংযোজন করে সৃষ্টি করেছেন; যা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম আকৃতি ও গঠন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। রাব্বুল আ'লামিন বলেন: 'নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট গঠনে সৃষ্টি করেছি।'[৯৭]

এ অস্থি যুগলের সাদাকাহ্‌ প্রদান করা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। এ সম্পর্কে নবী (সা.) বলেন: 'প্রতিটি অঙ্গ দ্বারা অন্তত একটি সাদাকাহ্‌ আদায় করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব। দু'জন লোকের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, কোন লোককে তার যানবাহনের ওপর বোঝা ওঠাতে সাহায্য করা, কোন ব্যক্তির সাথে একটি ভাল কথা বলা, নামাযের জন্য মসজিদে এগিয়ে যাওয়া, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি সাদাকাহ্‌।'[৯৮]

একজন ওলীর জন্যও প্রতিটি সাদাকাহ্‌ দেয়া সহজ হত না। কিন্তু, আল্লাহ তা'আলা তা সহজে আদায় করার ব্যবস্থা করেছেন। 'ইহজগতে যে যেমন সৃষ্টির সেবা করবেন, পরজগতে ঠিক তেমনি তার বিনিময় পাবেন। আর সেখানে কোন সাহায্যকারী থাকবে না।'[৯৯]

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআন পাকে বলেছেন,

‘আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতিই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল।’[১০০] ‘সেদিন মানুষ ভিন্ন দলে প্রকাশপাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।’[১০১]

এ সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেন: ‘যে কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে বস্ত্র দান করে; আল্লাহ তা’য়ালা তাকে বেহেশ্‌তে সবুজ রংয়ের পোশাক দান করবেন। যে মুসলিম অপর একজন মুসলিমকে ক্ষুধার সময় খাদ্য দান করে; আল্লাহ তাকে বেহেশ্‌তের ফল দান করবেন। আর যে মুসলিম অপর মুসলিমকে পিপাসার সময় পানি পান করায়; আল্লাহ তাকে সীলমোহরযুক্ত পানপাত্র থেকে পবিত্র পানি পান করাবেন।’[১০২] ‘জগতে মানুষ ছাড়াও আল্লাহর অগণিত সৃষ্ট জীব রয়েছে, যাদের কেউ কখনো কখনো মানুষের অজ্ঞাতে অজান্তে তার ফসল হতে কিছু খেয়ে ফেলে। এর বিনিময়েও সে ব্যক্তি সৃষ্টির সেবার সওয়াবে পুরষ্কৃত হয়ে থাকেন।’[১০৩]

রাসুলে আকরাম (সা.) বলেন:

‘কোন মুসলিম যদি একটি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা শস্য বপন করে, অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ, পাখি বা কোন জীবজন্তু তার অজান্তে খেয়ে ফেলে, তাহলে তা তার সাদাকাহ্ করার সওয়াব হিসেবে পরিগণিত হবে। যদি সেখান থেকে চোরও চুরি করে নিয়ে যায়, তা তার জন্য একটি সাদাকাহ্ বলে আল্লাহর দরবারে বিবেচিত হবে।’[১০৪]

কাজেই কেউ যদি নিজেকে আল্লাহর করে ফেলে তবে তার হারানোর কিছুই নেই; বরং শুধুই প্রাপ্তি। তখন আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা’আলা সবকিছুকেই তার জন্য নিবেদিত করাবেন এবং আল্লাহ তার সেই বান্দার প্রতিটি কাজ ও তার ব্যয়কৃত সম্পদের প্রতিদান দিবেন। ‘সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।’[১০৫] ‘এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’[১০৬]

একজন আধ্যাত্মিক সাধককে আত্মিক সফলতার নিমিত্ত নামায, রোযা, মুরাকাবা-মুশাহাদায় তৎপর ভূমিকা পালন করার সাথে সাথে মানুষের সাহায্যার্থে তাদের সাথে প্রসন্নচিত্তে প্রসারিত হস্তদ্বয় বাড়িয়ে দেয়া আবশ্যক। ধন-সম্পদ দ্বারা কৃত অন্যান্য দুনিয়াবী ইবাদতের ন্যায় মানুষের সাথে হাসি-খুশি, মিলে-মিশে থাকাও সাদাকাহ্ আদায়ের সমান সওয়াবের কাজ।

রাসুলে পাক (সা.) বলেন: 'হাসিমুখে তোমার ভাইয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সাদাকাহ্, কোন লোককে ভাল কাজ করতে তোমার আদেশ দানও সাদাকাহ্, কোন লোক অপরিচিত স্থানে পথ হারালে তাকে পথ দেখিয়ে দেয়াও সাদাকাহ্, যদি কোন লোক চোখে কম দেখে, তাকে পথ চলতে একটু সাহায্য করাও সাদাকাহ্, পথের কাঁটা-অস্থি প্রভৃতি সরিয়ে দেয়া সাদাকাহ্, তোমার বালতি হতে পানি ঢেলে অপরের বালতিতে ভরে দেয়াও তোমার জন্য সাদাকাহ্ বলে পরিগণিত হবে।'[১০৭]

সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির সেবার মধ্য দিয়ে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হয়। এ বিষয়টি চিন্তাশীল হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে মানুষের বিশেষত অধ্যাত্মবাদের সাধকদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং সেটিই আবশ্যক। কেননা, মানুষ ছাড়াও পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা প্রভৃতির দিকে সেবার বাহু প্রসারিত করলে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের মধ্যে 'খিদমতে খাল্ক' (সৃষ্টির সেবা) করার ন্যায় মহৎ গুণটি পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠে।

এ সম্পর্কে রাসুল (সা.) একটি ঘটনার অবতারণা করেন:

'একজন পতিতা পথ দিয়ে যাচ্ছিল। একটি কুকুরকে কূয়ার পাশে পিপাসায় কাতর ও মৃতপ্রায় দেখে তার দয়া হলো। সেখানে কূয়া হতে পানি ওঠানোর কোন বালতি বা রশি ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে সে নিজের পায়ের চামড়ার মোজা খুলে স্বীয় চাদর দ্বারা বেঁধে কূয়া হতে পানি ওঠালো এবং কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করল। এ কাজটিতে আল্লাহ তার প্রতি এত খুশি হলেন যে তার জীবনের পাপগুলো ক্ষমা করে তাকে কবুল করেন।'[১০৮]

সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টাকে লাভ করা যায়। আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওযূ, নামায-রোযা, তাসবীহ-তাহলীলের ইবাদত করার জন্য মানুষকে পৃথিবীতে না পাঠিয়ে 'আলমে আরওয়াই-এ-ই' (আত্মিক জগত যা সৃষ্টির পূর্বে ছিল) রাখলেই চলতো।[১০৯] সেখানে ফেরেশতাদের ন্যায় যিকর-ফিকরেই মানুষ মগ্ন থাকতে পারতো। আর তা-ই যদি কাম্য হয়, তাহলে ফেরেশতারা এব্যাপারে যথেষ্ট ছিলেন, মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো না। কারণ গোটা সৃষ্টিই উক্ত কাজে নিয়োজিত ও সদা নিরত। ফেরেশতাগণ তো দিন-রাত, দাঁড়িয়ে-বসে রুকূ সিজ্দাহবস্থায় আল্লাহর যিকরে কাল থেকে মহাকাল অতিবাহিত করছেন। 'ফেরেশতাদের চেয়ে ওই মানুষ শ্রেষ্ঠ যে পার্থিব জঞ্জালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও সৃষ্টির সেবার মধ্য দিয়ে অবসর সময়ে আল্লাহকে ডাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় এত কম কেন? কারণ, মানুষ অধিকাংশ সময় সংসার-ধর্মে এবং সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তা-ই চান।'[১১০]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

'যখন নামায সম্পাদন হবে, তখন তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা অনুসন্ধানের কাজে আত্ম-নিয়োগ কর।'[১১১]

কুরআনে কারীমে ছয় হাজারের অধিক আয়াত রয়েছে। এর পাঁচ শ' আয়াত নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, প্রভৃতি ইবাদতের নির্দেশমূলক। অবশিষ্ট আয়াতমালা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার নির্দেশনার লক্ষ্যে। আর সেবামূলক এ কাজগুলো আল্লাহর কল্যাণকর বিধানের প্রতি মানুষকে দৃঢ় আস্থাশীল করে তুলবে; আল্লাহর জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করবে, কল্যাণ ও শান্তির আদর্শবাহী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণে আগ্রহী করবে।[১১২] খিদ্‌মতে খালক আল্লাহকে পাওয়ার সহজ-সরল ও যথার্থ পথ ও পদ্ধতি তা একটি হাদিসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়। হাদিসে কুদসিতে[১১৩] উল্লিখিত হয়েছে:

'শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন; আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাদ্য দাও নি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাও নি; আমি পীড়িত ছিলাম তুমি আমার সেবা শুশ্রূষা করনি। একথা শুনে বান্দা অবাক হয়ে আরয করবে, হে প্রভু! তুমি অভাবমুক্ত। কেমন করে তুমি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত এবং পীড়িত হতে পার?। উত্তরে আল্লাহ বলবেন: আমার অমুক বান্দা পিপাসার্ত হয়ে তোমার দুয়ারে উপস্থিত হয়েছিল, তুমি তাকে খাদ্য ও পানীয় দাও নি। যদি দিতে, তুমি আমাকে সেখানে পেতে। তোমার জানা উচিত ছিল, আমার বান্দার সেবা করলে আমারই সেবা করা হত এবং আমি তাতেই সন্তুষ্ট। আল্লাহ বলেন: সৃষ্টি নিশ্চয় আমার পরিবার; সুতরাং তোমরা সৃষ্টিকে ভালবাসবে; তবে আমাকে পাবে।'[১১৪] হাদিসে কুদসীতে আছে, 'আল-খাল্‌ক আয়ালুল্লাহ ফাউহিব্বুল খাল্‌ক।' আল্লাহ বলেন, 'সৃষ্টি নিশ্চয় আমার পরিবার; সুতরাং তোমরা সৃষ্টিকে ভালোবাসবে, তবে আমাকে পাবে। অতএব, আল্লাহ প্রাপ্তির সঠিক পথ তার সৃষ্টির হক আদায় করে তাদের ভালবাসা অর্জন করা।'[১১৫] ইসলাম সেবা, মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম। সৃষ্টির সেবার নির্দেশনা ইসলাম থেকেই উৎসারিত। আর সেই ইসলামই অধ্যাত্মবাদের প্রাণকেন্দ্র।

সমন্বিত ব্যক্তি মানস গঠনে অধ্যাত্মবাদ

মানব সভ্যতার ইতিহাস যখন থেকে লেখা শুরু হয় তখন থেকেই ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ মানব সভ্যতার প্রতিটি বিষয়ের কোন না ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাক্ষ্যের অপেক্ষা না করেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার গোড়া পত্তন হয় মানব জাতির সূচনালগ্ন

হতেই। তার কারণ, আধ্যাত্মিকতা মানুষের সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে ঠিক তেমনিভাবে জড়িত; যেমনিভাবে ষড়রিপু তাঁর সত্তার সাথে জড়িত রয়েছে; আর তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মানব জীবনের কোন না পর্যায়ে কোন না কোন সময়ে প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় সত্তার মাঝে এ অধ্যাত্মবাদী মানস ও অনুভূতির সন্ধান লাভ করতে পারে। ষড়রিপু যেমন সৃষ্টির আদি থেকেই মানব সত্তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত–ঠিক তেমনি তার এই অধ্যাত্মবাদী সত্তা তার জীবন ও চরিত্রের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তাই চিরায়ত ধারায় মানুষের অধ্যাত্মবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্নভাবে। ধর্মের মৌল অনুভূতি মানুষ এই আধ্যাত্মিক মানস দ্বারাই অনুধাবন করতে শিখেছে।[১১৬]

ফলে গড়ে ওঠেছে এক সুস্পষ্ট চিন্তাধারা, একটি বিষয়বস্তু (Subject matter) সম্পূর্ণ স্বাধীন (Independent-অন্যদিকের সাথে সমন্বয় নিরপেক্ষ) এক জীবনধারা যাকে অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) নামে অভিহিত করা হয় এবং যা মুসলিম সমাজে সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতা বা অধ্যাত্মবাদী জীবনধারা হিসেবে পরিচিত।

বর্তমান চরম বস্তুবাদী সভ্যতার যুগেও এই আধ্যাত্মিক মানসের উপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। বরং তা মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও মৌলিক মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধনে এবং তার উন্নীত করণে সর্বোপরি সমন্বিত ব্যক্তিমানস গঠনে অপরিসীম ভূমিকা রেখে চলেছে অবিরতভাবে। বর্তমান যুগের বস্তুবাদী সভ্যতা প্রবল পরাক্রমশালী শক্তি ও সত্তার ন্যায় অধ্যাত্মবাদী এ প্রবণতাকে অস্বীকারপূর্বক সহস্র কঠিন বাঁধুনি দিয়ে দমন করার চেষ্টায় নিরত থাকলেও অধ্যাত্মবাদ প্রয়োজনানুসারে মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে পারে না। অস্বীকৃতির প্রাবল্য ও মানব জীবনে আজকের বস্তুবাদী জগতের ধ্বংসস্তুপের মধ্যেও এই অধ্যাত্মবাদী মানস একটি আশার প্রদীপের ন্যায় তার আলোক বিচ্ছুরিত করে চলেছে।

ইসলামে মানুষের এই অধ্যাত্মবাদী মানসকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। আধ্যাত্মিক মানসকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে এর বিকাশ-ব্যবহার ও বিস্তৃতিকে হুকুমে-এলাহীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দ্বীন ইসলাম হল মানুষের ফিত্‌রাতী (প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য) ধর্ম। কেননা, ইসলাম মানুষের সহজাত এবং স্বভাবজাত প্রকৃতি (Natural traits) ও বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে না বরং সুসামঞ্জস্য মাত্রায় (Blanced limit) সীমিত করে স্বীকৃতি প্রদান করে। ষড়রিপুর ব্যাপারেও ইসলাম নফসানিয়াত ও রুহানিয়াত উভয়ের সমন্বয় সাধন (Blending বা Combination) এবং সামঞ্জস্য আনয়নের বিধি-ব্যবস্থাকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সঠিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানেই নিহিত। বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয় এই সূত্রের (Formulae) মাধ্যমেই। আপাদমস্তক একজন বস্তুবাদী ব্যক্তি অথবা কেবল অধ্যাত্মবাদী চেতনায় নিবিষ্ট একজন

সাধক কখনই প্রকৃত অর্থে মু'মিন বা তাওহীদপন্থি হয়ে উঠতে পারেন না। একজন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে নিজেকে ইসলামপন্থি হিসেবে গড়ে তুলতে তখনই সক্ষম হন যখন বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ উভয়ের সমন্বয় সাধনে সমর্থ হন। মানবজীবনে উভয় দিকই হচ্ছে তার জন্য প্রয়োজনীয় (Utilisation aspect) ও আবশ্যিক (Essential) এবং একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্পূর্ণ। কেননা, উভয়েই উভয়েরে পরিপূরক। অধ্যাত্মবাদ এভাবেই বস্তুবাদের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে মানব-চরিত্রের অপরিহার্য অংশ 'ব্যক্তি মানস'-এর পরিপূর্ণতা গঠনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

সাহাবা-ই-কেরামের জীবনী হতেই এর শ্রেষ্ঠ পরিচয় আমরা পাই। জিহাদী জীবন-ত্যাগ-তিতিক্ষার সাধনা-সংগ্রামের জীবন তাদের বস্তুজগতের সবটুকুর মধ্যেই তাঁরা ছিলেন জড়িয়ে, ক্ষুধা-ভয়-ভীতি-অনটন কোন কিছু থেকেই মুক্ত ছিলেন না তারা; তবুও সমান্তরালভাবে সংগ্রাম-জিহাদ চালিয়ে গেছেন তারা, আর সাথে সাথে আল্লাহর ধ্যান হতেও বিচ্যুত হননি। তাদের সালাতে (Concentration বা ধ্যানমগ্নতা) ছিল তাই এত গভীর এবং এটিই ছিল তাঁদের আধ্যত্মিক মানস বা রূহানী শক্তি গড়ে তোলার মূলে। তাঁদের আধ্যাত্মিক মানস একদিকে কম্পাস-এর মত প্রত্যেককে নিজের কাছে সঠিক পথে থাকার নিশ্চয়তা দিয়েছে, অন্যদিকে অনুপ্রাণিত করেছে বস্তুজগতে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে। এটিই হচ্ছে মর্দ-ই-মু'মিনের আসল পরিচয়–জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা।[১১৭]

ইসলাম, আধ্যাত্মিকতাশূন্য শুধু বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা নির্ভর জীবন বা জাগতিকতাশূন্য কেবল আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ এ দু'ধরনের জীবনকেই অস্বীকার করে। কেননা, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন যে: 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই।' আল্লাহ পাক বলেন, 'আর বৈরাগ্যবাদ, সে তো তারা নিজেরোই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি।'[১১৮]

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাত্মবাদ ও আধ্যাত্মিক মানসের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ প্রদানের দিকটি ইসলামের বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ে সুসামঞ্জস্য ও সমন্বিত ব্যক্তি মানস গঠনের দৃঢ় পরিচয় বহন করে। কিন্তু ইসলামের এই উৎসাহ ও সমর্থন প্রদানের বিষয়টির কোন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত প্রচার বা ব্যবহার করা কিংবা বর্তমান পতন উন্মুখ সমাজের ন্যায় বাণিজ্যের উপাদানে পরিণত করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, সেটি রাসুল (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথের অনুগামী নয়। আল্লাহর রাসুল (সা.) এসেছিলেন সরল-সঠিক ও কল্যাণকামী পথের সন্ধান নিয়ে; যে পথে কোন বক্রতা নেই, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা দিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ, তিনি দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত ও মানব জাতির মুক্তির দূত। তিনি (সা.) যে পথে মুক্তির,

বিজয়ের ও শান্তির পথ নির্দেশ করেন নি; সে পথের অনুসরণের চেষ্টা করা বিদ্'আত ও জাহিলিয়াতের সমতুল্য এবং তা বাতিল বলে গণ্য। বিদ'আত সম্বন্ধে প্রিয় হাবীব (সা.) বলেন: 'প্রতিটি বিদ'আতই গুমরাহী আর প্রতিটি গুমরাহীর পরিণাম হল জাহান্নাম।'[১১৯]

বর্তমান অবক্ষয়মুখী সমাজে তাই এতদ্বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি, সতর্ক ও অনুসন্ধিৎসু মন-মানসিকতা বজায় রাখা আবশ্যক। তবেই অধ্যাত্মবাদ, আধ্যাত্মিক মানস ও সমন্বিত ব্যক্তি মানস গঠনে অধ্যাত্মবাদের সার্থকতা। অন্যথায়, ইসলামের সারাৎসার হতে উদ্ভূত অধ্যাত্মবাদ তরিকত পন্থার বাড়াবাড়ি, ভুল অনুপদ্ধতি ও অপপ্রচারে তার মর্যাদা হানির আশঙ্কায় নিমজ্জিত হবার পথ সৃষ্টি করলে তা হবে পরিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদের চর্চার অন্তরায়।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক

আল্লাহ সুবহানাহুয়া তা'আলা সকল জ্ঞানের উৎস। মহান রব তাঁর জ্ঞানের এই বিশাল ভান্ডার হতে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একটি অংশ তাঁর প্রিয় 'খলিফাতুল্লাহ' ও 'আশরাফুল মাখলুকাত'কে দান করেছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে চরম উৎকর্ষ সাধন করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। মহান রাব্বুল আ'লামিন তাঁর জ্ঞানের এ মহিমাকে পৃথিবীবাসির মাঝে বিতরণের নিমিত্ত তাঁর প্রিয় বার্তাবাহক তথা রাসুল ও আম্বিয়াগণকে যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন। স্রষ্টার এ জ্ঞানের বাণী একত্ববাদ, এশ্‌কে এলাহী ও সার্বিক মানব কল্যাণের ইঙ্গিতবহ। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ.) হতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী রাসুলই এই একত্ববাদ, আল্লাহপ্রেম, মানব কল্যাণ ও জীবন পরিচালনার পথপ্রদর্শনকারী জ্ঞানের বাণী প্রচার করে গেছেন। কেননা, ইসলাম শাশ্বত মানবপ্রেম ও শান্তির ধর্ম। ইসলাম শব্দটি আরবি 'সলম' ধাতু হতে উৎপন্ন যার অর্থ একটি অর্থ শান্তি এবং অপর অর্থ আল্লাহ-তে আত্মসমর্পণ।[১২০] মুসলিমরা যেহেতু একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে নিজের সকল বিষয় ও ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেন, আল্লাহর গুণে গুণান্বিত ও তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হন তাই মুসলিমকে আত্মসমর্পণকারী বলা হয়। আর এতেই মু'মিন জীবনের সাফল্য ও সার্থকতা।

রাসুলে আকরাম, নবীকূলের শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির জন্য সত্য, সরল ও সৎ পথের প্রদর্শকরূপে আল্লাহর পক্ষ হতে আগমণ করেছেন। নবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক তাঁর সাহাবা বা সাথীরাও এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহাবাদেরকে (রা.) অনুসরণ ও অনুকরণপূর্বক তাঁদের থেকে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা জীবনে আলোর মশাল জ্বালানো অনুসারীরা তাবে-ই নামে পরিচিত। আর, তাবে-ই-দেরকে যাঁরা জ্ঞানের শিক্ষক

হিসেবে অনুসরণ করেছেন তাঁরা তাবে-তাবে-ই নামে অভিহিত হন। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের এ ধারাকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখাকে আবশ্যক করেছে।

কেননা রাসুল (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরয।'[১২১] আর আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, 'জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে।'[১২২] জ্ঞানের উৎস হিসেবে কুরআন ও হাদিসের গুরুত্বের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক এম. এম. শরীফ বলেন,

'প্রকৃতি যেমন প্রাণীকে কতকগুলো অন্তর ধারণা দিয়ে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিকাশের জন্য রেখে দেয়, ঠিক তেমনি মুসলিম চিন্তাধারার বীজও কোরআন ও হাদীস হতে উৎসারিত এবং এর বিকাশও পূর্ব-অস্তিত্বশীল চিন্তাধারায় অঙ্কুরোদগম ও ফলবিশেষ মাত্র।'[১২৩]

আল্লাহকে অধিক ভয় করা ও তাঁর নৈকট্য লাভে জ্ঞানার্জনের কোন বিকল্প নেই। কারণ, অজ্ঞাত কোন কিছুকে গভীরভাবে ভালবাসা যায় না এবং তার জন্য নিবেদিত প্রাণও হওয়া যায় না। আর আল্লাহকে জানার জন্য আত্ম'কে তথা নিজেকে জানা আবশ্যক। কেননা, হযরত আলী (রা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে তার সৃষ্টিকর্তাকেও চিনেছে নিজেকে চিনেছে।'[১২৪]

প্রভু প্রদত্ত জ্ঞানের অনুসন্ধান ও আত্ম'কে চেনার সাধনায় নবী-রাসুল, তাবে-ইন ও তাবে-তাবে-ইন-গণের উত্তরাধিকারী হিসেবে ওলী-আওলিয়াগণ নিজেদের ব্যাপৃত করেছেন। তাঁরাও শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে যুগে যুগে আল্লাহ প্রেমিকদের পথ দেখিয়েছেন। এমন যুগশ্রেষ্ঠ ওলী-আওলিয়া ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে ইব্রাহিম বিন আদহাম, হযরত বায়েজিত বোস্তামি, আব্দুল কাদের জিলানি, ইবনুল আরাবি, ফরিদুদ্দিন আত্তার, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সর্বদাই একত্ববাদ, আল্লাহপ্রেম ও আল্লাহকে পাবার পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনোই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিলেন না এবং ব্যক্তি পূজার পক্ষপাতে দুষ্ট হননি কিংবা নতুন কোন প্রথাগত ইবাদতের চালুও করেননি। বরং তাঁরা যতই আল্লাহ প্রেমের অমিয় সুধা পান করে এর গভীরে প্রবেশ করেছেন ততই আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছেন। নবী-রাসুলগণ একত্ববাদ ও আল্লাহ প্রেমের বাণী প্রচারের বিনিময়ে কোন দুনিয়াবি প্রতিদানের প্রতি বিমুখ ছিলেন এবং সকল প্রতিদান স্রষ্টার কাছ থেকেই তাঁরা পাবেন এমন বিশ্বাসেই ছিলেন দৃঢ়। নবী-রাসুলগণের ন্যায় তাঁরাও নাম-যশ-খ্যাতির উর্দ্ধে উঠে নিজেদের 'যাহেদীন' (দুনিয়া বিমুখ) রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সদা তৎপর ও সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য, 'আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না । আমার বিনিময় একমাত্র আল্লাহর নিকট হতে।'[১২৫]

নবী রাসুলগণের ন্যায় আধ্যাত্মিক পথের আলোকবর্তিকা বহনকারী আধ্যাত্মিক শিক্ষকগণও শিরক, বিদ'আত ও অপপ্রথার বিরোধী ছিলেন। মরহুম আমীর আলী বলেছেন, Prophethood is a mighty protest against priesthood.[১২৬]

মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ বলেছেন,

'তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে শুধু তারই অনুসরণ করো, এছাড়া আর কোন তথাকথিত ওলী আওলিয়ার কল্পিত পথে চলো না।'[১২৭] পূর্ববর্তী জাতির অধঃপতন ও বিভক্তির উপমা দিয়ে রাব্বুল আ'লামিন বলেন,'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগণ তাদের পীরদেরকে এবং তাদের মতবাদকে আল্লাহর পরিবর্তে গ্রহণ করে নিয়েছে।'[১২৮]

পূর্ববর্তী জাতিগুলো আল্লাহর পরিবর্তে তাদের পীর ও দরবেশদের গ্রহণ করায় তারা দ্বিধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তারা প্রভাব এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ে। আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য কোন মতবাদ ও পথকে গ্রহণ করার পরিণাম যে কখনোই কল্যাণকর নয় এগুলো তারই দৃষ্টান্ত। পূর্ববর্তী উম্মতগণের অধঃপতন থেকে শিক্ষা না নেয়ায় বর্তমান মুসলিম উম্মার একটি বিপুল অংশ ভ্রান্ত পীর প্রথার নামে ব্যক্তি পূজা, মাজার পূজা, পীরদের বহুবিধ মতবাদ ও বিধানকে গ্রহণ করায় বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতার যাঁতাকলে পিষ্ট। আর এ ভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতির সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ এ বিভক্তির ব্যাপারে সতর্ক করে আয়াত নাযিল করেন বলেন, 'আল্লাহর রজ্জুকে তোমরা সম্মিলিতভাবে শক্ত করে ধরে থাকো। নানা মত ও পথে তোমরা বিভক্ত হয়ে যেও না।'[১২৯]

মহান রাব্বুল আ'লামিন এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বিশ্বমানবও একজাতি। আর আল্লাহ প্রদত্ত একত্ববাদে বিশ্বাসীদের ধর্ম দ্বীন ইসলামও এক। তাই আল্লাহকে পাবার একমাত্র পথ হলো এই একত্ববাদের রশিকে শক্তভাবে ধরে রাখা এবং কোনভাবেই বিচ্ছন্ন না হওয়া। কেননা রাসুল (সা.)-এর পথ কখনো বিচ্ছিন্নতার পথ নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাঁর দলভূক্ত নয় এবং তিনিও তাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন,

'যারা ধর্মকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে আপনি কখনো তাদের নন।'[১৩০] আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি, সাফল্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একমাত্র তাঁকে (সা.) আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা মু'মিন হিসেবে ফরয। এজন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমাদের জন্য রাসুলের চরিত্রে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[১৩১] আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন অন্যত্র বলেছেন,'আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে হলে একমাত্র রাসুলকেই অনুসরণ করে চলতে

হবে।'[১৩২] ইসলামে ইবাদত-বন্দেগির নববিধান সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ ও রাসুল (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথ ব্যতিরেকে অন্য পথের অনুসরণ সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

এ বিষয়ে রাসুলে আকরাম (সা.)-এর সাবধান বাণী, 'নববিধান মাত্রই পথভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যায়।'[১৩৩] মহানবী (সা.) বলেন, 'আমার যুগের পর দু'টি শতাব্দীই উৎকৃষ্ট, অতঃপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব ঘটবে।' তাই রাসুল (সা.) বলে গিয়েছিলেন, 'কেউ আমাদের শরীআ'তে নেই এমন কিছুর প্রচলন করলে তা প্রত্যাখ্যাত।' [১৩৪] তিনি (সা.) হিদায়াত ও সঠিক পথের দিক নির্দেশনা প্রদানপূর্বক বলেন,'পরবর্তীকালে দ্বীনের মধ্যে যখন মতভেদ দেখা দেবে, তখন একমাত্র আমার সুন্নাত এবং সৎ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে।'[১৩৫]

রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আজকের দিনের মত তথাকথিত পীর প্রথার কোনরূপ প্রচলন ছিল না। রাসুলে পাক (সা.) তাঁর উম্মতের মধ্যকার সঠিক পথ প্রাপ্তদের যে নিশানা বর্ণনা করে গেছেন তা হল, 'একমাত্র আমি ও আমার অনুসারী সাহাবাগণের আদর্শের ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত।'[১৩৬]

'নবী করীম (সা.)-এর হাতে মু'মিন মুসলমানগণ যে বয়েত করতেন যাকে ইসলামে 'আনুগত্যের শপথ' বলা হয়। বয়েত আরবি 'বয়' ধাতু থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ বিক্রয় করা। কুরআন শরীফে বয়েতে রিদওয়ানকে অর্থাৎ মহানবীর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণকে আল্লাহ তা'আলা উৎকৃষ্ট 'ক্রয় বিক্রয়' বলেছেন।'[১৩৭] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা, নবী (সা.)-এর হাতে বয়েত করাকে রূপকভাবে আল্লাহর হাতে বয়েত বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৮]

মহান রাব্বুল আ'লামিন 'অনুগত হও' শব্দটিকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, 'অনুগত হও আল্লাহর এবং রাসুলের।'[১৩৯] আবার বলেছেন, 'আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসুলের অনুগত হও।'[১৪০] 'যে রাসুলের অনুগত হয় সে আল্লাহর অনুগত হয়।'[১৪১] যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে এই বাণীই প্রচার করতে আসতেন। 'তাঁরা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনের জান-মাল ও পার্থিব জীবনকে ক্রয় করতে আসতেন।'[১৪২] আর এটাই 'বয়েত'।

সুতরাং এসব আয়াত ও হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহকে পাবার পথের সন্ধান দানকারী শায়েখ, পীর, সুফি, ইমাম বা শাহ কিংবা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক দীক্ষাগুরু যদি আল্লাহ ও রাসুলের (সা.) পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক শিক্ষাদান করে থাকেন তবে সেই আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু বা শায়েখের আদেশ মান্য করা আল্লাহর

নির্দেশ মান্য করার উদ্দেশ্যেই বলে পরিগণিত হবে। কেননা, প্রকৃত আল্লাহভীরু দীক্ষাগুরু আল্লাহ ও রাসুলের (সা.) পথের ওপরই তাঁর জ্ঞানভান্ডার সৃজিত করে থাকেন।

বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে দীক্ষা দানকারী অগ্রজকে পীর, শায়েখ, ইমাম বা শাহ্, সুফি প্রভৃতি নামে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আরবে সুফি শব্দের চাইতে ইমাম শব্দের প্রচলনই বেশি। আর সুফিগণ তাঁর অনুসারী শিষ্যদের জ্ঞানার্জনের প্রেরণাদানপূর্বক তাঁদের সুপ্ত আত্মার জাগরণ ঘটিয়ে থাকেন এবং স্রষ্টাকে পাবার জ্ঞানপিপাসায় নিবেদিত প্রাণ করে তোলেন।

অনেকে পীর এবং সূফী শব্দ দু'টিকে অর্থের দিক থেকে একই বলার প্রয়াস পেয়েছেন এবং অনেকে পীর' শব্দের আরবি 'সূফি' এটিও বলেছেন।[১৪৩] কিন্তু তা কোনভাবেই সঠিক নয়। কেননা, 'পীর' অর্থ বৃদ্ধ, দুর্বল আর সূফী শব্দের অর্থ পশম।[১৪৪] 'আর তাসাউফ শব্দের অর্থ হল দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, আধিক্য, শক্তিশালী (আক'রাব)। আরবি ভাষায় 'পে' অক্ষরটিই নেই; তাছাড়া 'পীর' এবং 'সূফী'র মধ্যেও আকাশ পাতাল পার্থক্য। পীর শুধু মানুষের জন্যই ব্যবহার করা হয় না, জন্তু-জানোয়ারের বেলায়ও পীর শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন 'ওয়াক্ত পীরি গুর্গে জালিম মিশাওয়াদ পরহেযগার' অর্থাৎ, নেকড়ে বাঘ বৃদ্ধ হলে শিকার ধরা থেকে বিরত থেকে পরহেযগার হয়ে যায়।'[১৪৫]

ইসলামের জন্মস্থান খাস আরবদেশেও এই পীর প্রথার প্রচলন নেই। প্রাচীন আর্যদের আদি নিবাস প্রাচীন পারস্যে আর ভারতীয় উপমহাদেশেই এর ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্যণীয়। 'হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে এবং তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে মুসলমানদের মধ্যে এহেন চিন্তার উন্মেষ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে ওই সময় থেকেই মুসলমানদের অবনতির যুগের শুরু।'[১৪৬]

অনেকে মনে করে থাকেন নবী করীম (সা.)-এর হাতে যেমন মু'মিনরা বয়েত করে থাকেন পীরের হাতে বয়েত করার বিষয়টিও একই মানদন্ডে তুলনীয়।[১৪৭] কিন্তু এ দু'ধরণের বয়েতের মধ্যে তুলনা করার যৌক্তিকতা কুরআন-হাদিসের দলিল দ্বারা সাব্যস্ত নয়। কেননা, নবী-রাসুলগণ নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন কথা বলতেন না। তাঁরা সেটাই বলতেন যা তাঁদের নিকট ওহী দ্বারা প্রত্যাদেশ হত। কালামে মাজীদে এসেছে, 'তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।'[১৪৮] 'নবীর অবর্তমানে তাঁর খলীফাগণ-যাদেরকে তিনি 'রাশেদীন' ও 'মাহদীন' রূপে আখ্যায়িত করেছেন, তারা বয়েত গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হন। খলিফাতুল্লাহ নবী এবং নবীর খলিফাগণ ব্যতিরেকে মু'মিনদের বয়েত

গ্রহণ করার অধিকার কারো নেই। সুতরাং কুরআন-হাদিস দ্বারা যা প্রমাণিত নয় তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং বয়েত দেয়া এবং গ্রহণ করা ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।'[১৪৯]

এ পীর প্রথার বয়েত সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে মৌলানা আকরম খাঁ '*মোস্তফা চরিত*'-এর ৪৭৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'হযরতের ও তাঁহার ছাহাবাগণের বায়য়াতের সহিত আমাদিগের আজকালকার বায়য়াতের তুলনা করিয়া দেখুন। তাহা মোস্তফার মহান আদর্শ হইতে কতদূর নামিয়া পড়িয়াছে। মুছলমান সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত আধুনিক বায়য়াতের ধারা এখন বহুস্থলে সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পথে পরিচালিত হইয়াছে। এখন বায়য়াতের অনেকস্থলে গুরুসাধনা ও পুরোহিত পূজায় পরিণত হইয়াছে। সাধারণ সমাজের বিশ্বাস, একজন পুরোহিত বা পীরের খাতায় নাম না লেখাইলে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু পীরের হাতে হাত কতকগুলি অজ্ঞাত অর্থ শব্দসমষ্টির আবৃত্তি করিলেই "বায়য়াৎ" হইয়া গেল, এবং বায়য়াতকারী নিজের সমস্ত পাপ ও অপকর্ম ধুইয়া পুছিয়া শুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেইজন্যে হিন্দুদিগের শান্তি স্বস্তয়নাদির ন্যায় আজন্ম ধর্ম সংশ্রবহীন ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আমরা অনেক সময় পুরোহিত বংশোদ্ভূত খন্দকার ছাহেব বা মোল্লাজিকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ আবার-অবশ্য বেশী দক্ষিণা পাইলে আসন্ন-মৃত্যু মুরিদকে বেহেস্তের পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন।'

'মওলানা রুমী ও আল্লামা ইকবালের মতে, 'ফানাফিল্লাহ্ প্রেমিকের (মুত্তাকীর) আদর্শ নয়। বাকাবিল্লাহ বা আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা নিজেকে অমর করিবার আদর্শ মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শায়খ বা শিক্ষকের সাহচর্য শিষ্যের মধ্যে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও মানবাত্মার সুপ্ত গুণাবলীকে বিকাশ করিবার মহত্তম প্রেরণার জন্মদান করে থাকে।'[১৫০]

পবিত্র কুরআনের আয়াতের অর্থ অনুযায়ী 'ফানা' শব্দের অর্থ 'বিলুপ্ত হওয়া'। আল্লাহ বলেন: 'কুলুমান 'আলাইহা ফানিঁও ওয়া ইয়াবকা' ওয়াজ্হু রাব্বিকা যুলজালালি ওয়াল ইকরাম' অর্থাৎ, 'ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু একমাত্র তোমার মহিমান্বিত, ও প্রাচুর্য ও সম্মানের অধিকারী প্রভুর সত্তা অবশিষ্ট থাকবে।'[১৫১] রূহ বা মানবাত্মা যেহেতু আল্লাহর হুকুমের মধ্য হতে একটি হুকুম সুতরাং তা বিলীন হতে পারে না। বরং তা কেবল মানবদেহ হতে পুনরায় রূহের জগতে আল্লাহর হুকুমে রূপান্তর ঘটে থাকে।

পীর প্রথা যেহেতু ইসলামে নববিধান বা বিদ'আত বলে বিবেচিত তাই কেউ কেউ পীর প্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে চরম পর্যায়ে পৌঁছে বলেছেন, ইসলামে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে আর কারো অস্তিত্ব নেই, এমনকি 'ফানাফির রাসূল' শব্দটিও ইসলাম-বিরোধী-শিরক।[১৫২] কিন্তু এটি সঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি

আনুগত্যের সাথে সাথে রাসুলের (সা.) আনুগত্যের কথাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে (সা.) চরিত্রের উত্তম আদর্শ হিসেবে আয়াত নাযিল করে তাঁকে অনুসরণ করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ফরয করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট। কিন্তু, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ দুটি আলাদা বিষয়। আমরা আল্লাহর রাসুলকে (সা.) বিশ্বাস করি ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করি। কেননা, আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'-এ দুটি অংশে বিভক্ত। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহর একত্ববাদ তথা তৌহিদের ঘোষণা এবং 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' অংশটি রাসুল (সা.)-এর আল্লাহর পবিত্র বাণীর বার্তাবাহক এবং তাঁর (সা.) রিসালাতকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে সাব্যস্ত করার দলিল। কুরআন, আল্লাহর পবিত্র বাণী এবং রাসুলের (সা.) সুন্নাহ'কে (যা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা উত্তম আদর্শ হিসেবে) গ্রহণ করা ফরয করে দিয়েছে। এ দু'টিই আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা। সুরা নূরের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহর জ্যোতিই আল্লাহর নবীর মাধ্যমে অবলোকন করি। আমরা রাসুল (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করি। কিন্তু আল্লাহর মত আমরা তাঁকে (সা.) সিজদাহ করি না। এখানেই আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য। রাসুলের (সা.) শিক্ষা, আদর্শ ও তাঁর (সা.) সুন্নাহকে আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক অনুসরণ ঈমানের পূর্ণতা প্রাপ্তি ও প্রকৃত মু'মিন হিসেবে আখ্যা পাবার দলিল। আর এটাই প্রকৃত ইসলাম।

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও এ পথের পথপ্রদর্শক হিসেবে আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরুকে নবীর উত্তরসূরি ওলী এবং শিক্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করাই সর্বাধিক সমীচীন। আর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে হলে কুরআনকে অন্তকরণের পবিত্রতম উজ্জ্বল আলো (নূরুম মুবিন) এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল (সা.)-কে উত্তম আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। আর আল্লাহকে পাবার জন্য রাসুল (সা.)-এর পথ-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক যে কামেল পুরুষ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক যতটা পরিমাণ আল্লাহর সীমার মধ্যে কাজ করবেন বা করার নির্দেশ প্রদান করবেন ততটা পরিমাণেই তাঁর প্রতি অনুগত হতে হবে। তার বেশি নয়। আর মধ্য দিয়েই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সাধনায় ব্যাপৃত হওয়াই একজন অধ্যাত্মবাদী সাধকের পরম প্রচেষ্টা।

আর জাগতিক জীবনে,

'মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী তারাই 'সূফী' নামে পরিচিত। মূলত ইসলামে সূফীবাদকে বলা হয় 'আত্তাসাউফ'। তাসাউফ শব্দ-ব্যুৎপত্তি তাফাউলের ওজনে মূল ধাতু 'সূফী' হতে উৎপন্ন। সূফী অর্থ পশম, আর তাসাউফের অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। অতঃপর মরমী তত্ত্বে ও সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার

কাজকে বলা হয় 'তাসাউফ'। যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামি পরিভাষায় তিনি সূফী নামে অভিহিত।'[১৫৩]

সুফি শব্দের উৎপত্তি

'সুফি' ও 'তাসাউফ' শব্দের উৎস বিশ্লেষণপূর্বক তা বিভিন্ন উৎস হতে উৎপন্ন হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন। তবে একথা সত্য যে, কুরআন ও হাদিসের পবিত্র বাণীর অন্তর্নিহিত ও গভীরতর অর্থের ওপর ভিত্তি করে ইসলামে 'সূফীতত্ত্ব বা তাসাউফ' জন্ম লাভ করেছে। সূফী ও তাসাউফ শব্দ 'আহলুস সুফ্ফা' হতে উৎকলিত। 'আহলুস সুফ্ফা' প্রায় ৭০ জন সাহাবী; যাঁরা মসজিদে নববীতে এক ছাদবিহীন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতেন । রাসুলে করীম (সা.) তাঁদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।[১৫৪]

কারো কারো মতে, 'সূফ' (কাতার, পংক্তি, সারি) শব্দ 'তাসাউফে'র উৎস। কেননা, সূফীগণ বিশেষত আমলের দিক দিয়ে প্রথম কাতারের লোক। যাঁরা আল্লাহর প্রেম, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও ধর্মের দিক দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রথম শ্রেণীতে অবস্থান করেন তারাই 'সূফী'।[১৫৫]

'মোল্লা জামী ও তার অনুসারীরা 'সাফা' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি নির্দেশ করেন। তাঁদের মতে, আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের জন্য প্রয়োজন আত্মিক পবিত্রতা।'[১৫৬] 'এ উদ্দেশ্যেই সূফীগণ পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করেন বলে তাদের সূফী বলা হয়। কারণ সূফীগণ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। আর 'সাফা' এর অর্থ পবিত্র।'[১৫৭]

'কোন কোন পণ্ডিতের মতে, আরবি 'সূফ' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ পশম। যিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও ত্যাগের প্রতীক হিসাবে পশমী পোশাক পরেন, তিনিই সূফী। পশমী পোশাক পরিধান করার কারণে তাকে 'সূফী' নামে আখ্যায়িত করা হয়। মহানবী (সা.) মাঝে মাঝে পশমী পোশাক পরিধান করতেন।'[১৫৮]

পাশ্চাত্যের কিছু-সংখ্যক পন্ডিত 'সূফী' শব্দটিকে গ্রীক শব্দ 'সোফিস্ট' (Sophist) 'জ্ঞানী' থেকে উৎপন্ন বলেছেন।[১৫৯] আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানীরা শুধু জ্ঞানীই নয় মহাজ্ঞানীও বটে। পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ বিশেষত ড. আর.এ. নিকলসন দাবী করে থাকেন যে, 'সূফী' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'সোফিস্ট' থেকে আগত যার অর্থ 'জ্ঞান'। তাঁরা বলেন, সূফীরা বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সাগর, সুতরাং 'সোফিস্ট' শব্দ থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি।[১৬০] ড. নিকলসন সূফী শব্দের উৎপত্তি 'সোফিস্ট' সম্পর্কে জোর তাকীদ দিলেও অন্যান্য শব্দ যেমন, সূফিয়া (জ্ঞান), 'সাফা' ও ' সূফ' (পবিত্রতা) ও (পশম) সম্পর্কে ধারণা অগ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে, 'তিনটি শব্দের সমন্বয়ে সূফী শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে।'[১৬১]

মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, আল্লামা মুতফী জুমু'আর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন,

'সূফী' শব্দটি গ্রীক 'সুইউসুফিয়া' শব্দ থেকে এসেছে। গ্রীক ভাষায় এ শব্দটির অর্থ প্রভু-জ্ঞান। কেননা, সূফীও একজন বিজ্ঞানী। তিনি প্রভুর জ্ঞান সাধনায় মশগুল থাকেন। কারণ, যিনি অর্থেই সূফী তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির কৌশলের রহস্যভেদ উদ্‌ঘাটনে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। নিজ ও নিরঞ্জন তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টি কৌশলের রহস্যভেদ উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন।[১৬২]

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে,

'সূফী' শব্দটি 'সূফ' (পশম) শব্দ হতে নিস্পন্ন। পশমী বস্ত্র সরলতা ও আড়ম্বরহীনতার প্রতীক। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ বিলাস বাসনের পরিবর্তে সাদাসিধা পোশাক পরতেন। পরবর্তী সূফীগণ সাদাসিধা জীবন যাপনের জন্য এই পোশাক গ্রহণ করে বলে কম্বল সম্বল করে চলেন বলে তাঁদেরকে সূফী বলা হয়।'[১৬৩]

আবু নসর আস-সর্‌রাজ বলেন: 'বাহ্যিক পোশাকের দিক দিয়ে সূফীগণকে সূফী বলা হয়, কারণ পশমের কম্বল পরা নবীগণ ওলীগণ এবং সূফীগণের প্রতীক।[১৬৪]

সূফী শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতগণ মতানৈক্য করলেও সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, 'ইলমে তাসাউফ' নবী করীম (সা.) থেকেই শুরু। কেননা, সূফী দর্শনের মূল বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসেও রয়েছে, যা মানুষের অন্তরে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে। এ বিশেষ অবস্থাই আত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। পরমাত্মার সাথে পরিপূর্ণ মিলনেই মানবজীবনের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু এ মিলন বা একত্ববোধ জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। এ মিলন কোন জ্ঞান প্রসূত বা কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামূলক নয়, এ মিলন একান্তভাবে হৃদয়াবেগ প্রসূত। এ মিলনে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা রূপান্তরিত প্রভু সত্তার গুণ লাভ করে।[১৬৫] এ জ্ঞানলাভই সূফীদের চরম লক্ষ্য।[১৬৬] নবী করীম (সা.)-এর হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন ইবাদত, ভোগ-বিলাসহীন সহজ-সরল জীবন যাপন, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ও তাঁর নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি সূফী দর্শনের মূলে যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে। মানবাত্মা, বিশ্বজগত ও পরম সত্তার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে নবী করীম (সা.)-এর উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি সূফী দর্শনের মূল ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়।[১৬৭] যেমন, 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একান্তচিত্তে তাতে মগ্ন থাক। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা । তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব তাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে।'[১৬৮] 'বিশ্বাসী তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।'[১৬৯].... এতে যারা তাদের প্রতিপালকের ভয় করে, তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর

তাদের দেহ মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।'[১৭০] বলা হয়ে থাকে, 'আসসালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন' অর্থাৎ সালাত মু'মিনের মিরাজা।[১৭১]

নবী কারীম (সা.) বলেছেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি তুমি তাকে দেখতে নাও পাও, তিনি তোমাকে (সর্বস্থানে ও সর্বাবস্থায়) দেখছেন।'[১৭২] তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! তোমার যিকরের জন্য আমার হৃদয়ের কান খুলে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের এমন অন্তর দান কর যা প্রেম বেদনায় ব্যথিত, তোমার সামনে অবনত এবং তোমার দ্বীনের কাজে চিরাবনত থাকে।'[১৭৩]

'এমনিভাবে দেখা যায় যে, নবী কারীম (সা.)-এর জীবনেই সূফী সুলভ আচরণ পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর (সা.) এ চরিত্র তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। তারা মসজিদুন নববীতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। তাঁদেরকে 'আহলুস সুফ্ফা' (বারান্দার অধিবাসী) বলা হত। এরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় পাঁচ শ', যাদের কোন পার্থিব আকর্ষণ ছিল না। তাঁরা জনগণের কাছে 'কাঠ কাটা লোক' বলে পরিচিত ছিল। তাঁরা কাঠ বিক্রি করে জীবন ধারণ করতেন। ভবিষতের জন্য কোন সঞ্চয় করতেন না।'[১৭৪]

তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সা.) প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁদের অনেকেই বস্ত্রাভাবে পশমী কম্বল পরিধান করতেন।[১৭৫] এজন্য অনেক সময় তাঁদেরকে 'কম্বল পরিধানকারী' বলেও অভিহিত করা হত।[১৭৬] এই আসহাবে সূফফা থেকে সূফী শব্দের উৎপত্তি।[১৭৭]

তাসাউফ বা সূফি শব্দের উৎস

'যারা 'সূফ' (পশমকে) অর্থাৎ নিরাসক্ত জীবনের প্রতীক হিসাবে পশমী পোশাক পরিধানকারীকে 'সূফী' শব্দের উৎস বলে মনে করেন, তাঁদের এ চিন্তাধারা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা সূফীদের পোশাকের প্রতিই বেশি ইঙ্গিত বাহক। তাসাউফ জীবনের বাতিনী দিকের পরিচায়ক। তাই শুধু বাহ্যিক দিকের নির্দেশক 'সূফ' বা পশম থেকে 'সূফী' শব্দের উদ্ভব হয়েছে, এটা যুক্তিযুক্ত নয়। আর সাফা (পবিত্রতা) শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উদ্ভব ঘটে নি। কেননা, এ শব্দটিও শুধু সূফী জীবনের একটি দিকের একটি দিকের নির্দেশক। 'সফ' বা কাতার শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দ এসেছে, এটাও সত্য নয় বরং এটা কাল্পনিক ধারণামাত্র। আর যে সকল পাশ্চাত্য পন্ডিত গ্রীক শব্দ 'সোফিস্ট'কে 'সূফী'র উৎস বলে মনে করেন, তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বিদেশি পরিভাষা শব্দ বা ভাবটি ইসলামী সংস্কৃতি বা তাহযীব তমুদ্দুনে অনুপ্রবেশ করেছে, এ দাবির পক্ষে তাঁরা কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। একমাত্র 'আসহাবে সুফ্ফা' (বারান্দার অধিবাসী) শব্দে সূফীতত্ত্বের ও সূফী জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাঁরাই বস্ত্রাভাবে পশমী পোশাক পরিধান করতেন এবং সবসময় আল্লাহর

স্মরণে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁরা আল্লাহর সম্মানের চাদরাবৃত। তাঁরাই নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য থেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানে জ্ঞানবান হয়েছিলেন। কাজেই 'আসহাবে সূফ্ফা' থেকে সূফী শব্দের উৎপত্তি ও সূফীতত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়,' আসহাবে সূফ্ফা' থেকে 'সূফী' শব্দের উদ্ভব হয়েছে।'[১৭৮] কাজেই সুফি শব্দের উৎপত্তি যে আসহাবে সুফ্ফা থেকে হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।[১৭৯]

সুফি শব্দের প্রথম ব্যবহার

'রাসুলে কারীম (সা.)-এর পরবর্তী যুগে তাঁর সাহচর্য প্রাপ্ত মনোনীত ব্যক্তিগণের ('সাহাবা') চেয়ে বড় কোন পরিচিতি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়নি। কেননা, রাসুলে কারীম (সা.) সংস্পর্শ থেকে অধিকতর কোন মর্যাদা হতেই পারে না। এরপর যারা সাহাবাদের সাহচর্য লাভ করেন তাদেরকে 'তাবি-ই' বলা হয় এবং তাদের পরবর্তীগণকে 'তাবে-তাবি-ই' নামে অভিহিত করা হয়।'[১৮০]

যে সমস্ত ব্যক্তির দৃষ্টি দ্বীনের দিকে অধিক নিবদ্ধ হয়, তাঁদেরকে 'যাহিদ' (দুনিয়ার প্রতি বিরাগ) ও 'আবিদ' নামে ডাকা হতো।[১৮১] 'যখন বিদ'আত প্রকাশ পেয়ে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হল, তখন প্রত্যেক দলই দাবি করতে লাগল যে, তাদের মধ্যে 'যাহিদ' অধিক পাওয়া যায়। এজন্য আহ্লে সুন্নাত তাসাউফের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিমান হলো এবং দ্বিতীয় হিজরীর পূর্বেই এসব মহান ব্যক্তি এ নামে খ্যাত হলেন।'[১৮২] আল্লামা জামীর অভিমত হচ্ছে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিত্ব সূফি পরিচয়ে ভূষিত হন, তিনি শেখ আবু হাশিম কূফী (মৃ. ১৫০ হি.) তিনি নাফাহাতুল উন্স-এ তা উল্লেখ করেন।[১৮৩]

'আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হুসাইন আস্ সর্রাজ আল-কারী, আমীর মু'আবিয়ার এক পত্র নকল করেন। তিনি মদীনা শরীফের গভর্ণরের নামে লিখেন:

'তুমি এমন সূফীর সদৃশ ছিলে যাঁর নিকট গ্রন্থরাজি ছিল। যার মধ্যে ফারাইয ও কুরআনের আয়াতমালা বর্ণিত। এই রিওয়াআতকে যদি সঠিক হিসেবে ধরা যায়, তবে বলা যায়, 'সূফী' শব্দ প্রথম হিজরি শতকে ব্যবহৃত হতো।'[১৮৪] আমির মুয়াবিয়া এক সরকারী পত্রে জনৈক রাজকর্মচারিকে বলেছেন, 'তুমিতো এমন সুফিলোকের সক্ষমতা লাভ করেছিলে যে ফারায়েজ ও ধর্মের নির্দেশ সম্বলিত গ্রন্থগুলোর উত্তরাধিকারী ছিল।'[১৮৫]

তাসাউফের তাত্ত্বিক জ্ঞান

তাসাউফতত্ত্ব ইসলামের একটি রহস্যমন্ডিত আধ্যাত্মিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য গূঢ় অনুভূতির অন্বেষণ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান। ষড় রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে স্রষ্টার পরম সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থানের

মাধ্যমে প্রেম ও নৈকট্য লাভের ইলম ও পথ-পদ্ধতি অবলম্বনকে তাসাউফ বলে। প্রকৃত অর্থে বান্দা যখন স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের আশায় আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে স্রষ্টার গুণ ও চরিত্রের অলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করে সেই অবস্থা তাসাউফ হিসেবে পরিগণিত। কেননা, আল্লাহর গুণ ব্যতীত বান্দা পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম হয়না। মুমিন বান্দা যখন আল্লাহর সীমা ও হুকুমের বাইরে এসে নফসের প্ররোচণায় তাড়িত হয়ে মন্দ ও পাপ কর্ম করে ফেলে তখন তার অন্তরে কৃত পাপের কালিমা দ্বারা একটি চিহ্ন অঙ্কিত হয় পাপের নিদর্শনস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কখনওনা, বরং তাদের অন্তরসমূহে তাদের কৃত পাপের কালিমা ও মরিচা ধরেছে।'[১৮৬] আয়াতের ব্যাখায় রাসুলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: 'মুমিন বান্দা যখন পাপ করে ফেলে, তখন একটি কালো দাগ তার অন্তরে পড়ে যায়, অতঃপর যখন সে তওবা করে ও ক্ষমা চায়, তখন সে ময়লা দূরীভূত হয়ে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়।'[১৮৭]

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

'আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রঙ। রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি।'[১৮৮] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন: 'তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও। আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।'[১৮৯]

'সূফীতত্ত্বের অপর নাম 'ইলমে-তাসাউফ'। ইলমে তাসাউফ এমন একটি নাম যার মধ্যে বহু-বিচিত্র অর্থের সমাবেশ ঘটেছে। এটা ইসলামের একটা গবেষণামূলক বিদ্যা। এর ধরা বাঁধা কোন সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবু বিভিন্ন লেখক ও সূফীসাধকগণ সূফীতত্ত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপনের প্রয়াস চালিয়েছেন।'[১৯০]

সাইয়েদ আমীর আলী বলেছেন,

'ইসলামী জগতে উচ্চতর মনের মধ্যে এই বলে ধারণা রয়েছে যে, কুরআন মজীদের বাণীতে গভীরতর ও অন্তরতর অর্থ নিহিত আছে, তা ভাষা ও বিশ্বাসের বাহ্য কঠোরতা থেকে বাঁচবার প্রয়াস থেকে উৎপন্ন নয়..... কুরআন মজীদের ভাষা তার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যমন্ডিত। এ বিশ্বাস মিলিত হয়েছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুভূতির সঙ্গে। সে এমন এক অনুভূতি যার সঙ্গে কুরআন মজীদের শিক্ষার আর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপদেশমালার সঙ্গতি রয়েছে আর এ মিলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে সেই ধ্যানমূলক বা আদর্শবাদী দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা সূফীবাদ (ইলমে-ই-তাসাউফ)'।[১৯১]

আবুল হুসাইন আন-নূরী বলেন: 'ইন্দ্রিয়জ আত্মার সব প্রবৃত্তির বিসর্জন দেয়াই সূফী দর্শন।'[১৯২] ইমাম গাযালীর (র.) (মৃ. ১১১১খ্রি.) ভাষায়,'আল্লাহ ব্যতীত অপর সবকিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত

রাখা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার অপর নামই সূফী দর্শন।'[১৯৩] হযরত মারূফ কারখী (র.) (ওফাত ২০০হি./৮১২খ্রি.) বলেন, তাসাউফ হচ্ছে আল্লাহর সত্তার উপলব্ধি।[১৯৪] বিশ্‌রে হাফী (র.) (ওফাত ২২৭ হি.) বলেন, 'আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাকে তাসাউফ বলে।'[১৯৫] হযরত যুননূন মিশরী (র.) (ওফাত ৪০হি./৮১৫ খ্রি.) বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছু বর্জন করাই তাসাউফ।'[১৯৬] তাঁকে 'সূফীবাদের পিতা' বলা হয়।[১৯৭]

আল্লামা কুশাইরীর (র.) (মৃ.৯৪৪ খ্রি.) মতে, 'বাহ্য ও অন্তর জীবনের বিশুদ্ধিই তাসাউফ।[১৯৮] হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) (ওফাত ২৯৭ হি.) বলেন, 'তাসাউফ হচ্ছে পবিত্রতার জন্য মনোনীত হওয়া এবং মনোনীত হওয়ার পর গায়রুল্লার প্রভাব মুক্ত করা।'[১৯৯] আবু মুহাম্মদ আজ-জুরাহরী (ওফাত ৩১১হি.) বলেন,'বদ অভ্যাস গঠন এবং সমস্ত অনিষ্টকর কামনা হতে হৃদয়কে মুক্ত করাই তাসাউফ।'[২০০]

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (র.) বলেন, 'তাসাউফ মানুষের আত্মার বিশোধনের শিক্ষা দান করে। তার নৈতিক জীবনকে উন্নীত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী করার উদ্দেশ্যে মানুষের ভিতর ও বাইরের জীবনকে গড়িয়া তোলে। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং লক্ষ্য হচ্ছে চিরন্তন সুখ শান্তি অর্জন।'[২০১]

এজাতীয় বক্তব্যের সমর্থনে হযরত মুরতাইশ (র.) ঘোষণা করেন: 'তাসাউফ উৎকৃষ্ট চরিত্রের নাম।'[২০২] শাইখ আবুল হাসান (র.) বলেন: 'তাসাউফ প্রথা এবং বিদ্যার আতিশয্যের নাম নয়; বরং চরিত্রের নাম।'[২০৩] এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেন: 'এবং আপনার জন্য নিরবিছিন্ন প্রতিদান বিদ্যমান রয়েছে আর আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'[২০৪] রাসুলে কারীম (সা.) বলেন: 'আমি চরিত্রের পূর্ণতার জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[২০৫] তিনি আরো বলেন: 'মুসলিমগণের মধ্যে কামিল ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী।'[২০৬]

আবার, তিনি (সা.) বলেন: 'মানুষ তার সচ্চরিত্রের বিনিময়ে রাত্রি জাগরণকারী এবং দিবসে রোযাদারের ন্যায় মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়।'[২০৭] 'নৈতিক শৃংখলা, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য কামনার্থে ইসলামে যে মরমী ভাবধারার উৎপত্তি হয় উহাকে সূফী দর্শন বলা হয়।'[২০৮] সুতরাং যিনি আল্লাহর স্বভাবে গুণান্বিত হতে পেরেছেন, তিনি আল্লাহর বেলায়াত প্রাপ্ত সূফী বা 'ইনসান-ই-কামিল ' বা পরিপূর্ণ মানব।[২০৯] এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তাদের জন্যই রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুসংবাদ।'[২১০] 'এমন আল্লাহ প্রেমিক, আল্লাহভীরু, আল্লাহভক্ত গুণীদের অনুসৃত পথকেই বলা হয় ইলমে-ই-তাসাউফ বা সূফীশাস্ত্র।'[২১১]

তাসাউফের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের স্তর

সুফি শব্দের উৎপত্তি ও তার প্রয়োগ নিয়ে যেমন মতভেদ দেখা যায়, এই মতবাদের উদ্ভব সম্বন্ধেও তদ্রুপ নানা মুনির নানা মত পরিলক্ষিত হয়। 'তাসাউফ ইসলামের অন্তরীণ আত্মিক অনুভূতির স্বাভাবিক প্রবণতা। পরম সত্তাকে জানার অদম্য জ্ঞান স্পৃহাই হল তাসাউফ বা সূফিতত্ত্বের সাধনা। অন্তরের ধ্যানের অনুভূতির মাধ্যমে বিশেষ কোন মুহূর্তে পরম সত্তায় আত্ম'কে লীন করার সাধনাই যার মূল লক্ষ্য। কোরআন-হাদিসের শিক্ষাই এর মূল ভিত্তি এবং এর আবির্ভাবও ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে।'[২১২]

প্রতীচ্য পন্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে সুফিদের সম্মুখীন হওয়ায় তাঁরা সুফিদেরকে সকল বিষয়ে স্বীকার করতে পারেননি বলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মত ভীষণ ও দূরকল্পিত হয়ে পড়েছে।[২১৩] 'এই মতানৈক্য আবার পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মধ্যে যেমন তীব্র ও সামঞ্জস্য বিবর্জিত, মুসলিম উলামাদের মধ্যে তেমন নয়। সুফিবাদের উদ্ভবের মূলে কারণ স্বরূপ ভারতীয় বেদান্ত দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবের উল্লেখিত হয়ে থাকে।'[২১৪] আর.এ. নিকলসনের মতে সুফি দর্শনের 'ফানা'র ধারণা বৌদ্ধ 'নির্বাণের' ধারণা হতে গ্রহণ করা হয়েছে।[২১৫] ডক্টর দাসগুপ্ত সুফীবাদের 'রুহ' এবং উপনিষদীয় 'আত্মা' সম্পর্কীয় ধারণার আপাত মিল দেখে সুফীবাদের ওপর উপনিষদের প্রভাবের কথা বলেন।[২১৬] 'তাঁরা ভারতীয় দর্শন তথা বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের নৈরাশ্যবাদী মনোভাব এবং বৈরাগ্যবাদী জীবনাচরণের

প্রভাব সুফীদের মধ্যে লক্ষ্য করেন। হার্টম্যানের মতে খ্রিস্টীয় নয় শতকের মাঝামাঝি খোরাসানে ভারতীয় সন্ন্যাসীদের প্রভাব অনুভূত হয়। সেই সূত্রেই ভারতীয় সন্ন্যাসীদের প্রভাব পড়ে সুফীদের ওপর।'[২১৭] পাশ্চাত্যের কোন কোন পন্ডিতের [Golodziher, `*Mohammad and Islam*, New heaven, 1977 গ্রন্থে এ মতবাদ ব্যক্ত করেন] ধারণা মুসলিম চিন্তাধারায় সূফীতত্ত্বের উৎপত্তি ঘটে বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে এসে।[২১৮]

'হার্টম্যান ভারতীয় সন্ন্যাসীদের পোশাক পরিচ্ছদের সাথে সুফীদের পোশাক পরিচ্ছদের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করেন। আসলে বেদান্ত ও সুফী দর্শনের জগত সম্পর্কে যে ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা এক নয়। বৈদান্তিক দার্শনিকরা জগতকে 'মায়া' বলে মনে করেন।'[২১৯]

অন্যদিকে সূফীরা সংসার জীবন পালনের মাধ্যমে স্বাভাবিক সাধনা ও কৃচ্ছ্রতা পালনের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের উর্ধ্বস্তরে উপনীত হন।[২২০] 'তাই সংযম ও কৃচ্ছ্রতা শুধু আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, এমনকি দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কের মধ্যেও দেখা যায়।'[২২১]

আবার বৌদ্ধ ধর্মের 'নির্বাণ' নঞর্থক, কিন্তু সুফীদের 'ফানা' সদর্থক।[২২২] 'বৌদ্ধ দর্শনে পরম তত্ত্ব বলতে শূন্যবাদ বোঝানো হয়েছে। শূন্য একটা অনির্বচনীয় অবস্থা। অস্তি নাস্তি তনু ভয়ানু ভয়ে চতুষ্কোটি বিনি মুক্তির শূন্য রূপম' অর্থাৎ যা অস্তিত্ব নয় আস্তি নাস্তি নয় এমনও নয়। অর্থাৎ এসব অবস্থার অতীতে যে অবস্থা তাকেই শূন্য রূপম নাম দেয়া হয়েছে।'[২২৩] 'বৌদ্ধদের শূন্যবান দার্শনিক চিন্তার শেষ অবস্থা । বৌদ্ধরাও এর সঠিক মূল্যায়ণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সূফীর মাশুক পরম যাত পাক আল্লাহ চিরজীবি এবং দৃশ্য অদৃশ্য সবই তার ব্যক্ত রূপ। সূফীর এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং তার আল্লাহ তাই প্রকাশ (যাহির), অপ্রকাশ (বাতিন) সবই।'[২২৪]

সূফীরা তাওহীদবাদী বিধায় এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন না।[২২৫] 'সুফীদের ফানা আধ্যাত্মিকতার শেষ স্তর নয় এরপরে রয়েছে ইতিবাচক অবস্থা 'বাকা'। বৌদ্ধদের নির্বাণ অবস্থায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্রবোধ লোপ পায়।'[২২৬] পক্ষান্তরে 'ফানা'র স্তরের পর 'বাকা'তে সূফীগণ খুঁজে পান নিজেকে এবং এক গভীর অনুভূতিময় চৈতন্যে নিজের ব্যক্তিত্বের অসীমতাকে লাভ করে।[২২৭]

অধ্যাপক নিকলসন বলেছেন,

`we can not identify Fana with Nirvana unconditionally…… while Nirvana is purly negative Fana accompanied Baqaever, lasting life in God, অর্থাৎ, আমরা বিনা শর্তে 'ফানা' ও 'নির্বাণ'কে অভেদাত্মক বলে মেনে নিতে পারি না। নির্বাণ নিছক নেতিবাচক, কিন্তু 'ফানা' পরবর্তী স্তর 'বাকা'র (আল্লাহর চিরন্তন সত্তায় অবস্থান) সাথে সম্পৃক্ত।[২২৮]

তিনি আরো বলেছেন,

'একথা বলা যায় যে, সূফীতত্ত্বের নৈতিক আত্ম অনুশীলন, বৈরাগ্যবাদী উপাসনা প্রভৃতিতে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভূত প্রভাব রয়েছে। তবে এ দু'টির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। মর্মের দিক থেকে এর মধ্যে দুস্তর প্রভেদ বিদ্যমান। বৌদ্ধগণ নিজেদের নীতিসম্পন্ন করে তোলেন, সেখানে একজন সূফী নীতি সম্পন্ন হয় কেবল আল্লাহকে জানা এবং তার মধ্যে বসবাস করার প্রয়াসে..... ভারতীয় ধারণাবলীর মূল স্রোতসমূহ ইসলামে প্রবেশ করে সূফীদর্শনের উদ্ভবের বহু পরে।'[২২৯]

'ভারতীয় অনুশাসন ও আচরণের সাথে মুসলমান সূফীদের জীবন পদ্ধতির কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে, এটা অনস্বীকার্য। এ সাদৃশ্য এটা প্রমাণ করে না যে, ভারতীয় চিন্তাধারা থেকে ইসলামে সূফী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। মুসলমানদের ভারতীয় ভাবধারার সাথে যোগাযোগের বহু পূর্বে সূফী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। সূফী দর্শন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় ইসলাম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সূফী দর্শনের প্রকাশ ঘটে। এটা ইসলামের মতই পুরাতন।'[২৩০]

'সর্বোপরি, ভারতীয় ধ্যান-ধারণা ইসলামের সংস্পর্শে আসার অনেক আগেই সুফীবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধন ঘটে। সুতরাং সুফীবাদের ওপর বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ প্রভাব মতবাদ সঠিক নয়।'[২৩১]

কারো কারো মতে,

নব্য প্লেটোবাদী খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা সুফিবাদের উদ্ভবের মূল কারণ।[২৩২] 'নব্য প্লেটোবাদী দার্শনিকগণ যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতেন, তা ছিল গ্রীক দর্শনের আলোকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত। এ মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন প্লাটিনাস। তিনি ২৪৪ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নিরস দার্শনিক প্লেটোর (খ্রি. ৪২৭) ভক্ত। প্লেটো ভক্ত দার্শনিক প্লাটিনাস অনেক বিষয়ে প্লেটোকে অতিক্রম করেছিলেন। এজন্য প্লাটিনাসের দর্শনকে Neo Platonism নামে অভিহিত করা হয়।'[২৩৩]

পবিত্র তৌরাত, যবূর, বাইবেল, ইঞ্জিল ও আল-কুরআন একই সাথে ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্র। কিন্তু প্লেটোর চিন্তাধারা নিছক দর্শনশাস্ত্র। ধর্মগ্রন্থসমূহে আল্লাহ্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গুণসম্পন্ন; কিন্তু দর্শনে আল্লাহ্ এক নির্গুণ মহাচেতনা। প্লেটোর এ নির্গুণ চেতনাকে প্লাটিনাস সত্তা থেকে অভিন্নরূপী গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে মানুষের আবহকালের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করেন।[২৩৪] তিনি দর্শনের মূল ভিত্তিকে অক্ষুন্ন রেখে ভক্তি ও প্রেমমার্গে অগ্রসর হন; আর সূফী দর্শনের সাথে নব্য প্লেটোবাদের সাদৃশ্য এখানেই।

প্লেটোর মতে,

"দৃশ্যমান জগতের সব কিছুই এক একটা সুক্ষ্ম টাইপ বা আদর্শ। আধ্যাত্মিক জগতে বিদ্যমান আজ যে বস্তু জন্ম বা প্রকাশ পাচ্ছে, তা সেই আধ্যাত্মিক টাইপগুলোর প্রকাশমাত্র, যা জড় দেহের (জল, বায়ু, অগ্নি ও মাটি) দেহের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিচ্ছবিই এ দৃশ্যমান জগত। কাজেই এ জগতের নিজস্ব কোন স্থায়িত্ব নেই। একমাত্র আধ্যাত্মিক জগতই চিরসত্য, শাশ্বত। প্লেটো এ শাশ্বত টাইপ বা মডেলের নামকরণ করেন আইডিয়া।"[২৩৫]

কিন্তু, 'প্লেটোর নিরস ও প্রাণহীন নিছক দর্শনে প্লাটিনাস 'ভক্তি'-কে যোগ করে আধ্যাত্মিক সাধনার সুষ্ঠু ও সুন্দর নিয়মাবলীর নির্দেশ করে যান। তিনি প্লেটোর মতাবলম্বন করেই নির্দেশ করেন যে,'দৃশ্যমান বিশ্বজগত এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক জগতেরই প্রকাশ এবং এ জগত পুনরায় নিঃশেষিত হয়ে সেই মূল আধ্যাত্মিক ধারার সাথেই মিশে যাবে। জগত ও জাগতিক সকল বস্তুর এই-ই হল শেষ পরিণতি ও চরম লক্ষ্য।'[২৩৬]

প্লাটিনাস আরো বলেন,

বহিঃপ্রকাশের স্তর তিনটি, যথা: আত্মময় জগত, প্রাণীজগত ও বস্তুজগত এবং পরমাত্মার দিক দিয়ে প্রত্যাবর্তনেরও তিনটি স্তর যেমন, ইন্দ্রিয় অনুভূতি, মার্জিত জ্ঞান ও পরমাত্মায় সমাধি।[২৩৭]

খ্রিস্টীয় ও নব্য প্লেটনিক প্রভাব মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের মতে মুসলমানগণ যখন নব্য-প্লেটবাদী খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের সংস্পর্শে আসেন, তখনই তাদের মধ্যে সূফী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়।[২৩৮]

অধ্যাপক নিকলসন জোর দিয়ে বলেছেন,

'ইসলামে সূফী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে খ্রিস্টান ও নিও প্লেটনিক চিন্তাধারা থেকে কারণ মুসলমাগণ নিও প্লেটনিক চিন্তাবিদ খ্রিস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসার ফলেই ইসলামে সূফী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। এসব ভাববাদী চিন্তাশীল খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা হিজরি সালের কয়েক শতকের মধ্যেই খ্রিস্টীয় মতবাদ প্রচারকল্পে নবোদ্যোগে সিরিয়া বা আরবের মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্রই ঘুরে বেড়ান।'[২৩৯] 'অধ্যাপক আর. এ নিকলসনের সাথে ভন ক্রেমারও এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন। ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে এই মতবাদ মূল্যায়ণ করলে এর দুর্বলতা আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।'[২৪০]

কেননা, 'সূফী চিন্তাধারার প্রকাশ মূলত নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবা বিশেষ করে আহলে সূফ্ফা ও তাবিইদের মাধ্যমে ঘটেছিল। তাঁরা জাগতিক কর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন থাকতেন। তা ছাড়া প্রথম পর্যায়ে সূফীগণ বাইরের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি । সুযোগ পেয়ে থাকলেও কুরআনের বাহ্যিক দিকের ওপরই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বেশি। একারণে নির্দ্বিধায় বলা যায় ইসলামের সূফী চিন্তাধারায় নব্য প্লেটবাদ প্রবেশ লাভের সুযোগ পায়নি।'[২৪১]

নবম শতকের পূর্বেই সূফী দর্শন জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে।[২৪২] মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বাধীন জীবন ও জগতকে দেখে থাকে। তার পরেও তাদের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি (হোক না তা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয়) অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সদৃশ থাকতেই পারে। মিল থাকলেই একথা বলা যায় না যে, একজন অপরজনের চিন্তাধারা নকল করেছে। স্বতন্ত্র সত্তার অজেয় মনোভাবের আত্মপ্রকাশ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রত্যেকেই তাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান হতে চায়; অন্য জাতির অধীনতা স্বীকার করতে চায় না। স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী মুসলিম জাতিও একটা বিজাতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেই তাদের চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে, এ দাবী যুক্তিযুক্ত নয়। তা ছাড়া জীবনের স্বতন্ত্র প্রবণতার কারণে এক জাতির ভাব অন্য জাতিকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে না।[২৪৩] নিজের ধর্মীয়

ও আর্থ-সামাজিক ধ্যান-ধারণায় সুগঠিত না হলে কোন বিদেশী প্রভাব জনগণের মন-মানসিকতা স্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে পারে না।[২৪৪]

আর, এজন্যই মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, No idea can seize people's soul unless in some sense it is the peoples own' অর্থাৎ কোন ধারণাই কোন জাতির মনকে অনেকদিন ধরে রাখতে পারে না, যদি সে ধারণা তাদের নিজস্ব না হয়।[২৪৫]

'তদানিন্তন মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ জীবনধারা তথা ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থান যতক্ষণ পর্যন্ত প্রভাবিত হয়ে না উঠেছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিজাতীয় প্রভাবই মুসলমানদের মন প্রাণ অনুরঞ্জিত করে তুলতে পারে নি। সুতরাং দেখা যায়, সূফী চিন্তাধারা ইসলামের শিক্ষা থেকেই উদ্ভূত এবং মুসলিম জাতির চিন্তাধারাই ফল।'[২৪৬]

কেউ কেউ বলেন, পারসিকদের ভাববাদী চিন্তাধারা থেকেই সুফিবাদের জন্ম।[২৪৭] এদের মতে মুসলমানদের পারস্য বিজয় ছিল একটি উৎকৃষ্ট জাতির ওপর একটি নিকৃষ্ট জাতির আধিপত্য স্থাপন। পারসিকরা নিজেদের আরবদের চেয়ে একটি উন্নত জাতি বলে মনে করতো। ফলে পারসিকরা প্রাধান্যবোধ এষণা'য় (Supiriority Complex) ভুগছিল। কাজেই বলা হয়ে থাকে, পারসিকদের এ 'মরমীবাদ' ইসলামে সুফীবাদের বিকাশে বিরাট অবদান রাখে।[২৪৮] 'পারস্যবাসীদের মনের উপর রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও সহজাত মানসিক পবিত্রতার মরমী চিন্তাধারার বিকাশের সহায়ক হয়। সূফী দর্শনের বিস্তার ও উন্নতিতে পারস্যবাসীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তবে তারা ইসলামের সূফী চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে, এ কথা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।'[২৪৯]

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নিকলসন প্রশ্ন তুলেছেন,

'If Sufism is nothing but a revolt of the Ariyan sprit, how are we to explain the undoubted fact that some of the leading pioneers of Mohummadan mysticism were native of Syria and Egypt and Arabs by race.'[২৫০]

'পারসিকদের চিন্তা চেতনার বিশ্লেষনাত্মক ফলস্বরূপ লক্ষ্য করা যায় যে, পারসিকগণ আর্যজাতি হওয়ায় তাদের প্রবণতা ছিল অন্তর্মুখীন এবং তাদের ধর্মমত, চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জাতি হিসেবে তারা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তা অনস্বীকার্য। আরবরা স্রষ্টা সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে পৃথক এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রভূ-ভৃতের সম্পর্কের ন্যায়। পারস্যবাসীগণ এদিক দিয়ে একত্ববাদী। তাদের মতে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান। আরবদের মতে, আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আসমানের ওপর আরশে বসে এ জগত শাসন করছেন কিন্তু পারস্যবাসীদের ধারণা বিশ্বের সব কিছুর মাঝেই আল্লাহর অস্তিত্ব

অনুভূত হয়।'[২৫১] 'আরবগণ প্রত্যক্ষবাদী, পারসিকগণ ভাববাদী। আরবগণ বেশির ভাগই নৈতিকগুণে উদ্বুদ্ধ আর পারসিকরা সাধারণভাবেই দার্শনিক ভাবধারায় বিভূষিত।'[২৫২]

'পারসিক প্রভাব মতবাদ অনৈতিহাসিক ও একপেশে। মুসলমানগণ পারস্যবাসীর সংস্পর্শে আসার পর ইসলামে সুফীবাদের যে সূত্রপাত ঘটেনি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পারস্য বিজয়ের অনেক আগেই ইসলামে সুফীবাদের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। আর পারসিকরা প্রধানত ছিল অগ্নি উপাসক। এদের ভাবধারা ইসলামে অনুপ্রবেশের প্রশ্নই উঠে না। অগ্নি উপাসকদের নৈরাশ্যবাদ বা বৈরাগ্যবাদের প্রভাব সুফীবাদের উপর পড়েছে, একথাও অযৌক্তিক। হতে পারে পারস্য দেশে বহু প্রখ্যাত সুফী সাধক জন্মগ্রহন করেছেন। কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান এবং তাঁদের ধমনীতে পারসিক রক্ত প্রবাহিত ছিল না।'[২৫৩]

'পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিক মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী ও ইবনুল ফরীদ পারসিক ছিলেন না, আরবী ভাষাভাষী ছিলেন, অথচ সূফী দর্শনে তারা শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে অবস্থান করছেন। ইবনুল অরাবী সূফী দর্শনকে সুসংগত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে এটাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। কাজেই এ মতবাদের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। নবী কারীম (সা.)-কে সূফী দর্শন বা ইলমে-ই-মা'রিফাতের উৎস বলে ধরা হয়। তাঁর চার খলিফা (হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) নিঃসন্দেহে বাইরের প্রভাব মুক্ত ছিলেন। আর বাইরের প্রভাব মুক্ত ছিলেন নবী কারীম (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী (আসহাবে সূফ্ফা) ও তাবিয়ীগণ।'[২৫৪]

সুতরাং সুফিবাদ ইসলামের নিজস্ব চিন্তাধারায় ভাস্বর ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল একটি তত্ত্ব যার আদি মূল হল কুরআন-হাদিস ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। অন্যদিকে, আল কোরআন প্রকৃতপক্ষে সুফিবাদের মূল উৎস-এধরনের যুক্তিও উত্থাপিত হতে দেখি।[২৫৫] 'প্রথম তিনটি কারণ বাহ্যিক এবং চতুর্থ কারণটি অভ্যন্তরীণ। আর এটাই সুফিবাদ উদ্ভবের যথার্থ ও আসল হেতু। পাশ্চাত্যের গবেষকদের মতেও সুফিবাদের শ্রেষ্ঠতম উৎস ঐ মহা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন।'[২৫৬]

মানবসত্তার পূর্ণ বিকোশিত রূপ লাভের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো ইসলামি জীবনব্যবস্থা। কেননা, ইলামের সুষম জীবনব্যবস্থা স্রষ্টা ও মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ও অন্যান্য প্রাণী-প্রজাতির সম্পর্কসহ ধর্মীয়, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এ দু'ভাগে ভাগ করেছে। বাহ্যিক ভাগটি বস্তুগত বা নিম্নমুখী এবং অভ্যন্তরীণ ভাগটি আধ্যাত্মিক বা উর্ধ্বমুখী জীবনী শক্তির দিকে প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়।

আরবী ভাষাভাষী পন্ডিতগণের একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পবিত্র কুরআন রহস্যের স্পর্শে প্রায়শই রূপক।[২৫৭] 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) মরমি ছিলেন। পবিত্র কোরআনের বাণীতেও মরমি সুর ধ্বনিত হয়। প্রধানত মক্কি সুরায় এবং অংশত মাদানি সুরায়ও বহুস্থানে প্রগাঢ় ভক্তি ও তাপস্বিকতা প্রকাশ পেয়েছে।'[২৫৮] আল্লাহ বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য একটি বিধি বা জীবনব্যবস্থা এবং একটি বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।'[২৫৯] এখানে বিধি-বিধান বলতে যাহিরী দিক বা শরীয়তের কথা এবং বিশেষ পথ বলতে ইসলামের বাতিনী দিক বা সূফীতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।[২৬০]

হাদিসের বাণীতেও অনুরূপ বক্তব্যের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে দু'প্রকার জ্ঞান লাভ করেছি। এক প্রকার সাধারণ জ্ঞান, যা আমি সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেছি। আর এক প্রকার বিশেষ জ্ঞান যা সবার কাছে প্রকাশ করি নি।'[২৬১] 'অপরটি (বাতিনী) আমি যদি বলি তবে আমার কণ্ঠনালী কেটে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।'[২৬২] হাদিসে কুদসিতে এসেছে- 'আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম এবং আমি জ্ঞান হতে চাইলাম, তাই সৃষ্ট করলাম সৃষ্টি যাতে করে আমি পরিচিত হতে পারি।'[২৬৩] অতএব, স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরিআ'তের অভ্যন্তর ভাগ জুড়েই ইলমে তাসাউফের শিক্ষা বিদ্যমান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে: 'এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর যাহিরী ও বাতিনী উভয়বিধ নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছেন।'[২৬৪] হযরত রাসুলে কারীম (সা.) ঘোষণা করেন: 'কুরআন সাত লোগাতে অবতীর্ণ এবং প্রতিটি আয়াতের যাহিরী ও বাতিনী অর্থ আছে।'[২৬৫]

মুরাকাবা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দূলোক-ভূলোকব্যাপী তাঁর পবিত্রাসন বিরাজমান।'[২৬৬] 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই, সুতরাং যেদিকেই তোমার মুখ ফিরাবে, সে দিকই আল্লাহর সম্মুখ; আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।'[২৬৭] 'অচিরেই আমি তাদেরকে আকাশমন্ডলে আমার যে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং যা রয়েছে তাদের সত্তার মধ্যে, পরিলক্ষিত করাব।'[২৬৮] 'এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব।'[২৬৯] '(আমি আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের সত্তার মধ্যেও। তোমরা কি তা দেখছো না?'[২৭০] 'এবং আমি (আল্লাহ) মানুষের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটবর্তী।'[২৭১] 'যখন আমার বান্দারা (হে নবী) আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে . . .বস্তুত আমি সন্নিকটে।'[২৭২] 'বস্তুত তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।'[২৭৩]

'তিনি (আল্লাহ) হলেন আদি ও অন্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাতা।'[২৭৪] 'আমি নিকটেই থাকি, আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেই।'[২৭৫] 'আমাকে স্মরণ করো, আমিও স্মরণ করবো, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও,

অকৃতজ্ঞ হইও না।'[২৭৬] 'আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব, তাকেই গ্রহণ করুন কর্ম বিধায়করূপে।'[২৭৭] 'হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।'[২৭৮]

'কুরআন-হাদিসে বিশ্বাসী মুসলিম চিন্তাবিদ ও উলামাগণ মনে করেন কুরআন-হাদিসের শিক্ষাই মূলত তাসাউফের ভিত্তি এবং তার আবির্ভাবও ইসলামের উষালগ্ন থেকেই। সূফীবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সমর্থন লক্ষ্যণীয়। সূফীরা তাঁদের ইবাদত-বন্দেগীতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে অনপ্রেরণা লাভ করেছেন।'[২৭৯]

সৈয়দ আমীর আলী বলেন: 'রাসূলুল্লাহ (সা.) ওহীর প্রেরণায় সম্প্রসারিত উচ্চ অনুভূতির দ্বারা প্রায়শ: কথা বলতেন আর তার মুরাকাবার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও ভাববিহব্বলতার যে গভীরতা দেখা যেত প্রধানত: তাঁরই ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদ বা ইলমে তাসাউফ।'[২৮০]

'কোরআনের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আয়াতসমূহ হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর কাছে নাজেল হওয়ার সাথে সাথেই সুফীবাদের সূত্রপাত হয়। নবী (সা.) নিজেই সুফীসুলভ ভাব ব্যক্ত করেছেন এবং প্রায়ই হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। হযরতের সাহাবাগণও তাঁকে অনুসরণ করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর হতেই তাঁরা প্রায় মসজিদে আল্লাহর উপাসনা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁরা খোদার ধ্যানে এত তন্ময় থাকতেন যে, পার্থিব বা বাহ্যিক আরাম-আয়েশের প্রতি তাঁদের কোন মোহ ছিল না।'[২৮১]

তবে তাদেরকে সুফী না বলে সাহাবা (বা সাথী) বলা হত; সাহাবা আখ্যাকে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করা হত।[২৮২] প্রথম দিকে সূফীরা পরিচিত ছিলেন উব্বাদ (আল্লাহর ভক্ত মানুষ), যুহ্হাদ (ধর্মপ্রাণ মানুষ), মুকাররাবীন (নৈকট্য লাভকারী), সাবিরীন (ধৈর্য্যশীল) এবং আবরার (পূণ্যবান মানুষ) বলে।[২৮৩] তাঁরা সর্বপ্রকার জাগতিক প্রলোভনের উর্দ্ধে উঠে জাগতিক সুখ-শান্তি ও বিলাস-ব্যসন পরিহার করে পরম-সত্তা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। ধীরে ধীরে এই দল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমাজে তাঁরা অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন দখল করেন।[২৮৪] এভাবে সুফীবাদ ও ইসলামী মরমীবাদ 'প্রথম কিছুসংখ্যক ব্যক্তি, পরে ছোট ছোট দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তারপর, ক্রমান্বয়ে এক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।'[২৮৫] এভাবেই নবী কারীম (সা.), তাঁর সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীনদের মাধ্যমে সূফী চিন্তাধারা বিকোশিত হতে থাকে।[২৮৬]

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আমীর আলী বলেছেন, 'হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে আদি ও সত্য খিলাফত ধ্বংস হবার পর যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তা বহু নিষ্ঠাবান মুসলিমকে একান্ত ইবাদত-

বন্দেগীতে মশগুল হতে বাধ্য করে। তাকওয়া থেকে মাত্র একহাত দূরত্ব হচ্ছে নিরাসক্ত জীবনের। আর সেখান থেকে অতীন্দ্রিয়বাদ স্বাভাবিক পথেই অগ্রসর হতে থাকে।'[২৮৭]

'অষ্টম শতাব্দীর শেষ ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগের সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইসলামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে ধর্মীয় আলোচনা, বুদ্ধিবাদী ভাবধারার কারণে ধর্মীয় প্রেরণার ক্রমিক নমনীয় ভাব,সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি ও সংশায়াত্মক ভাবধারা, খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মধ্যে শান্ত জীবনের অনুপস্থিতি–এসবই সমষ্টিগতভাবে কাজ করছিল ভক্তিবাদী ভাবধারাকে এধরনের অস্থিরতার দৃশ্যপট থেকে ক্রমবর্ধমান অনুধ্যানিক জীবনের আনন্দময় শান্তিতে ঠেলে দিতে।'[২৮৮]

বিভিন্ন তরিকার নিয়ম-কানুন এবং আধ্যাত্মিক সুলুক ও তালিম সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হয় এ শতকেই এবং এর আগে এসবের অনুশীলন মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। হিজরি দশম শতকে আধ্যাত্মিক সাধনার সুবিখ্যাত পীর, কুতুব ও প্রোজ্জ্বল পুরুষ ও মুরশিদগণ বিভিন্ন তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন সাহিত্য ও কাব্যকর্ম সৃষ্টি করেন যা আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০১, পৃ. ৫৮;
২. *আল কুরআন সুরা সেজদাহ, আয়াত-১৭;*
৩. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ;
৪. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম (*সংকলন), ঐ, পৃ. ৪৮;
৫. *আল কুরআন সুরা আলে ইমরান*;
৬. *আল কুরআন সুরা মু'মিনুন*;
৭. *আল কুরআন সুরা আল-নাহল, আয়াত-৪;*
৮. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৪৭;
৯. *আল কুরআন সুরা বনী- ইসরাইল, আয়াত-৮৫;*
১০. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৫৭;
১১. *Everyman's Encyclopedia vol. XI,* London, 1978, P. 203;
১২. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-১৩৮;*
১৩. আহমদ (র.), মাওলানা নিসার উদ্দীন, *হাকীকাতু মারিফাতুর রব্বানীয়া*, ছারছীনা দারুস সুন্নাত প্রেস, দিল্লী তারিখবিহীন, পৃ. ১৪; *মিশকাত শরীফ*, পৃ. ২০৪;
১৪. *আল কুরআন সুরা আনফাল, আয়াত-২।*
১৫. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-২৮৫।*
১৬. *আল কুরআন সুরা রা'দ, আয়াত-২৮।*
১৭. *আল কুরআন সুরা হিজর, আয়াত-২৯; আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৫৯।
১৮. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৫৯।

১৯. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অন্যন্যা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ১৬৭-১৬৮।
২০. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৭২।
২১. *আল কুরআন সুরা আল-ইমরান, আয়াত-১০৯।*
২২. *আল কুরআন সুরা হাদীদ, আয়াত-৩।*
২৩. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৫৯।
২৪. আলম, রসিদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, বগুড়া, ১৯৮১, পৃ. ৪১৪।
২৫. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৬০।
২৬. আলম, রসিদুল, ঐ।
২৭. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
২৮. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
২৯. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৬০-৬১।
৩০. *আল কুরআন সুরা ক্বাফ, আয়াত-১৬।*
৩১. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৬১।
৩২. *আল কুরআন সুরা আল হাদিদ, আয়াত-৪।*
৩৩. *আল কুরআন সুরা আ'রাফ, আয়াত-১৭৯।*
৩৪. চন্দ্রগুপ্ত, কল্যাণ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ, *ধর্ম-দর্শন*, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৯৯।
৩৫. *আল কুরআন সুরা যিলযাল, আয়াত-৭-৮; আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
৩৬. বুখারী ও মুসলিমঃ বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম (ওফাত ২৫৬ হি./৮৭৮খ্রি.) (সংক.), *সহিহ আল-বুখারী*, কুতুবখানা রাশিদিয়াহ, দিল্লী, হিজরী ১৩০৫; মুসলিম (র.), মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নীসাপূরী ইমাম (মৃ. ২৬১ হি./৮৬৫ খ্রি.) (সংক.), *সহীহ মুসলিম*, হাদীস একাডেমী, ঢাকা।
৩৭. *আল কুরআন সুরা আশ-শামস, আয়াত-৯-১০।*
৩৮. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-৪২।*
৩৯. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-২২২।*
৪০. রহমান, সাইদুর, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬৮।
৪১. *আল কুরআন সুরা আরাফ, আয়াত-২৬।*
৪২. *আল কুরআন সুরা আশ-শু'আরা, আয়াত-৮৮-৮৯।*
৪৩. তিরমিযি (র.), আল ইমামূল হাফিজ আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে সাওয়াতা ইবনে মূসা ইবনে জাহাকুস সুলামী আত ইমাম (ওফাত ২৭৯/৮৯৩) (সংক.), (তাহক্কিক-মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী/ আবু আব্দুর রহমান), *সুনান আত্-তিরমিযী*, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী।
৪৪. উদ্ধৃতঃ *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৬৫।
৪৫. Ahsan, Sayed Ali, *Songs of Lalon Shah*, Bangla Academy, Dhaka, 1964, P. 1.
৪৬. হক, খোন্দকার রিয়াজুল, *মরমী কবি খোদা বক্শ শাহ, জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-১৯৯৭, পৃ. ৩।
৪৭. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, প্রকাশক-ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩৪।
৪৮. মিয়া, মোঃ মুহসিন উদ্দিন, *উপমহাদেশে ইলমে তাসাউফ চর্চা ও বিকাশে খাজা মইনুদ্দিন চিশতি ও তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রভাব*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ও রূপরেখা, পৃ. ৩।
৪৯. Arnold, Sir, *The Legacy of Islam*, Oxford Press, 1st edition, 1965, P. 138-210.
৫০. সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, *ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দিন রুমী*, বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৮৪, পৃ. ২।
৫১. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ।
৫২. মিয়া, মোঃ মুহসিন উদ্দিন, ঐ।

৫৩. হক, খোন্দকার রিয়াজুল, *মরমী কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী*, লালন কেন্দীয় সংসদ, ঢাকা ও বাংলাদেশ মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ঢাকা, জুলাই-১৯৯৩, পৃ. ১৮।
৫৪. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১২৭।
৫৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খন্ড*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯৪।
৫৬. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
৫৭. উদ্ধৃত: উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৪৬।
৫৮. *আল কুরআন সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৭০; আল কুরআন সুরা ফজর, আয়াত-১৫।*
৫৯. *আল কুরআন সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত-৫৬।*
৬০. হুসাইন (র.), মাওলানা মুহাম্মদ (মৃত. ১৯৬৬), *সাবীলুন নাজাত ২য় খন্ড*, আল এমদাদ প্রেস, ঢাকা, তারিখবিহীন পৃ. ৪২-৪৫।
৬১. *আল কুরআন* সুরা মাউন, আয়াত-৪-৭।
৬২. *আল কুরআন* সুরা সাজদাহ, আয়াত-১৬।
৬৩. তিরমিযি (র.), আল ইমামূল হাফিজ আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে সাওয়াতা ইবনে মূসা ইবনে জাহাকুস সুলামী আত ইমাম (ওফাত ২৭৯/৮৯৩) (সংক.), *শামায়েলে তিরমিযি*, দিল্লী, পৃ. ২৫।
৬৪. *আল কুরআন* সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত-১৯; *আল কুরআন* সুরা আল-মা'আরিজ, আয়াত-২৪-২৫।
৬৫. *আল কুরআন* সুরা আল হাশর, আয়াত-৯; *আল কুরআন* সুরা আল বাকারা, আয়াত-১৭৭; *আল কুরআন* সুরা আদ-দাহর, আয়াত-৮।
৬৬. খাতীব (র.), শাইখ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল (মৃ.৭৩৭ হি.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী, ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৬৮।
৬৭. উদ্ধৃত: *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৪৮; আরো দ্রষ্টব্য: *উর্দুকী দুসরী কিতাব* ও আল-হাদিসের গ্রন্থসমূহ।
৬৮. দিমাশ্কী (র.), ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর (মৃ. ৭৭৪ হি.), আল ইমামুল জালাল আল-হাফিয, *দারুল ফিকর ৪র্থ খন্ড*, তারিখবিহীন, পৃ. ৩৩৮।
৬৯. *আল কুরআন* সুরা আল বাকারা, আয়াত-৩০।
৭০. *আল কুরআন সুরা আল ইমরান, আয়াত-৩২-১৩২; আল কুরআন আন নিসা, আয়াত-৫৯; আল কুরআন সুরা আল মায়েদা, আয়াত-১২; আল কুরআন সুরা আনফাল, আয়াত-৪৬; আল কুরআন সুরা আন-নূর, আয়াত-৫৪-৫৬; আল কুরআন সুরা মুহাম্মদ, আয়াত-৩৩; আল কুরআন সুরা আল মুজাদালাহ, আয়াত-১৩; আল কুরআন সুরা আত-তাগাবুন, আয়াত-১২।*
৭১. *আল কুরআন সুরা আন নিসা, আয়াত-৮০।*
৭২. *আল কুরআন* সুরা আনফাল, আয়াত-২৪।
৭৩. বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম (সংক.), *সহীহ বুখারী হাশিয়া নং* ১২, পৃ. ৩৬৯।
৭৪. *আল কুরআন সুরা আনফাল, আয়াত-২৪;* বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী (সংক.), *সহীহ বুখারী ২য় খন্ড*, পৃ. ৬৬৯।
৭৫. *আল কুরআন সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত-২৩।*
৭৬. হুসাইন (র.), মাওলানা মুহাম্মদ (মৃত. ১৯৬৬), *সাবীলুন নাজাত ২য় খন্ড*, ঐ, পৃ. ৩৯-৪০।
৭৭. *আল কুরআন সুরা লোকমান, আয়াত-১৫।*
৭৮. কাসীর, ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন, *তাফসীর ইবন কাসীর*, পৃ. ৪৪৫; আরো দ্রষ্টব্য: *তাবরানী*
৭৯. *আল কুরআন* সুরা বাকারা, আয়াত-২-৩।
৮০. খাযিন, ইমাম আলাউদ্দিন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল বাগদাদী আল, *তাফসীরুল খাযিন ৭ম খন্ড*, মাকতাবা তিজারিয়া আর কুবরা, মিশর, তারিখবিহীন, পৃ. ১৫৯।
৮১. *আল কুরআন সুরা আদ-দাহর, আয়াত-৮-৯।*

৮২. *আল কুরআন সুরা আদ-দাহর, আয়াত-৮।*

৮৩. বাগদাদী (র.), আবুল ফযল শিহাব-উদ্দীন আল-সাইয়দি মাহমুদ আল-আলুসী আল (ওফাত ১২৭ হি.) *তাফসীরে রূহুল মা'আনী*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৩৯৮ হি. /১৯৭৮ খ্রি.পৃ. ৫২-৫৩; *বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী* ইমাম (সংক.), *সহীহ বুখারী*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স। মুসলিম (র.), মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নীসাপূরী ইমাম (মৃ. ২৬১ হি./ ৮৬৫ খ্রি.) (সংক.), *সহীহ মুসলিম*, হাদীস একাডেমী, ঢাকা; তিরমিযি (র.), আল ইমামূল হাফিজ আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে সাওয়াতা ইবনে মূসা ইবনে জাহাকুস সুলামী আত জামী (মৃ.২৭৯হি./৮৯৩ খ্রি.) (সংক.) (তাহক্কিক-মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী/আবু আব্দুর রহমান), *সহীহ জামে' আত তিরমিযী*, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী; নাসাঈ (র.), আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইব্ন শুআয়ব ইব্ন আলী ইব্ন সিনান ইব্ন দীনার নাসাঈ খুরাসানী *(মৃ. ৩৩৩ হি. / ৯১৫ খ্রি.)* (সংক.) (অনুবাদ-মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), *সুনানে আন-নাসায়ী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৮৪. রহমান ও আহমদ, ফজলুর ও নাজির উদ্দীন, *আখসাফে ইসলামী*, রেইনবো প্রিন্টার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃ. ৫৮-৬২; ইমাম বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী (সংক.), *সহীহ বুখারী ২য় খন্ড*।

৮৫. মুসলিম (র.), মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নীসাপূরী ইমাম (মৃ. ২৬১ হি./৮৬৫ খ্রি.) (সংক.), *সহীহ মুসলিম*, হাদীস একাডেমী, ঢাকা।

৮৬. *আল কুরআন সুরা আর-রাহমান, আয়াত-৬০।*

৮৭. *আল কুরআন সুরা আল কাসাস, আয়াত-৭৭।*

৮৮. উদ্ধৃত: *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৫২; *আল-হাদিস-এর গ্রন্থাবলি* ।

৮৯. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।

৯০. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।

৯১. **ওমর খাইয়াম:** 'চাহার মাকালে'-এর বিবরণীতে জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কিত নিবন্ধে ওমর খাইয়ামের নাম পরিচয় সম্পর্কে এসেছে: খাজা ইমাম ওমর খাইয়াম হুজ্জাতুল হক হাকীম আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইব্রাহীম আল খাইয়াম নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের সূচনা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে অনেকের মতে ১০৩৮-১০৪৮ খ্রি. এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১২৩-১১২৪ খ্রি. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে *মাকালাতু ফি'ল জাবরী ওয়াল মুকাবিলা, মুসাদিরাতু, কিতাব-ই-উকলিদাস, মুশকিলাতুল হিসাব, রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম* উল্লেখযোগ্য। [দ্রষ্টব্য: বাদাখশানী, মীর্যা মকবুল বেগ, *আদব নামেয়ে ইরান*, এস ডি প্রিন্টার্স, লাহোর, তা. বি., পৃ. ২২৭-২৩৪; সাফা', যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান ১ম খণ্ড*, এন্তেশারাতে কোকনুস, তেহরান, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ, পৃ. ২৬৩-২৬৬; নোমানী, আল্লামা শিবলী, *শেরুল আজম ১ম খণ্ড*, পৃ. ১৬৭।]

৯২.কুব, যার্‌রীন, *বা' কা'রভা'নে হোলে, পৃ.* ১৩৭; তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস* (অনুবাদ-তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও ঈশা শাহেদী), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ পৃ. ১৫০

৯৩. বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম (সংক.), *সহীহ বুখারী*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

৯৪. রুমী, জালালউদ্দীন, মসনবী, (অনুবাদ-বেগম এ.হায়দার)

৯৫. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৫৩।

৯৬. *আল কুরআন সুরা আল মুলক, আয়াত-২।*

৯৭. *আল কুরআন সুরা ত্বীন, আয়াত-৪।*

৯৮. *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম*: বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম (সংক.), *সহীহ বুখারী*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স; ইমাম মুসলিম (র.), মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নীসাপূরী ইমাম (মৃ. ২৬১ হি. / ৮৬৫ খ্রি.) (সংক.), *সহীহ মুসলিম*, হাদীস একাডেমী, ঢাকা।

৯৯. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৫৪।

১০০ আল কুরআন সুরা আল-ইমরান, আয়াত-১০৯।

১০১. আল কুরআন সুরা যিলযাল, আয়াত-৬-৭-৮।

১০২. দাউদ (র.), আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবনু শাদ্দাদ ইবনু 'আমর ইবনু আমি' আবু, (তাহক্কিক-আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), (অনুবাদ-আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ), *সুনানে আবু দাউদ*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

১০৩. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।

১০৪. *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*: বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম, *সহীহ বুখারী*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স; মুসলিম (র.), মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নীসাপূরী ইমাম (মৃ. ২৬১ হি. / ৮৬৫ খ্রি.) (সংক.), *সহীহ মুসলিম*, হাদীস একাডেমী, ঢাকা।

১০৫. *আল কুরআন সুরা যিলযাল, আয়াত-৬-৭।*

১০৬. *আল কুরআন সুরা আল-ইমরান, আয়াত-১৯৫।*

১০৭. তিরমিযি (র.), আল ইমামূল হাফিজ আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে সাওয়াতা ইবনে মূসা ইবনে জাহাকুস সুলামী আত জামী (মৃ.২৭৯হি./৮৯৩ খ্রি.) (সংক.), (তাহক্কিক-মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী/আবু আব্দুর রহমান), *সহীহ জামে' আত তিরমিযী*, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী।

১০৮. *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*: বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম (সংক.), *সহীহ বুখারী*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স; মুসলিম (র.), মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নীসাপূরী ইমাম (মৃ. ২৬১ হি. / ৮৬৫ খ্রি.) (সংক.), *সহীহ মুসলিম*, হাদীস একাডেমী, ঢাকা।

১০৯. করিম, ফজলুল, *মানবধর্ম ১ম সংখ্যা*, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৪৩, পৃ. ১২৭-১৩৪।

১১০. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৫৫।

১১১. আল কুরআন সুরা জুমুআহ, আয়াত-১০।

১১২. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।

১১৩. **হাদিসে কুদসি:** যে হাদিসের ভাব আল্লাহর, আর এর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শব্দে তা প্রকাশ।

১১৪. তাবরেযী, আল্লামা খতীব, *মিশকাতুল মাসাবিহ* ৩, তা.বি., পৃ. ৮১।

১১৫. তাবরেযী, আল্লামা খতীব, *ঐ*।

১১৬. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৪২।

১১৭. *ঐ*, পৃ. *১৪৪।*

১১৮. *আল কুরআন সুরা আল-হাদীদ, আয়াত-২৭।*

১১৯. দাউদ (র.), আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবনু শাদ্দাদ ইবনু 'আমর ইবনু আমি' আবু, (তাহক্কিক-আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) (অনুবাদ-আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ), *সুনানে আবু দাউদ*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ও *বায়হাকী*।

১২০. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৮২।

১২১. মাজা (র.), আল-ইমামুর মহাদ্দিস আল হাফিযুস সিকাহ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়অযীদ বিন মাজাহ আর রিবঈ আল কাযবীনী ইবনে, (তাহক্কিক-আল হাফিয আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ), *সুনানে ইবনে মাজা*, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী।

১২২. *আল কুরআন সুরা ফাতির, আয়াত-২৮।*

১২৩. M. M. Sharif, *Muslim Thoughts: Its Origin and Achievements*, London, 1959, P. 10.

১২৪. *দৈনিক সংগ্রাম*, প্রিন্ট সংস্করণ, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

১২৫. *আল কুরআন সুরা ইউনুস, আয়াত-৭২।*

১২৬. রহমান, মুহাম্মদ জাফরুর, *ইফা. পত্রিকা*, প্রবন্ধ, ইসলামে পীর প্রথা, ২১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। উদ্ধৃত: *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৮৪।

১২৭. *আল কুরআন সুরা আরাফ, আয়াত-৩।*

১২৮. *আল কুরআন সুরা আত তাওবাহ, আয়াত-৩১।*

১২৯. *আল কুরআন সুরা আল ইমরান, আয়াত-১০৩।*
১৩০. *আল কুরআন সুরা আনআম, আয়াত-১৫৯।*
১৩১. *আল কুরআন সুরা আহযাব, আয়াত-২১।*
১৩২. *আল কুরআন সুরা আল ইমরান, আয়াত-৩১।*
১৩৩. দাউদ (র.), আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবনু শাদ্দাদ ইবনু 'আমর ইবনু আমি' আবু, (তাহক্কিক-আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) (অনুবাদ-আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ), *সুনানে আবু দাউদ*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স; *বায়হাকী*।
১৩৪. *সহীহ মুসলিম* ও *বুখারী*: মুসলিম (র.), মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নীসাপূরী ইমাম (মৃ. ২৬১ হি. / ৮৬৫ খ্রি.) (সংক.), *সহীহ মুসলিম*, হাদীস একাডেমী, ঢাকা; বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম (সংক.), *সহীহ বুখারী হাদিস নং*-২৬৯৭, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।
১৩৫. হাম্বাল (র.), ইমাম আহমদ ইবনে, (মৃ.৮৫৫ খ্রি.) *মুসনাদে* আহমাদ *৪র্থ খন্ড*, পৃ.-৮, *২য় খন্ড*, পৃ. ৫১৫; আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, *১ম খন্ড*, পৃ. ৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৭৫-৩৭৭–৩৭৮; সমহুদী, *ওফাউল* ওফা *১ম খন্ড*, পৃ. ৩২২; *কিতাবুর রিকাক*, পৃ. ৯৫৫।
১৩৬. তিরমিযি (র.), আল ইমামূল হাফিজ আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে সাওয়াতা ইবনে মূসা ইবনে জাহাকুস সুলামী আত জামী (মৃ.২৭৯হি./৮৯৩ খ্রি.) (সংক.) (তাহক্কিক-মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী/আবু আব্দুর রহমান), *সহীহ জামে' আত তিরমিযী*, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী।
১৩৭. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৭৯।
১৩৮. আল কুরআন সুরা ফাত্হ, আয়াত-১৮।
১৩৯. *আল কুরআন সুরা আল ইমরান, আয়াত-৩২।*
১৪০. আল কুরআন সুরা মায়েদা, আয়াত-৯২।
১৪১. আল কুরআন সুরা নিসা, আয়াত-৫৯।
১৪২. আল কুরআন সুরা আত তাওবাহ, আয়াত-১১১।
১৪৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ সংখ্যা।
১৪৪. খালদুন, ইবনে, *মুকদ্দমা।*
১৪৫. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
১৪৬. *ঐ*, পৃ, ১৭৮।
১৪৭. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঐ।*
১৪৮. *আল কুরআন সুরা আন-নাজম, আয়াত-২-৩-৪।*
১৪৯. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১৭৯।
১৫০. *ঐ*, পৃ. ১৮৩-১৮৪।
১৫১. *আল কুরআন সুরা আর-রাহমান আয়াত-৬-৭।*
১৫২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮০ সংখ্যা।
১৫৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড*, পৃ. ৪৯৪।
১৫৪. হাম্বাল (র.), ইমাম আহমদ ইবনে, (মৃ.৮৫৫ খ্রি.) *মুসনাদে* আহমাদ *৪র্থ খন্ড*, পৃ.-৮, *২য় খন্ড*, পৃ. ৫১৫; আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, *১ম খন্ড*, পৃ. ৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৭৫-৩৭৭–৩৭৮; সমহুদী, *ওফাউল* ওফা *১ম খন্ড*, পৃ. ৩২২; *কিতাবুর রিকাক*, পৃ. ৯৫৫।
১৫৫. Hai, Sayed Abdul, *Muslim Philosophy*, Islamic Foundation, 1982, P. 141.
১৫৬. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৮১।
১৫৭. সরকার, মো: সোলায়মান আলী, *ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দিন রুমী*, বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৮৪, পৃ. ২।
১৫৮. Hai, Sayed Abdul, Ibid.
১৫৯. নিযামী, খালীক আহমদ, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, দিল্লী, ১৯৬৩, পৃ. ১৮।

১৬০. Nicolson, Dr. R. A, *The idea of personality in Sufism*, First Edition, Cambridge university press, London, 1923. P.37)

১৬১. Nicholson, Dr. R.A, *The Mystics of Islam,* Beirut-Khayats 1966, P. 18; Dr. T. J. Deboar, *History of Philosophy in Islam*, London, 1961; A. J. Arberry, *Sufism*, London, 1969.

১৬২. হাযারী, মাওলানা আবদুর রাহীম, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১।

১৬৩. আলম, ড. রশিদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা ৮ম সংখ্যা*, প্রীতি প্রিন্টিং প্রেস, বগুড়া, ১৯৮১, পৃ. ৩৪৭, ৩৪৮।

১৬৪. কুশাইরী, আল্লামা কুশাইরী (মৃ. ৯৪৪খ্রি.), *রিসালায়ে কুশাইরিয়া*, মিশর, পৃ. ১৯।

১৬৫. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১০১।

১৬৬. রশিদ, আ. ন.ম. বজলুর, *আমাদের সুফী সাধক*, ইসলামিক ফাউনডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৩।

১৬৭. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।

১৬৮. *আল কুরআন সুরা মুয্যামিল*, *আয়াত-৮-৯*।

১৬৯. *আল কুরআন সুরা আনফাল*, *আয়াত নং-২*।

১৭০. *আল কুরআন সুরা আয-যুমার*, *আয়াত-২৩*।

১৭১. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১১।

১৭২. *হাদীসে জিবরীল* ১/২, পৃ. ১১; মাজা (র.), আল-ইমামুর মহাদ্দিস আল হাফিযুস সিকাহ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়অযীদ বিন মাজাহ আর রিবঈ আল কাযবীনী ইবনে, (তাহক্কিক-আল হাফিয আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ), *সুনানে ইবনে মাজা*, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী; খাতীব (র.), শাইখ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল (মৃ.৭৩৭ হি.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী, ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

১৭৩. নোমানী, মাওলানা মনুযুর, *তাসাউফ কাহাকে বলে*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৭;

১৭৪. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১০২।

১৭৫. Rahman, Sayedur, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Mullick Brothers, 3/1 Banglabazar Dacca, 1963, P. 107.

১৭৬. রশিদ, ফকির আবদুর, *সূফী দর্শন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪, পৃ. ২।

১৭৭. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।

১৭৮. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১০২, ১০৩।

১৭৯. নূরী, আবদুল মালেক, *সুফীবাদ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪, পৃ. ৩১।

১৮০. কুশাইরী, আল্লামা কুশাইরী (মৃ. ৯৪৪খ্রি.), *রিসালায়ে কুশাইরিয়া*, মিশর, ঐ।

১৮১. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৮১।

১৮২. নিযামী, খালীক আহমদ, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, দিল্লী, ১৯৬৩, পৃ. ১৮; সর্‌রাজ, আবু নসর আস, *কিতাবুল লুমা*, পৃ. ২১।

১৮৩. জামী, আল্লামা, *নাফাহাতুল উন্‌স*, মদীনা পাবলিশিং কোম্পানী, করাচী, ১৯৮২, পৃ. ১৭৭-১৭৮।

১৮৪. কারী, আল, *মাশারেউল উশ্‌শাক*, জাওয়ায়েয প্রেস, কনস্টান্টিনোপল, পৃ. ২২৪।

১৮৫. ইসলাম, জেহাদুল ও খান, সাইফুল ইসলাম (অনূদিত), *দিওয়ান-ই-মুইননুদ্দিন*, খাজা মঞ্জিল, ৫৯২, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ. ৪৭১-৪৭২।

১৮৬. *আল কুরআন সুরা মুতাফ্‌ফিফীন*, *আয়াত-১৪*।

১৮৭. আহমদ (র.), মাওলানা নিসার উদ্দীন, *হাকীকাতু মারিফাতুর রব্বানীয়া*, ছারছীনা দারুস সুন্নাত প্রেস, তারিখবিহীন, দিল্লী, পৃ. ১৪; তাবরেযী, আল্লামা খতীব, *মিশকাতুল মাসাবিহ* ৩, তা.বি. পৃ. ২০৪।

১৮৮. *আল কুরআন* সুরা বাকারা, আয়াত-১৩৮।

১৮৯. আহমদ (র.), মাওলানা নিসার উদ্দীন, *ঐ*, পৃ. ৪-১৪।

১৯০. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১০৩।

১৯১. Ali, Sayed Amir, `T*he Spirit of Islam'*, Kutub Khana-ul-Islam (Regd) Churi Walan, Delhi, P. 456.

১৯২. Rahman, Sayedur, Ibid, P. 102.

১৯৩. খান, অধ্যাপক দরবেশ আলী, অনূদিত, '*ইসলামের মর্মবাণী*', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬৬।
১৯৪. আফিফী, আবুল আলা, *ফী-তাসাউফিল ইসলামী*, তারিখবিহীন, কায়রো, ১৯৬৯, পৃ. ২৮।
১৯৫. *ঐ*, পৃ. ২৯।
১৯৬. *ঐ*।
১৯৭. *ঐ*।
১৯৮. কুশাইরী, আল্লামা কুশাইরী (মৃ. ৯৪৪খ্রি.), *ঐ*।
১৯৯. আফিফী, আবুল আলা, *ঐ*, পৃ. ৩৩; আলম, ড. রশিদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, *ঐ*, *পৃ.* ৩৫৯।
২০০. আফিফী, আবুল আলা, *ঐ*, পৃ. ৩৫; আলম, ড. রশিদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, *ঐ*।
২০১. আলম, ড. রশিদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, *ঐ*।
২০২. আফিফী, আবুল আলা, *ঐ*, পৃ. ৩৬; নিযামী, খালীক আহমদ, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, ঐ, পৃ. ৫৮।
২০৩. নিযামী, খালীক আহমদ, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, ঐ, পৃ. ৫৮; হুজবেরী, আলী ইবন উসমান, দাতা গঞ্জেবখশ, *কাশফুল মাহযুব*, মাকতাবা থানভী, দেওবন্দ, ইউ, পি. ভারত, তারিখবিহীন, পৃ. ২০।
২০৪. *আল কুরআন সুরা কলম, আয়াত-৩-৪*।
২০৫. *আল কুরআন সুরা কলম, আয়াত-৩-৪*।
২০৬. নিযামী, খালীক আহমদ, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, ঐ, পৃ. ৫৫।
২০৭. নিযামী, খালীক আহমদ, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, ঐ, পৃ. ৫৬; গাযালী (র.), ইমাম, (মৃ.১১১১ খ্রি.), *ইহয়াউল উলুমিদ্দীন*; দাউদ (র.), আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবনু শাদ্দাদ ইবনু 'আমর ইবনু আমি' আবু, (তাহক্কিক-আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) (অনুবাদ-আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ), *সুনানে আবু দাউদ*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।
২০৮. হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল ' *ইসলামের ইতিহাস*, গ্লোব লাইব্রেরী প্রা: লি:, ঢাকা ও বরিশাল, ১৯৮৭, পৃ. ৬৮৭।
২০৯. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
২১০. *আল কুরআন*
২১১. হাযারী, মাওলানা আবদুর রাহীম, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, ঐ, পৃ. ৬৯।
২১২. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ, পৃ. ৬৯-১৬৭-১৬৮।
২১৩. হক, মুহাম্মদ এনামুল, *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব: বঙ্গীয় মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের এক অধ্যায়*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃ. ২৫-২৬।
২১৪. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *ঐ*, পৃ. ৪১-৪৪।
২১৫. Nicholson, Dr. R.A, *The Mystics of Islam,* Ibid, P. 17.
২১৬. Dasgupta, S.N., *History of Indian Philosophy vol.1,* Cambridge, 1959, P. 50.
২১৭. ইসলাম, জেহাদুল ও খান, সাইফুল ইসলাম (অনূদিত), *দিওয়ান-ই-মুইননুদ্দিন*, খাজা মঞ্জিল, ৫৯২, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৭৩।
২১৮. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১০৬।
২১৯. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ, পৃ. ৬৪।
২২০. রশিদ, ফকির আবদুর, *সূফী দর্শন*, ঐ, পৃ. ১০২।
২২১. আলম, ড. রশিদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, *ঐ*, পৃ. ৩৭৮।
২২২. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ।
২২৩. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১০৮।
২২৪. রশিদ, ফকির আবদুর, *সূফী দর্শন*, ঐ, পৃ. ১০০-১০১।
২২৫. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
২২৬. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ।
২২৭. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১০৯।

২২৮. Nicholson, Dr. R.A, *The Mystics of Islam,* Ibid, P. 18.
২২৯. Nicholson, Dr. R.A, *Studies in Islamic Mysticism*, Cambridge, 1967, P. 9.
২৩০. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১০৭।
২৩১. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ।
২৩২. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *ঐ*, পৃ. ৪৪।
২৩৩. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১১০।
২৩৪. রশিদ, ফকির আবদুর, *সূফী দর্শন*, ঐ, পৃ. ১০৩।
২৩৫. রশিদ, ফকির আবদুর, *সূফী দর্শন*, ঐ।
২৩৬. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
২৩৭. রশিদ, ফকির আবদুর, *সূফী দর্শন*, ঐ।
২৩৮. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ।
২৩৯. Nicholson, Dr. R.A, *Studies in Islamic Mysticism*, Cambridge, 1967, P. 11-13.
২৪০. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ, পৃ. ৬৫।
২৪১. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১১১।
২৪২. আলম, ড. রশিদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, *ঐ*, পৃ. ৩৭৯।
২৪৩. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
২৪৪. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ।
২৪৫. Iqbal, Dr. Mohammad, '*The Development of Metaphysics in Persia*,' Ashaf press, 7 Aibak Road, Lahore, 1965, p. 76.
২৪৬. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১১২।
২৪৭. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *ঐ*।
২৪৮. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ।
২৪৯. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
২৫০. Nicholson, Dr. R.A, *Studies in Islamic Mysticism*, Cambridge, 1967, p. 9.
২৫১. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ।
২৫২. রশিদ, ফকির আবদুর, *সূফী দর্শন*, ঐ, পৃ. ১০৫।
২৫৩. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ।
২৫৪. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১১৩।
২৫৫. রহমান, চৌধুরী শামসুর, *সুফিদর্শন*, দিব্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ১৭১।
২৫৬. Nicolson, Dr. R. A, *The idea of personality in Sufism*, Ibid.
২৫৭. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *ঐ*, পৃ. ৪২।
২৫৮. তারাচাঁদ, ড., *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদ-করুনাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, মার্চ, ১৯৮৮, পৃ. ৪৩।
২৫৯. *সুরা আল-মায়েদা*, *আয়াত-৪৮*।
২৬০. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১১৪।
২৬১. বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম (ওফাত ২৫৬ হি. / ৮৭৮খ্রি.), *সহিহ আল-বুখারি*, কুতুবখানা রাশিদিয়াহ, দিল্লী, হিজরী, ১৩০৫, পৃ. ২৩।
২৬২. ওয়ালিউদ্দীন, শায়খ, *আল মিশকাতুল মাসাবিহ ইলম পর্ব*, দিল্লী, ভারত, তা.বি. পৃ. ৩৭; বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী ইমাম (ওফাত ২৫৬ হি. / ৮৭৮খ্রি.), *সহিহ আল-বুখারি*, কুতুবখানা রাশিদিয়াহ, দিল্লী, হিজরী, ১৩০৫।
২৬৩. আলবানী, শায়খ নাসিরুদ্দিন (সংকলন), *সহিহ হাদিসে-কুদসি*, তা.বি.

২৬৪. *আল কুরআন সূরা লুকমান আয়াত-২০*।
২৬৫. *মিশকাত শরিফ*, কিতাবুল ইলম, তা.বি. পৃ. ৩৫।
২৬৬. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-২৫৫*।
২৬৭. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৬*।
২৬৮. *আল কুরআন সুরা ফুসসিলাত, আয়াত-৫৩*।
২৬৯. *আল কুরআন সুরা হিজর, আয়াত-২৯*।
২৭০. *আল কুরআন সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত-২১*।
২৭১. *আল কুরআন সুরা ক্বাফ, আয়াত-১৬*।
২৭২. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৬*।
২৭৩. *আল কুরআন সুরা আল-হাদীদ, আয়াত-৪*।
২৭৪. *আল কুরআন সুরা আল-হাদীদ, আয়াত-৩*।
২৭৫. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৬*।
২৭৬. *আল কুরআন সুরা বাকারা, আয়াত-১৫২*।
২৭৭. *আল কুরআন সুরা মুযাম্মিল, আয়াত-৮-৯*।
২৭৮. *আল কুরআন সুরা ফজর, আয়াত- ২৭-৩০*।
২৭৯. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ৬৮।
২৮০. Ali, Sayed Amir `T*he Spirit of Islam'*, Kutub Khana-ul-Islam (Regd) Churi Walan, Delhi, P. 456-467.
২৮১. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ, পৃ. ৬৯।
২৮২. হামিদ, মো: আবদুল, *সুফী দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, মনন রা: বি: ১৯৭৩, পৃ. ৪২।
২৮৩. Rahman, Sayedur, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Ibid. p. 156.
২৮৪. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঐ, পৃ. ৭০।
২৮৫. Smith, M., *History of Mysticism*, 1933, P. 63.
২৮৬. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ঐ, পৃ. ১১৬।
২৮৭. Ali, Sayed Amir `T*he Spirit of Islam'*, Ibid. p. 459.
২৮৮. Iqbal, Dr. Mohammad, `*The Reconstruction of Religious Thought in Islam*,' Ashraf Press, 7 Aibak Road, Lahore, 1965, p. 193-194; ইকবাল, ড. মুহাম্মদ, *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

১

২

৩

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

র

প্রিন্ট হবে না এই পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

ফারসি সাহিত্য: বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় অধ্যায়

ফারসি সাহিত্য: বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ফারসি সাহিত্য: বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সাহিত্য

সভ্য দুনিয়ার অন্যতম আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাহিত্য। কোনো সুসভ্য ও আধুনিক সমাজের অন্যতম বাহন অথবা সত্য অনুসন্ধানের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ভালোমন্দ নানা মানুষের মিলনে গড়ে ওঠা সমাজই হচ্ছে সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়।[১]

সাহিত্য বলতে যথাসম্ভব কোনো লিখিত বিষয়বস্তুকে বুঝায়। সাহিত্য মননশীলতার প্রতীক এবং শিল্পের একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়, অথবা এমন কোনো লেখনী, যেখানে শিল্পের বা বুদ্ধিমত্তার আঁচ পাওয়া যায়,অথবা যা বিশেষ কোনো প্রকারে সাধারণ লেখনী থেকে আলাদা। মোটকথা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তাচেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য।[২] সাহিত্য জীবন ও জগতের সত্য ও একান্ত গভীর উপলব্ধির প্রকাশ। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। সাহিত্যে মানব মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং মানব জীবনের শাশ্বত ও চিরন্তন অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। তাই সাহিত্যকে মানব ও সমাজ জীবন এবং জাতিসমূহের সংস্কৃতি ও সভ্যতার দর্পণ হিসেবেও আখ্যা দেয় হয়। কেননা, প্রত্যেক জাতির নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানাবিধ দিকসমূহ লিখিত কর্ম ও কীর্তিসমূহের মধ্যে, বিশেষত সাহিত্যকীর্তির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

ইংরেজি সাহিত্য ‘লিটারেচার’ (Literature)-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘সাহিত্য’ শব্দ আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু ‘Literature’ বলতে ব্যাপক অর্থে যাবতীয় লিখিতি ও মুদ্রিত গ্রন্থ বা রচনাকে বুঝায়। এমনকি রেলগাড়ি, রান্নার বই, পঞ্জিকা, আইনগ্রন্থ, কিংবা বলবর্ধক টনিকের গুণাগুণ সম্বলিত নির্দেশিকাকেও বুঝায়। কিন্তু ‘সাহিত্য’ প্রকৃত অর্থে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মতো নয়। ‘সাহিত্য’ বলতে আমরা সেসব রচনাবলীকেই স্বীকৃতি দিই, যেগুলো জীবন প্রবাহের বিচিত্র ও জটিল অভিজ্ঞতাসমূহকে মন্থন করে কেনো ‘বিশেষ সৃজন’ রূপে যার সৃষ্টি বা উদ্ভব।

প্রাচ্যের সাহিত্য সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাস তাঁর 'সাহিত্য সন্দর্শন' নামক গ্রন্থের ১১২ নং পৃষ্ঠায় সাহিত্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন-'নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্য-জগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝংকৃত হয়, তাহার শিল্পসংগত প্রকাশই সাহিত্য।'

সাহিত্যের পরিধিও ব্যাপক। মানুষের কল্যাণের জন্য যাঁরা জগতে যত বাণী উচ্চারণ করেছেন; যেমন-ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার বাণীসমূহ এবং মনীষী বা মহামানবদের কল্যাণমূলক সকল বাণীই সাহিত্যের পর্যায়ভূক্ত। এজন্য ড.লুৎফর রহমান সাহিত্যের এ ব্যাপকতাকে লক্ষ্য করে স্মরণযগ্যে একটি মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যটি হলো-'জীবনের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন-তাহাই সাহিত্য।'

সাহিত্যের আদি শব্দ শিল্প হলো-কবিতা। মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় মানুষ ক্রমান্বয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন, জীবন উপভোগ ও মনের সূক্ষ্মতর ভাব, অনুভূতি বা জীবন অভিজ্ঞতাকে শিল্পময় করে মননশীলভাবে প্রকাশের প্রয়োজনে কতিার পর বিভিন্ন সাহিত্য আঙ্গিকের মধ্যে সৃষ্টি করেছে নাটক, ভ্রমণ সাহিত্য ও রম্য-রচনার মতো নানা রকমের সাহিত্যের শাখা।

বলা বাহুল্য, সাহিত্য সৃষ্টির এ প্রয়াস বিভিন্ন যুগ-কাল-জাতি ও সভ্যতায় নানা রূপ পরিগ্রহ করে থাকে, যে প্রবাহ সদা বহমান। ফারসি সাহিত্যও বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনের একটি অনন্য ও অসাধারণ সাহিত্য যা স্বীয় মর্যাদা ও প্রাচুর্যতায় পূর্ণ। ফারসি সাহিত্যের এই প্রাচুর্য ও অনন্যতার মূলে রয়েছে বিভিন্ন যুগ-কাল-জাতি ও সভ্যতায় আবির্ভূত উচ্চ মার্গীয় কবি-সাহিত্যিক এবং তাঁদের সাহিত্য-কর্মের পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী বিভিন্ন শাসক ও রাজেন্যবর্গ। যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও সমাদর কবি-সাহিত্যিকদের উৎসাহ যুগিয়েছে। ফলস্বরূপ, কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মের বিনির্মাণে অপরিসীম দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্য সভায় এই ফারসি সাহিত্যকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাই, বর্তমান সময়েও ফারসি সাহিত্য ধারণকারী উত্তরসূরিরাও ফারসি সাহিত্যের স্বর্ণালি যুগের কবি-সাহিত্যিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফারসি সাহিত্যের এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য

প্রাচীনকালে সমৃদ্ধ সভ্যতার অধিকারী জাতিগুলো সাহিত্যের দিক থেকে অনেক উঁচু ও সমৃদ্ধ সাহিত্যেরও অধিকারী ছিল। ইরানও প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইরানের কয়েক হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতায় শেকড় গেড়ে থাকা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ এ ইরানী সংস্কৃতি এবং সাহিত্য মূল্যবান ফার্সী কাব্য ও গদ্য সাহিত্যকর্মের

মধ্যে প্রতিভাত হয়।[৩] ফারসি ভাষার নামকরণ প্রসঙ্গে আবদুস সবুর খান বলেন, বর্তমান ইরান নামে পরিচিত যে রাষ্ট্র, পূর্বে এর একটি অংশের নাম ছিল ফার্স বা পারস্য (Persia)। এই ফার্স থেকেই ফারসি ভাষা।[৪]

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁর *ইরানের কবি* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

'প্রাচীনকালে গ্রীকরা এই প্রদেশের সংস্পর্শে আসেন। গ্রীক ঐতিহাসিকরা এই অঞ্চলকে পারসিস (Persis) বলিত, তারি ফলে এই প্রদেশের নামানুসারে সমগ্রদেশ পারসিয়া (Persia) নামে বহির্জগতে পরিচিত হয়।'[৫]

আবদুস সাত্তার ফারসি ভাষার অস্তিত্বের প্রাচীন নমুনা ও প্রমাণ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলেন,

'ফারসী ভাষার ইতিহাস সু-প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সমূহে ফারসী ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং এই প্রমাণ বিধৃত আছে আর্যদের প্রাথমিক ইরানীয় ভূখণ্ডে আগমনকেন্দ্রিক দলিল দস্তাবেজে।'[৬]

এই ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশও ইরানেই ঘটে এবং পৃথিবীর সমৃদ্ধ সাহিত্যের মর্যাদায় নিজের স্থান আসীন করে নেয়। 'ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। প্রাচীন পারসিকরা বংশগত দিক থেকে ছিল 'অরিয়' অর্থাৎ 'আর্য' বংশদ্ভূত। এই 'অরিয়' থেকেই মধ্যযুগের ফারসিতে এদেশের নাম হয়েছে 'এরান' এবং আধুনিক যুগে হয়েছে 'ইরান'।'[৭] 'ইরান আর্যদের যাযাবর জীবনের প্রাচীন বাসস্থান ছিল। আর্য ও ইরান সমধ্বনি গোত্রীয় শব্দ। পারস্য শব্দ ইরান ও সংস্কৃত শব্দ আর্য একই মূল শব্দ হইতে উদ্ভূত।'[৮]

প্রাচীন ইরানীয় ভূখণ্ডের অধিবাসীদের একমাত্র ভাষা ছিল প্রাচীন ফারসী এবং আর্যরাও তখন এই ভাষা মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করতেন।[৯] পরবর্তীকালে এই আর্যসমাজ যখন সুদূর ভারত পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন তখন সেই ভাষার পরিবর্তন সাধন করে সংস্কৃতে রূপ দেন।[১০] ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলো থেকে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

'ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এই গোষ্ঠীভূক্ত অন্যান্য ভাষাগুলো হচ্ছে সংস্কৃত, আবেস্তীয়, আর্মানীয়, প্রাচীন শ্লাভিক, প্রাচীন গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন জার্মানিক, প্রাচীন কেলতিক প্রভৃতি। ধারণা করা হয় আনুমানিক ২৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মূল ভাষা হতে বিশ্লিষ্ট হয়ে এই প্রাচীন ভাষাগুলোর জন্ম হয়েছিল। এর অনতিকাল পরেই এরা ইউরোপ ও এশিয়ার স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।'[১১]

খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে জোরোষ্টার প্রবর্তিত পার্শী ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাষার সঙ্গে ফারসী ভাষার সাযুজ্য রয়েছে।[১২] 'ধর্মভিত্তিক প্রাচীন সাহিত্যিক মূল্য সম্পন্ন যে গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম জেন্দাবেস্তা। জেন্দাবেস্তা ছিল জরথুস্ট্রের জরথুস্ট্রবাদী ধর্মের গ্রন্থ।'[১৩]

'আবেস্তা বা জেন্দাবেস্তা গ্রন্থের ভাষা পাহলবী। প্রাচীন ফারসী ভাষা ছিল পাহলবী ভাষার চেয়েও প্রাচীন এবং উন্নত। কেননা, ফারসী ভাষার কিউনিফর্ম রীতিই তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এবং এই রীতি পাহলভী ভাষায় অনুপস্থিত। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে যখন উম্মাইদ এমনকি আব্বাসীয় শাসন সমগ্র ইরানীয় ভূখণ্ডে কায়েম হয় তখন এতদ্‌ঞ্চলের ভাষার কোনো পরিবর্তন তাঁরা করেন নি। পাহলভী ভাষার অনেক শব্দ যদিও আরবী ভাষায় সংমিশ্রিত ছিল তথাপি তাঁরা আরবী হরফে ফারসী ভাষার নবজন্ম দান করলেন এবং এই ভাষা অভিহিত হলো আধুনিক ফারসী ভাষা বা দারী ভাষারূপে।'[১৪]

ফলে ফারসি প্রেমীদের হৃদয়ে তাঁরা স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হন। এই ফারসি দারী ভাষা বা আধুনিক ফারসি ভাষা তাঁদের কার্যকরী অন্তরিক ভূমিকার ফলে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হতে থাকে; যা পরবর্তী সময়ে সুদূর ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

'অপরদিকে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে (১২০৪ খ্রিস্টাব্দ) মঈজুদ্দিন মুহাম্মদ সামের (শিহাবুদ্দিন ঘুরী) সিপাহসালার ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকেই এদেশে ফারসি চর্চা ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করে। আরও পরে উত্তর ভারতে তুর্কি-আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং এর বিস্তারের ফলে সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৪২-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা মোগল শাসকদের অধিকারে আসে এবং ফারসি হয়ে ওঠে এদতঞ্চলসহ পুরো ভারতবর্ষের আদালত, প্রশাসন এবং জ্ঞানচর্চার ভাষা। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর বাংলা মুসলিম শাসক তথা তুর্কি-আফগান-মোগলদের দ্বারা শাসিত হয়। উল্লেখিত কয়েক শতকে, এমনকি ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন পরবর্তী প্রায় ৮০ বছর (১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ফারসি যেমন ছিল ভারত উপমহাদেশের প্রশাসন, আদালত ও জ্ঞান চর্চার ভাষা, অপরদিকে তেমনি ফারসি সাহিত্যাকাশে ফেরদৌসী, হাফেজ, আত্তার, খৈয়্যাম, রুমী, জামী প্রমুখের ন্যায় উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির আবির্ভাবের ফলে মধ্যযুগের পুরোটা জুড়েই শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিশ্বসাহিত্য-দরবারের সিংহাসনটি ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের অধিকারে ছিল।'[১৫]

'গজনবী, মোঙ্গল এবং তৈমুর শাসন আমলে ফারসী বা দারী ভাষা রাজ-ভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং এর সাহিত্যও গৌরবময় দিকচিহ্নের সূচনা করে। এই ভাষার বিস্তৃতি তাজিকিস্তানসহ সোভিয়েত দেশের বিভিন্নি

অঞ্চলে এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রভৃতি স্থানে।'[১৬] 'বর্তমানে ইরানের রাষ্ট্রভাষা ফারসি। যদিও ইরানের বাইরেও, বিশেষ করে আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি হবার কারণে এসব দেশেও ফারসি ভাষায় সাহিত্যচর্চা হয়ে থাকে।'[১৭]

ফারসি সাহিত্যের বিস্তৃতি, বিকাশ ও উৎকর্ষ

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এবং সাহিত্যের মর্যাদার আসনে ফারসি সাহিত্যের স্থান অতি উচ্চ মার্গে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। ড. আহমাদ তামীমদারী বলেন, খ্রিস্টপূর্ব সাতশ বছর পূর্ব থেকেই ফার্সী ভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে রয়েছে অমূল্য কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ এ রত্নরাজি সাহিত্য-পিপাসুদের জন্য চিরায়ত উৎসরূপে সর্বজন স্বীকৃত। বিশ্ববরেণ্য অমর ফারসি কবিদের কাব্যকর্ম জগতে পরিবেশিত হবার ফলে যখন জগত বিমোহিত তখন ফারসি ভাষায় রচিত ফারসি সাহিত্য সর্বজনগ্রাহ্য হলো এবং ব্যাপক বিস্তারের নানা রূপ পরিগ্রহ করার পথ সুগম করলো। ফারসি সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতির পেছনে যেসব ফারসি কবির অবদান সবচেয়ে বেশি তাঁদের শীর্ষেই রয়েছেন সানায়ি, আত্তার, সাদি, হাফিজ, রুমি, ফেরদৌসি, জামি, খাইয়ামের মতো যুগশ্রেষ্ঠ কবিগণ।

'এসব নামের মাধ্যমেই ফার্সীর প্রথম দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়। এরাই ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের রাজাধিরাজ, এরাই ছিল এর সুউচ্চ দৃঢ় শিখর, এই বাগানের চিরসবুজ ফুল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ফার্সী সাহিত্যে সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সুনিশ্চতভাবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, এর খ্যাতি ও বিস্তারের ব্যাপকতা প্রধানত ক্লাসিক কবিতার কাছেই ঋণী।'[১৮]

আর ফারসি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে ক্লাসিক কবিতার এ ধারা ও শাখাই ব্যাপক, বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আবদুস সাত্তার বলেন,

'আরবী সাহিত্যের মতো ফারসী সাহিত্যের কাব্য শাখাই সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইরানীয় ভূখণ্ডে ইসলামী শাসন কায়েম হয় তখন থেকেই ফারসী সাহিত্যের নবজন্মের সূত্রপাত হয় এবং কবি-সাহিত্যিকগণও নব উন্মাদনায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ফারসী সাহিত্যের আসলরূপ ইসলামীয় শাসন আমল থেকেই আরম্ভ হয় বলা চলে।'[১৯]

এসময় থেকেই ফারসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা হতে থাকে যা ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপক্ষো উল্লেখযোগ্য। আর মধ্যযুগের ফারসি সাহিত্যে চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। 'মধ্যযুগে ফারসি সাহিত্য উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছে। এ যুগে আবুল কাসেম ফেরদৌসী, ফারসি ভাষায় শাহনামা রচনা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছড়ান।

তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ওমর খইয়াম, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, হাফেজ সিরাজী, জালাল উদ্দিন রুমী প্রমুখের ন্যায় বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যঅতিমান কবিদের আগমন ঘটে।'[২০]

ফারসি সাহিত্যের সূচনাপর্ব, বিকাশ, বিস্তৃতি, উৎকর্ষ ও গৌরবময় যুগের সাহিত্যকীর্তিগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন রাজনৈতিক যুগ ও শাসনকাল অতিবাহিত করেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ ও কালে বিভিন্ন শাসক ও শাসনকালে সংশ্লিষ্ট শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ফারসি সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধিতে অপরিসীম অবদান রাখে।

'নিঃসন্দেহে ফার্সী সাহিত্যের উদ্ভব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এর অগ্রগতি ও চলার পথে রাজনৈতিক যুগ ও কালের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে সময় বা কালের এই স্তরগুলো 'সাহিত্যের যুগ' নামে পরিচিত।'[২১]

ফারসি সাহিত্যের সাহিত্যের বিস্তৃতির এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে আবদুস সাত্তার বলেন,

'ফারসী সাহিত্যের কালক্রম ভাগ করলে চারটি প্রধান ভাগে একে ভাগ করা যায়:

এক. ক্রমবর্ধমান যুগ। অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ।

দুই. গৌরবময় যুগ। একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গৌরবময় যুগের সময় সীমা। গজনবী ও সালজুক শাসন আমলেই ফারসী সাহিত্যের উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠা লক্ষ্যযোগ্য।

তিন. মোঙ্গল, তৈমুর এবং পরবর্তী শাসকদের কার্যকরী ভূমিকায় ফারসী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই সময়সীমা বিস্তৃত। এবং এটাই আধুনিক-পূর্ব যুগ।

চার. আধুনিক ফারসী সাহিত্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এর গতি প্রবাহ চলমান।'[২২]

ফারসি সাহিত্যের যুগগুলোকে সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।[২৩]

'মুহাম্মদ তাকী বাহার সর্বপ্রথম ফার্সী গদ্য সাহিত্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। প্রথম হলো সামানী রাজত্বের সূচনাকাল থেকে অর্থাৎ হিজরী চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধ (খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ) থেকে শুরু হয় এবং তা পঞ্চম হিজরী শতকের শেষার্ধ (খ্রিস্টীয় একাদশ শতক) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় যুগ হিজরী ষষ্ঠ শতক (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম দিক) থেকে শুরু করে হিজরী অষ্টম শতক তথা খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ধরা হয়। তৃতীয় যুগ হলো হিজরী অষ্টম শতক (খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক) থেকে শুরু করে হিজরী ত্রয়োদশ শতক (খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতক) পর্যন্ত। চতুর্থ যুগ হলো সাহিত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ যা হিজরী দ্বাদশ শতক

(খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) থেকে শুরু করে হিজরী চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তথা খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়।'[২৪]

উপরে উল্লেখিত চারটি যুগ ছাড়াও যদি বর্তমান কালকে এর সাথে যুক্ত করি তবে ফার্সী সাহিত্যে দারী (প্রাচীন ফার্সী ভাষা) সাহিত্য সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মোট পাঁচটি যুগ অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[২৫] 'পঞ্চম যুগ সমকালীন সাহিত্য বা নবযুগ হিজরী চতুর্দশ শতক (খ্রিস্টীয় বিংশ শতক) থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত। সাহিত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার নীতিমালার বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় নিয়ে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনা হয়েছিল। এ যুগটি কাজার সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ও সমকালীন যুগের শুরু এবং মাশরুতে তথা সাংবিধানিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক প্রকারের সাহিত্যের পুনরুত্থান হয়েছে যা গত ৭০ বছর সময়কার সাহিত্যকে নির্দেশ করে।'[২৬]

'ফারসি সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। এসে তা পূর্ণ মাত্রায় বিকোশিত হয়।[২৭] উনিশ শতকের দিকে ইরানে নবজাগরণের সূচনার সময়টা ছিল কাচার সম্রাট নাসিরউদ্দিন শাহ্ (১৮৪৮-১৮৯৬ খিস্টাব্দ)। এসময়ে নাসিরউদ্দিনের উদারনীতির কারণে ইরানের জনগণ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসার ব্যাপক সুযোগ পান।'[২৮]

'১৮৫৮ সালে ৪২ জন ছাত্রকে ইউরোপে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। ... ১৮৫২ সালে নাসিরুউদ্দিন শাহ্ 'দারুল ফুনান' (বিজ্ঞানঘর) স্থাপন করেন। সেখানে ছাত্রদের সামরিক বিজ্ঞান, ইংরেজি, ফরাসি ও রুশ ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। পারস্যে এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটাই ছিল সর্বপ্রথম। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত পারস্যের যুবকরা পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং আধুনিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়।'[২৯]

১৯৭৯ সালে সংঘটিত ইরানের ইসলামি বিপ্লব ইরানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অঙ্গনসহ সর্বস্তরে আমূল পরিবর্তন সাধন করে।[৩০] আর সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এ ধারাবহিকতায় ইরানের সাহিত্য অঙ্গনেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সমকালীন সাহিত্যে সামাজিক বিবর্তনের আলোকে আমরা আইন, স্বাধীনতা, সমতা, উন্নয়ন, সভ্যতা, জ্ঞান, শিল্প, উপনিবেশবাদের ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জুলুম ও ক্ষমতা প্রতিরোধ, দেশপ্রেম, বিপ্লব, শাহাদাত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ের মুখোমুখি হই।[৩১]

ফারসি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণ

ফারসি সাহিত্য অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ সাহিত্য। মূলত ফারসি সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাত্মবাদী কবি আবু সাইদ আবিল খায়ের, সানাই গাঞ্জুবি, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি, ফরিদুদ্দিন আত্তার, হাফিজ শিরাজি এবং আল্লামা আবদুর রহমান জামির রচিত আধ্যাত্মিক সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়েই ফারসি সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উচ্চারিত হয়। কেননা, তাঁদের রচিত সাহিত্যকমের্র মধ্য দিয়েই ফারসি সাহিত্য বিশ্বদরবারে সর্বোচ্চ স্তরের পরিচিতি ও সমাদৃত হওয়ারগৌরব অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক রোবাঈ, মাসনাভী, গাযাল, ইত্যাদিই প্রধান যা ফারসি সাহিত্যের বিশেষ ও প্রধান সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখিত হয়। এগুলো ছাড়াও ফারসি সাহিত্যে আরো অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বৈশিষ্ট্যেও রয়েছে। যেমন- কাসিদা, মাসনাভী, রোবাঈ, গাযাল, দোবেইতী, মুসাম্মাত, কেতয়া (খণ্ড কবিতা), তারজীবান্দ, তারকীববান্দ, মুস্তাযাদ প্রভৃতি।[৩২]

'এছাড়াও ফারসি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও অন্তর্গত উপাদানসমূহ এবং পারিভাষিক অর্থে ফারসি সাহিত্যের মধ্যে আরো চারটি প্রধান সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন- বীরত্বব্যঞ্জক, গীতিধর্মী, শিক্ষামূলক ও নাট্যধর্মী- যা সাধারণত মুসলিম মনীষীদের সাহিত্যকলা বিষয়ক রচনাবলীতে দেখা যায়।'[৩৩]

এ পর্যায়ে ফারসি সাহিত্যের 'সাহিত্য বৈশিষ্ট্যাবলি ও প্রকরণ' সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

ক) হামাসে বা বীরত্বগাথা

সাধারণত সাহসিকতা ও বীরত্বমূলক রচনাকেই হামাসে বা বীরত্বগাথা বলা হয়ে থাকে এবং এটি ফারসি সাহিত্যের অন্যান্য সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ও অগ্রগণ্য। বীরত্বগাথা অতি প্রাচীন সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনাবলির বিবরণ প্রাধান্য পায়। বীরত্বগাথায় প্রত্যেক জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে থাকে।[৩৪] যে সময়টিতে উতিহাস, রূপকথা, কল্পনা ও বাস্তবতা একাকার হয়ে যায়, তখন বীরত্বগাথার কবিই হন জাতির ইতিহাস-রচয়িতা।[৩৫] প্রাচীনতার দিক থেকে ফারসি সাহিত্যের এ বীরত্বগাথামূলক সাহিত্য বৈশিষ্ট্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সনাতন বীরত্বগাথা

সনাতন বীরত্বগাথা মৌলিক বীরত্বগাথা এবং একে প্রথম পর্যায়ের ও মৌখিক বীরত্বগাথাও বলা হয়ে থাকে। আবু মানসূরীর গদ্যে লেখা শাহনামা, আসাদীর গারশাসাবনামা, ফেরদৌসির বাহমাননামা, বরযূনামা ও শাহনামা এ ধরনের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত।

২. সাহিত্যিক বীরত্বগাথা

প্রাচীনতার ভিত্তিতে রচিত এ জাতীয় বীরত্বগাথায় কবি একটি বিষয়ের সৃষ্টি করেন। যেমন-প্যারাডাইস লস্ট (জন মিল্টন)।

৩. পরবর্তীকালের বীরত্বগাথা

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের বীরত্বগাথার ওপর ভিত্তি করে রচিত এসব বীরত্বগাথা ফারসি সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ বীরত্বগাথা হিসেবে সমাদৃত। যেমন-রুস্তমের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে সরল গদ্যে রচিত সাধারণ গল্প-কাহিনী সম্ভার।[৩৬] বীরত্বগাথার আরো একটি বৈশিষ্ট্যও রয়েছে- তা হচ্ছে 'জাতীয় ও স্বাভাবিক' বীরত্বগাথা এবং রূপক বীরত্বগাথা।[৩৭]

বিষয়বস্তুর আলোকে বীরত্বগাথাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীকরণ করা যায়:

১. রূপকথার বীরত্বগাথা

ফার্সী সাহিত্যে 'শাহনামে'-এর প্রথম ভাগে ফারীদূন-এর কাহিনী হতে 'আয়াতাকার যারীরান' এর কাহিনী পর্যন্ত এই প্রকরণের অন্তর্ভূক্ত।[৩৮] যা বীরত্বগাথার পুরাতন বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণের পর্যায়ভূক্ত।

২. বীরদের বীরত্বগাথা

যেমন- শাহনামায় রুস্তমের জীবনাল্লেখ্য, হামদুল্লাহ মুস্তোফীর যাফারনামা এবং সাহিত্যের প্রত্যাবর্তন অধ্যায়ে রচিত 'সাবা'-এর 'শাহানশাহনামে'।[৩৯] রূপকথার উপাদান বিদ্যমান থাকা এ ধরনের বীরত্বগাথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. ধর্মীয় বা মাযহাবী বীরত্বগাথা

যেমন 'ইবনে হিসাম'-এর 'খাভেরান নামে' ও 'সুরুশ'-এর 'উর্দিবেহেতশনামে'।[৪০]

৪. আধ্যাত্মিক বীরত্বগাথা

যা ফার্সী সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।[৪১] যেমন শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার-এর তাযকেরাতুল আউলিয়ায় মানসুর হাল্লাজের কাহিনী এবং তার মানতিকুত তায়ের।[৪২]

গবেষকগণ বীরত্বগাথার জন্য বিশের অধিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৩] তবে এসব বৈশিষ্ট্যকে চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়:[৪৪]

প্রথম প্রকারের বৈশিষ্ট্য,

'বীরত্ব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব এবং তাদের আচার-আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- দুশমন বাহিনীর বীরদের সাথে বীরত্বগাথার বীরদের লড়াই, দৈত্য দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ, দূর-দূরান্তের সফরে গমন, সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দেয়া আর বিরাট অজগর সাপকে বধ করা প্রভৃতি। ..... কেননা, ইরানী বীরত্বগাথায় তারা সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়ে থাকে।

..... গল্পের চরিত্রসমূহ এবং তাদের আচার-আচরণের সংঘাত বীরত্বগাথাকে বিয়েগান্ত (Tragedy) ঘটনায় পরিণত করেছে। যেমন- রুস্তম- সোহরাব ও রুস্তম-ইসফান্দিয়ারের কাহিনী। আর বীরত্বগাথার বীরের মৃত্যু হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে।'[৪৫]

দ্বিতীয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য,

'দ্বিতীয় প্রকারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সেসব বৈশিষ্ট্য যেগুলো বীরত্বগাথার স্থান ও কালের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণভাবে বীরত্বগাথাগুলো স্থানিক ও কালিক সংশয়ে আবিষ্ট থাকে। তাতে কখনো ভৌগোলিক স্থানের নামোল্লেখ করা হয়, কিন্তু আমরা স্থানটি কোথায় তা জানতে অপারগ। যেমন-তুরান, সামানগান, মাযান্দারান প্রভৃতি।'[৪৬]

তৃতীয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য,

যেমন-জামশীদের রূপকথার গল্প।[৪৭]

'যা বীরত্বগাথায় জাদুকরি অবস্থার অধিকারী আর তা হচ্ছে বীর ও তার প্রতিপক্ষের মাঝে মল্লযুদ্ধ। জন্তু-জানোয়ার ও দৈত্যদের আচরণ, ভয়ঙ্কর জন্তুগুলোকে বধ করা, দেহ রূপার মতো কঠিন হওয়া, ঈশ্বরের সাথে কথা বলা, দুই বীরের রণহুংকার, যেগুলো সাধারণত অলৌকিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত এবং যা বিস্ময় বিহব্বলতা সৃষ্টি করে থাকে। এতে মূলত বীরত্বগাথার যুক্তি বিন্যাসেরই অনুসরণ করা হয়।

ইরানী বীরত্বগাথাসমূহের সূচনা ও এগুলোর পূর্ণতা ঘটেছে আর্যদের আগমনের সূচনা ও আর্য জাতির দেশত্যাগ করে ইরানে আসা এবং এ দেশে তাদের বসতি স্থাপনের পূর্ব সময়ে। আর্য জাতি যখন ইরান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তখন তাদের রূপকথাগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসে। .... এ হিসাবে ইরানের জাতীয় বীরত্বগাথার সূচনা হয়েছে ইরানে আর্যদের দেশত্যাগ করে আসার পূর্বেই। তবে ইরানে প্রবেশ করার পর নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়ে আরো বেশি পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও সম্প্রসারিত হয়েছে।'[৪৮]

আর, সাসানী আমলের শেষভাগে এসে তা পুরো মাত্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে।[৪৯] ক্রমবিকাশের দিক থেকে ইরানি বীরত্বগাথাগুলোকে তিনটি যুগের স্তরে ভাগ করা যায়।[৫০]

প্রথম যুগঃ

এই যুগের ব্যাপ্তি, হিজরী তৃতীয় শতকের শেষভাগ হতে ষষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত।[৫১] এই যুগের ইরানি বীরত্বগাথার উদাহরণ হিসেবে আবূ মানসুরীর গদ্যে রচিত *শাহনামা* এবং আবুল কাসেম ফেরদৌসীর *শাহনামা*র নাম উল্লেখ করা যায়।

দ্বিতীয় যুগঃ

এ যুগের বীরত্বগাথাগুলো মূলত ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কেননা, এ শতকে জাতীয় বীরত্বগাথার ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হত। হিজরী ষষ্ঠ শতক থেকে এ অধ্যায়ের সূচনা।[৫২] এ যুগের বীরত্বগাথার কেন্দ্রগত বিষয় হলো মূলত, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও বীরগণ যারা জাতীয় বীরত্বগাথার স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমন-নেযামীর *ইস্কান্দারনামা*, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ পায়ীযী নাসাভীর *শাহেনশাহনামা*।[৫৩]

তৃতীয় যুগঃ

'তৃতীয় যুগ হচ্ছে, নবম শতকের শেষ ভাগ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত। শেষোক্ত শ্রেণীর বীরত্বগাথাগুলো সাধারণত রূপক বীরত্বগাথায়রূপে চিত্রিত হয় এবং তার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে, আব্দদুল্লাহ হাতেফী (মৃত্যু ৯২৭ হিজরী) রচিত 'শাহেনশাহনামেয়ে হযরত ইসমাঈল', হিজরী দশম শতকের কবি কাসেম গুনাবাদীর শাহনামা।'[৫৪]

এই যুগে ইতিহাসনির্ভর বীরত্বগাথা ছাড়াও ধর্মীয় বীরত্বগাথার প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয়।[৫৫] অবশ্য ফার্সী কবিতায় তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতা প্রবেশ করার পর আধ্যাত্মিক বীরত্বগাথা এবং ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা সমভাবে বিকাশ লাভ করে।[৫৬]

ইরান তথা ফারসি সাহিত্যের বীরত্বগাথার শ্রেষ্ঠতম কবিতাসমূহের মধ্যে যেসব কবিতার নাম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সেগুলো হলো-

রূপকথার বীরত্বগাথাঃ

যেমন-আভেস্তার মেহেরীয়াশত, যামিয়াদিশত, পাহলভী ভাষায় রচিত আয়াতকার যারীরা'ন, কারনা'মেয়ে আর্দেশির বাবকান, ফেরদৌসির শাহনামার প্রথম ভাগ, আসাদী তুসীর গারশাসাবনামে, আবুল মুয়াইয়্যেদ বালখী ও আবু মানসুরীর শাহনামা।[৫৭]

বীরত্বব্যঞ্জক গাথাসমূহঃ

যেমন-ফেরদৌসির শাহনামার দ্বিতীয় ভাগ রুস্তমের মৃত্যু পর্যন্ত সামাক আইয়ার ও হুসাইন কুদ শাবেস্তারীর কাহিনী।[৫৮]

ইতিহাসনির্ভর বীরত্বগাথাঃ

যেমন-হামদুল্লাহ মুস্তোফীর যাফারনামা, সাবার শাহেনশাহনামা।[৫৯] এসব বীরত্বগাথা রচয়িতা কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ফেরদৌসি ও আসাদী তুসী।[৬০]

খ) গীতিসাহিত্য

গীতিসাহিত্য সে সব রচনা ও কবিতাকে বলা হয় যেগুলো ব্যক্তিগত ও নিজস্ব অনুভূতি ও সংবেদনশীলতা প্রকাশ করে; যেমন- সুখানুভূতি, বেদনা, আনন্দ প্রভৃতি।[৬১] কারণ, রূপকল্পের জন্ম হয় মূলত অনুভূতি হতে।[৬২] কবিতার এই ধরনটি তার বিবর্তনের ধারায় আধ্যাত্মিক কবিতারও রূপ পরিগ্রহ করেছে।[৬৩] অবশ্য সেই প্রাচীনকাল থেকেই ইরানী সাহিত্যিকরা গযলে বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর অবতারণা করতেন; যেমন- প্রশংসা, কুৎসা, গৌরবগাথা, শপথ, অভিযোগ, মরমী-আধ্যাত্মিকতা, জীবনের প্রতি উৎকণ্ঠা, শরাবনামা (খামরিয়ে), যিন্দাননামা (হাবাসিয়ে), দুস্তীনামা (ইখওয়ানিয়াত), লাগয, ধাঁধা, অর্থহীন কবিতা, ইতিহাস, বিতর্ক, পারস্পারিক গর্ব, প্রকৃতির পরিচয় বর্ণনা, শহর পরিচিতি, অশ্ব, উট প্রভৃতি বিনোদনমূলক কবিতা।[৬৪]

ফারসি কবিতায় ব্যবহৃত এসব বিষয় ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও ধরনে প্রচলিত ও পরিচিত। যেমন- রোবাঈ (চতুষ্পদী), 'কেতয়া', দু'বেইতী (চার-পঙক্তি বিশিষ্ট), কাসিদা, গযল, তারজীবান্দ, তারকীববান্দ, মুসাম্মাত, মুস্তাযাদ, মাসনাভী প্রভৃতি হচ্ছে গীতি কবিতার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো ও ছক।[৬৫] উল্লিখিত সকল বিষয়েই

কবিতার রুচি ও চরিত্রগত তারতম্য থাকে।[৬৬] এ কাজটি যখন বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন কাব্যিক বর্ণনার উৎপত্তি ঘটে।[৬৭]

'এই বর্ণনা যখন নিজের বা নিজের গোষ্ঠী ও গোত্রের গৌরব বর্ণনামূলক হয় তখন গৌরবগাথার সৃষ্টি হয়। বর্ণনা যদি আশেক ও মাশুকের (প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ) মধ্যকার অবস্থাদির বিবরণমূলক হয় তাহলে 'গাযাল' (গযল) আর যদি কোনো হারানো প্রিয়জন সম্পর্কিত বর্ণনা হয় তখন 'মারসিয়ে' বা রাসা (শোকগাথা) বলা হয়। বর্ণনাকে যখন প্রশংসাকীর্তন ও তোষামোদে রূপান্তরিত করা হয় তখন মাদ্হ (প্রশস্তি) আর যদি কারো প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও তিরস্কারমূলক হয় হাজভ ও হেজা (ব্যঙ্গ কবিতা) বলা হয়। ফার্সী সাহিত্যে উল্লিখিত ধরন ও বিষয়গুলোর মধ্যে প্রশংসা, গযল, বন্দিত্ব-গাথা, শোকগাথা চটুল, ব্যঙ্গাত্মক, শরাব-গীতি ও সাকীনামা অধিকতর আলোচিত।'[৬৮]

ফার্সী গীতি সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যসমূহকে **১১**টি প্রকরণে বিন্যস্ত করা যায়।[৬৯] যথা:

রোবাঈ (চতুষ্পদী),

দোবেইতী (চার ছত্র বিশিষ্ট)

কাসিদা,

গাযাল

মাসনাভী (দ্বিপদী),

তারকীববান্দ,

তারজীবান্দ,

কেতয়া',

মুসাম্মাত,

মুফরাদ

এবং

মুস্তাযাদ।

রোবাঈ (চতুষ্পদী)

'চার চরণ বিশিষ্ট ও দুই শ্লোকের কবিতাকে রুবাই বলা হয়, যা একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ধরনের কবিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের একই অন্ত্যমিল থাকা আবশ্যক। কখনো কখনো চারটি চরণই একই অন্ত্যমিলের হয়ে থাকে।'[৭০]

পরিভাষায় রোবাঈ বলা হয় সে কবিতাকে যার চারটি অংশ, পঙক্তি থাকে।[৭১] কখনো কখনো প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনায় একে 'দোবেইতী' বলেও আখ্যায়িত করা হয়।[৭২] রূবাঈ কবিতায় অন্ত্যমিলের পরিকল্পনাটি হচ্ছে প্রথম শ্লোকের অনুকৃতি এবং শেষ পঙক্তিতে প্রথম পঙক্তির অন্ত্যমিলের পুনরাবৃত্তি; রোবাঈ কবিতার অন্ত্যমিল ছকটি নিম্নরূপ:[৭৩]

১। .....ক ২। .....ক

৩। .....ক/খ ৪। .....ক

রোবাঈতে যদি তৃতীয় পঙক্তি অন্ত্যমিলযুক্ত হয়, সে রোবাঈকে 'মুসার্‌রা' এবং তৃতীয় লাইন অন্ত্যমিলযুক্ত না হলে তাকে 'খাসী' বলা হয়।[৭৪] 'রোবাঈ' এমন এক কবিতা যার ছন্দ লোকগীতির অন্তর্ভূক্ত।[৭৫] ফরাসি পণ্ডিত গিলবার্ট ল্যাযার রোবাঈ ছন্দের উৎপত্তি ইরানী তারানার সঙ্গীতের মধ্যে নিহিত বলে মনে করেন।[৭৬]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ফারসি সাহিত্যে তিন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রোবাঈ দেখা যায়।[৭৭] যেমন:

১. প্রেমধর্মী রোবাঈ বা প্রাচীন রোবাঈ,

২. মরমী রোবাঈ

এবং

৩.দর্শননির্ভর রোবাঈ।

১.প্রেমধর্মী রোবাঈ বা প্রাচীন রোবাঈ

প্রাচ্য, খোরাসান ও আযারবাইযান এলাকায় প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের কবিদের এ ধরনের রোবাঈ আছে। যেমন-কবি রূদাকী, ফাররুখী, মানুচেহরী, মুইযযী প্রমুখ।[৭৮]

২. মরমী রোবাঈ

মরমী রোবাঈকে আধ্যাত্মিক রোবাঈও বলা হয়ে থাকে। ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিক রোবাঈ'র অধ্যায় আবু সাঈদ আবুল খায়েরের হাত দিয়েই সূচিত হয়; যা ফরিদুদ্দিন আত্তার থেকে মাওলানা রুমি পর্যন্ত পৌঁছে এবং এ দু'জনের

মাধ্যমেই ফারসি সাহিত্যে মরমী রোবাঈ তথা আধ্যাত্মিক রোবাঈ উৎকর্ষতার চরম শিখরে পৌঁছে। আর এর ফলেই ফারসি কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়।

তবে একথা বলা যায় যে,

'অধিকাংশ ইরানী সুফী রোবাঈ রচনার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তন্মধ্যে আবু সাঈদ আবুল খায়েরের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা, তিনি মরমী রোবাঈ রচনা করেন, এমন কি সানায়ীর পূর্বেই আরেফদেরকে ফার্সী কবিতার আঙ্গিনায় উপনীত করেন। ফার্সী সাহিত্যে রোবাঈ লেখক সুফীদের মধ্যে রয়েছেন, চতুর্থ হিজরী শতকে (১০০০ খ্রি.) আবুল আব্বাস কাসসাব আমুলী, হিজরী পঞ্চম শতকে আবুল হাসান খারাকানী, খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী, মুহাম্মাদ গাযযালী, ষষ্ঠ শতকে আহমাদ গাযযালী, আইনুল কুযাত, আহমাদ জাম, আবুল ফযল মেইবুদী, রূযবিহান বাকলী শিরাযী, মজদুদ্দীন বাগদাদী, হিজরী সপ্তম শতকে নজমদ্দীন কুবরা, আওহাদুদ্দীন কেরমানী, নাজমুদ্দীন রাযী ও সাইফুদ্দীন বাখারযী।'[৭৯]

দার্শনিক রোবাঈ

ফারসি সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো দার্শনিক রোবাঈ। ওমর খাইয়ামের মাধ্যমে দার্শনিক রোবাঈ ফারসি সাহিত্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ফারসি দার্শনিক রোবাঈ কাঠামোর সর্বাধিক আলোচিত কবি হলেন ওমর খাইয়াম।[৮০] ফারসি সাহিত্যে রোবাঈ শব্দটি উচ্চারিত হলে ওমর খাইয়াম নামটি যেন সহজাতভাবেই উচ্চারিত হওয়া সমীচীন বলেই মনে হয়। এজন্য, 'রোবাঈয়াতে ওমর খাইয়াম' সমস্বরে উচ্চারিত না হলে যেন শব্দ দুটি পূর্ণতা পায় না।

'নিঃসন্দেহে সাহিত্যের ইতিহাসে খাইয়ামের গুরুত্ব তার বিখ্যাত রোবাঈয়াতের কারণেই। অনুরূপভাবে পশ্চিমা জগতে তার যে খ্যাতি এবং তাঁকে যে বিশ্বের অবিসংবাদিত কবি হিসাবে উপস্থাপন করা হয় তাও এই রোবাঈয়াতের বদৌলতেই। পাশ্চাত্যে এই খ্যাতির ক্ষেত্রে অন্য কোনো ফার্সী কবি তাঁর কাছেও পৌঁছতে পারে নি। খাইয়ামের রোবাঈয়াতে আমরা অতি সহজ-সরল এবং কোনোরূপ কৃত্রিমতা ও শব্দকল্পের মারপ্যাঁচবিহীন ভাষা, বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাই। তাঁর রোবাঈয়াতের বাক্যবিন্যসে যে সাবলীলতা ও সাহিত্য অলংকারের বিশুদ্ধতা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা নজিরবিহীন। তিনি যেসব পরিভাষা নির্বাচন করেছেন তা তাঁর কবিতাগুলোকে ঐশ্বর্য দান করেছে। এর দৃষ্টান্ত ও তুলনা আমরা পরবর্তী যুগে সা'দী ও হাফেযের কবিতায় দেখতে পাই।'[৮১]

তবে তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট রোবাঈগুলোর মধ্যে ৬৬টি রোবাঈয়ের নির্ভুল হওয়া প্রশ্নাতীত।[৮২] তাঁর কবিতার মূল সুর হচ্ছে, মানুষের শুরু ও শেষ সম্পর্কে ক্রন্দন ও অনুযোগ; যেমন:

"যে কালচক্রে আমাদের আগমন ও নির্গমন

তার শুরু ও অন্ত জানা নেই কারো

কেউ মুখ খোলে না এ ব্যাপারে, বলে না সঠিক কথা

কোত্থেকে এই আসা বা যাওয়াটা কোথায়?"[৮৩]

তাঁর আগে যাকারিয়া আল রাযী ও আবুল আলা মুয়ে'রী জগতের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।[৮৪] প্রকৃতপক্ষে এগুলো সৃষ্টির রহস্য ও অস্তিত্ব জগতের জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে অনন্ত জিজ্ঞাসার প্রতিফলন-যা মূলত একজন দার্শকের মনন ও মস্তিষ্ক হতে উদ্ভূত হয়।[৮৫] তাঁর কবিতায় ভোগ-বিলাসিতা এবং এই জগতের সুখ সম্ভোগের প্রতি সুযোগ-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি পরিদৃষ্ট হয়-যা নিঃসন্দেহে ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস-এর ন্যায় গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৮৬]

এই রোবাঈটিতে খাইয়ামের উক্ত চিন্তা দর্শনই পরিস্ফুটিত হয়েছে:

"ওঠো, চলমান জগৎ নিয়ে দুঃখ কর না,

প্রফুল্ল থাক, একটি মুহূর্ত কাটাও আনন্দের মাঝে

জগতের স্বভাবে যদি থাকত কোনো বিশস্ততা

তোমার কাছে আসত না পালা অন্যদের কাছ থেকে।"[৮৭]

মূলত, খাইয়ামের চিন্তা-দর্শনের প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে যে সব বিষয় উল্লেখ করা যায় তন্মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, জীবনের ব্যথা-বেদনা, আদিকাল, কালচক্র, ঘূর্ণায়মান অণুপরমাণু, প্রতিটি মুহূর্তকে সুবর্ণ সুযোগ ভাবা ও জগতকে তুচ্ছ ও অমূলক জ্ঞান করা।[৮৮]

দোবেইতী

বৈশিষ্ট্য ও অন্ত্যমিলের দিক থেকে দোবেইতী বা তারানা রোবাঈর শ্রেণীভূক্ত বলেই মনে করা হয়। তার বাহ্যিক কাঠামো চারটি পঙক্তি নিয়ে গঠিত।[৮৯] তবে, ইসলামি সভ্যতার যুগে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং ছন্দরীতির রূপ পরিগ্রহ করে।[৯০] ডক্টর খানলারী ফার্সী কবিতার ছন্দরীতি সম্পর্কিত তাঁর ভাষণে 'শেরে ফার্সী' গ্রন্থে দোবেইতীর আরূযী ও ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়টিকে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন।[৯১] তিনি মনে করেন যে, দীর্ঘ ও হ্রস্ব ধ্বনিসমূহের ওপর জোর দেয়া ও প্রলম্বিত করা এবং পঙক্তিগুলোর ধ্বনি সমষ্টিগুলোর মাঝে

সমতা না থাকা দোবেইতীর ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে।[৯২] দোবেইতী ফারসি সাহিত্য তথা ইরানের ঐতিহ্যবাহী কাব্যরীতির ধারক ও এর স্মৃতিবাহী। আর এজন্যই, দোবেইতী তার ঐতিহাসিক গতিধারায় জনগণের মাঝে বিস্তার লাভ করা ছাড়াও সীমিত সংখ্যক কবির রচনাবলীতেও স্থান পেয়েছে।[৯৩]

'ফার্সী সাহিত্যের দোবেইতী রচয়িতা শ্রেষ্ঠ কবি বাবা তাহেরের আবির্ভাব ঘটে পঞ্চম। তিনি হিজরী পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি এবং তোগরোল সালজুকীর সমসাময়িক। বাবা তাহেরের রচিত আরবীতে কতক ছোট ছোট বাক্য বর্তমান আছে- যা তার এরফানী আকিদা ও দর্শনের পরিচয় বহন করে। এই বাক্য সমষ্টির অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যিকির, মারেফাত, উন্মত্ততা, ভালোবাসা প্রভৃতি। তবে তাঁর তারানাসমষ্টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সুন্দও অন্তরঙ্গ ভাষায় অভিনব সংবেতনশীলতা ও প্রেমাসক্তিতে পরিপূর্ণ কবিতা সমগ্র। .....বাবা তাহেরের দোবেইতীসমূহের বিষয়বস্তু নেহায়েত সীমিত। এর কিছুসংখ্যক প্রেমাসক্তিমূলক আর কতিপয় আধ্যাত্মিক প্রেম সম্পর্কিত। তাঁর দোবেইতী কবিতার মধ্যে কতক আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সরল কবিতা। তাঁর অবশিষ্ট দোবেইতী তার ব্যক্তিগত ও নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি-যা মনে হয় কোনো দরবেশের জীবন পদ্ধতিরই বর্ণনা।'[৯৪]

বাবা তাহেরের দোবেইতীর একটি উদাহরণ হলো-

"আমি সেই রেন্দ, নাম আমার কালান্দার

আমার না আছে ঘরবাড়ি, না কোনো ঠিকানা

দিবসে ঘুরি তোমার অলি-গলিতে

রাত এলে মাথা রাখি ইটের বালিশে।"[৯৫]

সমকালীন গবেষকদের মধ্যে একজন তাঁর দোবেইতীসমূহের বিষয়াবলীকে সংবলিত করেছেন।[৯৬] তিনি বাবা তাহেরের দোবেইতীসমুহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সব বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির প্রতি আসক্তি, আত্মপরিচিতি, আল্লাহর দর্শন, প্রেমাসক্তি, প্রেমাস্পদের বর্ণনা, উন্মত্ততা, দিশেহারা অবস্থা, ক্রন্দন, আহাজারি, জ্বলন-দহন, আর্তনাদ, ক্রোধান্বিত হওয়া এবং মৃত্যুচিন্তা।[৯৭]

কাসিদা

এমন সব কবিতাকে কাসিদা বলা হয় যার মাধ্যমে কেনো ব্যক্তি বিশেষ বা রাজা-বাদশাহর গুণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে।[৯৮] ড. আহমাদ তামীমদারী বলেন, ফার্সী পরিভাষায় এমন কবিতাকে কাসিদা বলা হয় যাতে বিশেষ উদ্দেশ্য

থাকে। বলা হয়েছে যে, সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত প্রশংসা স্তুতি।[৯৯] ফার্সী সাহিত্যে ইসলামের আগমনের পর সম্ভবত আরবদের কবিতার অনুকরণেই এর প্রচলন ঘটেছে, হয়ত এটিই ফার্সী কবিতার প্রথম ধরন।[১০০] কাসিদার বিষয়বস্তু যদি প্রশংসা হয়, তাহলে একে বলা হয় 'মাদহিয়ে' এবং অভিযোগ অনুযোগ থাকলে 'শেকওয়ায়িয়ে' আর কারগার সম্পর্কিত বর্ণনা থাকলে বলা হয় 'হাবসিয়ে' বা 'কারাবাসী'।[১০১] প্রশংসা, উপদেশ, হেকমত, অভিনন্দন, শোকবার্তা, অভিযোগ, গুণবর্ণনা, বিজয়গাথা ও মত্ততা প্রভৃতি এর প্রচলিত বিষয়বস্তু।[১০২] আল-মু-জাম-এর বর্ণনা অনুযায়ী যদি কোনো কাসিদায় মাতলা বা কলির পুনরাবৃত্তি না করা হয় তাহলে তা 'কেত্য়া' হিসাবে বিবেচিত হবে।[১০৩] কাসিদার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মাতলা বা কাব্যকলির নবায়ন; এটি ফার্সী কাসিদার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।[১০৪] আর, বীরত্বগাথা হচ্ছে কাসিদার কাঠামোর গভীরতা।[১০৫] কাসিদা একসময় অধিকাংশ সাহিত্যাঙ্গনের প্রধান কাব্য কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু কালের আবর্তন ও পরিক্রমায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যরীতির নানাবিধ প্রকরণজনিত কারণে তা ক্রমান্বয়ে গযলে রূপান্তরিত হয়ে ব্যাপকভাবে গযলে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়।

'কাসিদা তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় সপ্তম হিজরীর সূচনা পর্যন্ত পুরোদমে চালু ছিল। কিন্তু কাসিদা লেখক মহান কবিদের স্বর্ণযুগ ছিল হিজরী চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক। শেখ সা'দীই সর্বশেষ কবি-যিনি পূর্ণ দক্ষতার সাথে কাসিদা রচনা করেন। তার কাসিদা প্রশংসার স্থলে উপদেশের দিকে ধাবিত হয়।' প্রশংসিতকে তিনি এভাবে উপদেশ দেন:[১০৬]

"এই পান্থশালায় পালার অপেক্ষায় রাজা-বাদশাহরা

এখন যে তোমার পালা-হে বাদশা! ব্রতী হও ন্যায় বিচারে।"

গযলকাব্য

গযল অর্থ পারিভাষিক অর্থে গীতিকবিতা।[১০৭] আরবী ভাষায় 'গাযাল' মানে নারীদের সাথে কথা বলা, প্রেম নিবেদন করা, যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করা এবং নারীদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের রূপগুণের বর্ণনা।[১০৮] গযলের বিষয়বস্তু হচ্ছে সাধারণত প্রেমাস্পদের রূপ ও সৌন্দর্য, তার প্রতি অবহেলা, আনাদর, কথা না রাখা, নির্দয়তার বর্ণনা এবং প্রেমিকের বিরহ-বিচ্ছেদ-যাতনা ও দুঃখের বিবরণ।[১০৯] এ ধরনের কবিতার পূর্ণাঙ্গ নমুনা হচ্ছে শেখ সা'দী[১১০] ও হাফেয শিরাযীর[১১১] গযল।[১১২] ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে ষষ্ঠ শতক গযলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেননা, 'ষষ্ঠ শতক হচ্ছে ফার্সী সাহিত্যে গযলের স্বর্ণযুগ। সাহিত্যাঙ্গনে এর ব্যাপক বিস্তৃতি, কাসিদার প্রতি অনাদর ও তাসাউফের প্রচার-প্রসার প্রভৃতি কারণে গযলের উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটে-যার ফলে সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

গযল রচনাকারী কবিরা এই শতক ও পরবর্তী শতকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এ কারণে সনাতন ধর্মী প্রেমনির্ভর গযলের পাশাপাশি বিভিন্ন আঙ্গিকে নতুন ধরনের আধ্যাত্মিক গযল আমরা দেখতে পাই-যার চিন্তাগত বিষয়বস্তু ও ভাবধারা হচ্ছে তাসাউফ। এভাবেই প্রথম দিকের প্রেমনির্ভও গযলসমূহ সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে আধ্যাত্মিক গযলে পরিণত হয়। হিজরী ষষ্ঠ শতকে সানায়ীর মাধ্যমে শুরু হওয়া আধ্যাত্মিক গযল সপ্তম শতকে এর পূর্ণতার গতিধারায় আত্তারের পর মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর কাছে উপনীত হয়।'[১১৩]

মাসনাভী

'মসনবী দ্বিপদী বিশিষ্ট মোটামুটি দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য। যার প্রতিটি শ্লোকেরই ভিন্নতর অন্তমিল বিদ্যমান থাকে এবং ধ্বনি/মাত্রা একই হয়ে থাকে। এধরনের কবিতার বিষয়বস্তু কাহিনী, আধ্যাত্মবাদ বা চরিত্র বিষয়ক হয়ে থাকে।'[১১৪] ফার্সী সাহিত্যে কয়েকটি মাসনাভী কাব্য এমন আছে, যেগুলোকে সাহিত্যের অনবদ্য কীর্তি হিসাবে গণ্য করা যায়।[১১৫]

দুই পঙক্তি বিশিষ্ট কবিতাকে মাসনাভী বা মসনভি বলা হয়। মাসনাভী মানে দ্বিপদী কাব্য। যার প্রত্যেক লাইনের ছন্দমাত্রা সমান হয়ে থাকে। এর অপর নাম মুযদৌজ। ফার্সী কবিতার জন্মলগ্ন হতে মাসনাভী বিদ্যমান রয়েছে। মাসনাভী বা দ্বিপদী কাব্যের কবিতার অন্ত্যমিলের ছকটি নিম্নরূপ:[১১৬]

.....ক	.....ক
.....খ	.....খ
.....গ	.....গ

ফারসি সাহিত্যে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মসনভিগুলোর প্রকরণসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. মাসনাভীয়ে হামাসী (বীরত্বব্যঞ্জক দ্বিপদী কাব্য)

এই শ্রেণীর মাসনাভীর সূচনাা হয়েছে হিজরী চতুর্থ শতক হতে।[১১৭] ফেরদৌসির[১১৮] শাহনামার মাধ্যমে এটি উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। ফেরদৌসির শাহনামায় বীরত্বব্যঞ্জক দ্বিপদী কবিতার পাশাপাশি আছে ইতিহাসনির্ভর মাসনাভী। ইতিহাসনির্ভর ঘটনাবলির বর্ণনার কারণে মসনভি রীতির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কাব্যের মাধ্যমে ঘটনাবলি স্থায়িত্বদানের জন্য মসনবি পদ্ধতিটি একটি ভালো দিক।[১১৯] 'বিদ্যমান গল্প-কাহিনীর কারণে একে কাহিনীনির্ভর মাসনাভী নামেও আখ্যায়িত করা হয়। শাহনামা ব্যতীত গুশতাসাবনামা এবং গুরশাসাবনামা বীরত্বগাথারূপে গণ্য।'[১২০]

১. নৈতিক ও শিক্ষামূলক মাসনাভী

এই শ্রেণীর মাসনাভীতে কবি নৈতিক শিক্ষামূলক বিষয়াবলির আলোকে কবিতা রচনা করে থাকেন। কাহিনী চিত্রিত করার মাধ্যমে উপদেশ, নসহিত প্রদান এ শ্রেণীর মসনভির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শেখ সা'দীর বূস্তান এই প্রকারের মাসনাভী।[১২১] উদাহরণস্বরূপ:

কোন একদিন কুকুরের পায়ে কাঁটা ফুটল অস্থির হয়ে সে ক্ষতস্থানে চাটতে লাগল।
রাত তাঁর অতিবাহিত হল ব্যাথায়-তার কাছেই ছিল বুদ্ধিমত্তা ছোট্ট বাচ্চা।[১২২]

২. আধ্যাত্মিক মাসনাভী

আধ্যাত্মিক মসনভির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন হাকীম সানায়ি গাযনাভি।[১২৩] তাঁর হাত দিয়েই ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিক মসনভির ধারা সূচিত হয়। যদিও তাঁর উত্তরকালে অনেকেই এ ধারায় কবিতা ও কাব্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

হাকীম সানায়ী গাযনাভীর 'হাদীকাতুল হাকীকা' আত্তারের 'মানতিকুত তায়ের' সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক কাব্যগ্রন্থ। হাকীম সানায়ী গাযনাভীর 'হাদীকাতুল হাকীকা' একটি শিক্ষামূলক মাসনাভী হলেও এতে বিদ্যমান বিষয়বস্তু বিবেচনায় তাকে আধ্যাত্মিক মাসনাভী রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। আত্তারের 'মানতিকুত তায়ের' কাব্যগ্রন্থ 'হাদীকাতুল হাকীকা' পরবর্তী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক মসনভি।

'আত্তারের পর আধ্যাত্মিক মাসনাভী কাব্য তার পূর্ণতা লাভের গতিধারা অব্যাহত রাখে এবং এবং মাওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ বালখী একে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছান। তাঁর মাসনাভী এক অসাধারণ সাহিত্যকীর্তি-যার মূল বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিকতা। রুমির মসনভির একটি নমুনা হলো:[১২৪]

"শোনো এই বাঁশরী কিসের বর্ণনা দেয়

বিরহ-বিচ্ছেদের করুণ বেদনার সে অনুযোগ করে।"

৩. প্রেমমূলক মাসনাভী

মসনভি সনাতন কাহিনী কাব্যের একটি ধরন। অধিকাংশ ফার্সী মাসনাভী কাব্যের একটি অভিন্ন দিক হচ্ছে মাসনাভীর বিভিন্ন বিষয়ে কাহিনীর অবতারণা।[১২৫] বিষয়ের মধ্যে রয়েছে-প্রেম ভালবাসা, সুফি ভাব ধারা, ঘটনা, চরিত্র, ইত্যাদি। তবে, প্রেম বিষয়ক মসনভিতে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিষয়ক ঘটনার বর্ণনার প্রাধান্য থাকে। সুদীর্ঘ অতীত হতেই এধরনের মসনভি ফারসি সাহিত্যে বিদ্যমান। ষষ্ঠ শতকে ফার্সী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাহিনী কাব্য রচয়িতা হচ্ছেন নিযামী গাঞ্জাভী।[১২৬] সাবলীল, বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী ভাষারীতি তাঁর প্রেমমূলক মাসনাভীর অনন্য বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য কবিদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। আর এর মাধ্যমেই তিনি অনন্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। খোসরু-শিরীন, লাইলী-মজনু ও হাফত পেইকার তাঁর বিখ্যাত প্রেমের মাসনাভী কাব্য; তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত মাসনাভীর মধ্যে রয়েছে 'মাখযানুল আসরার' ও 'ইস্কান্দার নামে'।[১২৭] জামিও[১২৮] এ ধারার কয়েকটি প্রেমমূলক মসনভি রচনা করেন।

'জামী নবম শতকে নিযামীর পঞ্চ কাব্যের (খামসা) মোকাবিলায় হাফত আওরাঙ্গ নামে ৭টি মাসনাভী রচনা করেন। তাঁর ইউসুফ-জুলাইখা ও লাইলী-মাজনুন এ জাতীয় মাসনাভী। তবে জামী নিযামীর অনুকরণ করতে গিয়ে অধিকন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষামূলক মাসনাভীগুলোর প্রতিই অধিক আগ্রহী ছিলেন-প্রেমের মাসনাভীর প্রতি নয়। এমন কি পুরানো কাহিনী থেকে গৃহীত 'সালামান ও আবসাল' নামক মাসনাভীতেও তিনি আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের উপস্থাপনা করেছেন। তাঁর এ জাতীয় কয়েকটি মাসনাভী কাব্য হচ্ছে, 'সিলসিলাতুয যাহাব', 'তোহফাতুল আহরার', 'সাবহাতুল আহরার', 'খেরাদনামেয়ে এস্কান্দারী'।'[১২৯]

তারকীববান্দ

একই ছন্দ ও অন্ত্যমিলেরস্তবক পদ নিয়ে রচিত কবিতাকে তারকীববান্দ বলা হয়; যাতে প্রতি স্তবকের শেষে নতুন অন্ত্যমিলযুক্ত বেইতের (পংক্তি) অবতারণা হয়। এই বেইতকে বলা হয় 'ওয়াসেতুল আকদ' (জোড়ার বন্ধন)।[১৩০] তারকীববান্দের অন্ত্যমিলের ছক এরূপ:

..... ক ..... ক

.... ক

আবর্তক পঙ্‌ক্তি বা ওয়াসেতুল আকদ

....খ

.....গ .....গ

.....ঘ .....গ

.....ঘ .....ঘ

আবর্তক পঙ্‌ক্তি: ঘ ঘ[১৩১]

তারকীববান্দ রচনাকারী প্রখ্যাত কবিদের মধ্যে রয়েছেন-ফাররুখী সীসতানী, কাতরান তাবরীযী, জামালুদ্দীন ইসফাহানী, আব্দুর রায্‌যাক ইসফাহানী, ভাহশী বাফকী ও মালেকুশ্‌ শোয়ারায়ে বাহার প্রমুখ। তবে, এদের মধ্যে ফাররুখী সীসতানী সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। নিম্নে জামালুদ্দীন ইসফাহানী রচিত প্রসিদ্ধ তারকীববান্দ কবিতার একটি নমুনা পেশ করা হলো; যেটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে নিয়ে প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা:[১৩২]

"ওহে! তোমা পথ চলে গেছে সিদরাতুল মুনতাহা ছেড়ে

আরশের গম্বুজ তোমার আরামের বিশ্রামালয়।

উর্ধ্বলোকের নয় তলা বারান্দা তোমার বারান্দা

টুপির কিনারার ছোঁয়ায় ভেঙ্গে গেছে।

তোমার বাহনের পেছনে ছুটে জ্ঞানের কাফেলা

শরীয়াত তোমার আশ্রয়ে পায় নিরাপদ ঠিকানা।

তোমার সম্মানে নেন মহান প্রভু চাঁদনীর মতো

তোমার চেহারার শপথ।

যে আল্লাহ জ্ঞানের সমান্তরাল করেছেন প্রাণকে

তোমার নামকে রেখেছেন আপন নামের সমান্তরালে।"

তারজীবান্দ

তারকীববান্দ ও তারজীবান্দ সমশ্রেণীর কাঠামো ও ছক বিশিষ্ট কবিতা; যাতে মূলত আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও প্রেম বিষয়ক বক্তব্যের উল্লেখ থাকে। তবে প্রত্যেক স্তবকের শেষে একটি ছত্রের পুনরাবৃত্তি হয়। ফারসি সাহিত্যে তারজীবান্দ রচয়িতা কবিদের মধ্যে হাতেফে (দ্বাদশ শতক) সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। নিম্নে *দীভা'নে হা'তেফে এসফাহানী* থেকে নির্বাচিত তাঁর দু'টি স্তবকের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা হলো:[১৩৩]

"ওহে! তোমাতে উৎসর্গিত প্রাণ ও আত্মা উভয়ই,

ওহে! তোমার পথে নিবেদিত এটা ও ওটা সবই।

তোমার জন্য প্রাণ উৎসর্গিত, কারণ তুমিই প্রেমাস্পদ,

তোমাতে প্রাণ সমর্পিত, তুমিই যে প্রাণের মহা সম্পদ।

একই আছেন, তিনি ছাড়া নেই আর কেউ,

তিনি এক, নাই কোনো ইলাহ একমাত্র তিনিই

তোমার সাথে বন্ধন খুলব না হে বন্ধু,

যদি তরবারির আঘাতে পৃথক করা হয় দেহের প্রতিটি জোড়া।

সত্যিই আমাদের শত প্রাণ অতি তুচ্ছ

কারণ, একজনই আছেন, নেই তিনি ছাড়া আর কেউ

তিনি এক, নেই কোনো ইলাহ-একমাত্র তিনিই।"

কেতয়া' বা খণ্ড কবিতা

কেতয়া' এমন ধরনের কবিতাকে বলা হয়-যার প্রথম ছত্রের অন্ত্যমিল থাকে না; আর পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ২ ও সর্বোচ্চ ১৬।[১৩৪] তবে ফার্সী সাহিত্যে প্রচলিত অধিকাংশ কেতয়া'য় বেইতের সংখ্যা ২-১০ টি, যা প্রয়োজনের তাগিদে ৪৫টিতেও বর্ধিত হয়।[১৩৫] কেতয়া'র শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কর্তিত, টুকরা।[১৩৬] নৈতিক শিক্ষা, উপদেশ বা ব্যঙ্গ, শোক, প্রশস্তি, অভিনন্দন, সমবেদনা ইত্যাদি কেতয়া'র বিষয়বস্তু হিসেবে বহুল প্রচলিত। ফারসি সাহিত্যে কবিতার সূচনালগ্ন হতেই এ শ্রেণীর কবিতার ধরন পরিলক্ষিত হয়। যেসব কবির *দিওয়ান* রয়েছে তাতে কেত্এ অবশ্যই পাওয়া যাবে।[১৩৭] এ ধারার কবিদের মধ্যে রয়েছেন-রুদাকি, নাসের খসরু, সানায়ি, সা'দি, আনওয়ারি, হাফিজ শিরাজি, ইবন ইয়ামীন, জামি, কায়ানী, ইরাজ মীর্যা, ফাররুখী ইয়াযদী, মালিকুশ শুয়ারায়ে বাহার, পারভীন এ'তেসামি প্রমুখ। তবে এঁদের মধ্যে, সপ্তম ও অষ্টম শতকের খোরাসানের কবি ইবনে ইয়ামীন হচ্ছেন প্রসিদ্ধ কেতয়া' রচয়িতা; তাঁর বিখ্যাত কেতয়া'র মধ্যে রয়েছে:[১৩৮]

"দীন ও দুনিয়ার লাভ যদি চাও

উভয়ের মূল উপাদান তো সৎকর্ম

বেহেশেতের দরজার থাকে যদি কোনো চাবি

সে তো অধিক ক্ষমা আর কষ্ট কম দেয়া।"

মুসাম্মাত

কাসিদা ও মুসাম্মাত-এর কাঠামো ও ছন্দ অভিন্ন। একই অন্ত্যমিল (কাফিয়া) যুক্ত কয়েকটি ছত্রের সমষ্টিকে বলা হয় মুসাম্মাত। ফাররুখী সীসতানী, মানুচেহরী দামগানী, কাত্‌রান তাবরীযী, শেখ সা'দি, মাওলানা রুমি, শেখ বাহায়ী, কায়ানী, মালেকুশ শুয়ারায়ে বাহার এ ধারার কবিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

'ফার্সী কবিতায় বিখ্যাত মুসাম্মাতের মধ্যে রয়েছে মুসাম্মাতে তাযমীনী। এই ধরনের মুসাম্মাতের রেশতে বা কলিতে কবি সাধারণত অন্যান্য কবির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। মালেকুশ শুয়ারায়ে বাহার সা'দীর একটি গযলের একটি বেইত উদ্ধৃত করে তা অবলম্বনে এরূপ মুসাম্মাত রচনা করেন; যেমন:[১৩৯]

"সা'দী, তোমার মতো সুন্দর সুবচনের কে আছে কোথায়?
তোমার মিষ্ট মধুর কথার মত মিষ্টি ঝড়া খেজুর বৃক্ষ কোথায়।
তোমার বুস্তান গুলিস্তান সম বাগান আছে কি কোথাও?
আর কিছু না থাক, তোমার চিন্তা নিত্য সাক্ষী আছে অবশ্যই
এমন কথায় কান দেবে না, আমার যে বন্ধু আছে তুমি ছাড়া অন্য কেউ
অথবা রাতদিন কোনো কাজ আছে আমার, তোমার চিন্তা ছাড়া।"

মোফরাদ

মোফরাদ এক পঙ্‌ক্তির কবিতাকে বলা হয়।[১৪০] নৈতিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কবিতা রচনা করা হয়ে থাকে। শেখ সা'দি এ ধরনের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তাঁর কাব্যগ্রন্থের শেষভাগে এগুলো বিধৃত।[১৪১] অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিঠিপত্রেও এর ব্যবহার হয়েছে।[১৪২]

মোস্তাযা'দ

'মোস্তাযা'দ' বলতে ঐ ধরনের কবিতাকে বুঝায়-যাকে কবি ফার্সী কবিতার বিভিন্ন ধরনের শেষভাগে কেতয়া' বা খণ্ড কবিতা আকারে বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে উল্লেখ করে থাকেন। মনে হয় ফার্সী সাহিত্যে সর্বপ্রথম মুস্তাযাদ রচনা করেছেন মাসউদ সায়া'দ সালমান। তবে কারো করো মত হচ্ছে, তার আগে আবু সাঈদ আবিল খায়ের হিজরী পঞ্চম শতকে মোস্তাযাদ রচনা করেছিলেন।' যেমন:[১৪৩]

"বন্ধুর পয়গাম এল যে, সাজিয়ে নাও কাজ কাম
এটিই হলো শরীয়াত,

দিলের মায়া সামনে আনো, বাড়তি ঝামেলা সরিয়ে দাও

এটিই হলো তারিকাত।"

গ. শিক্ষামূলক সাহিত্য

শিক্ষামূলক সাহিত্য ফারসি সাহিত্যের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বৈশিষ্ট্য। এ শ্রেণীর সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈচিত্রময় বিষয়ের বিচিত্র সমাহারের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলির বর্ণনা এ শ্রেণীর সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফার্সী শিক্ষামূলক সাহিত্যের প্রধানত তিনটি বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে-কিছু নৈতিক, একাংশ ধর্ম আর কিছু অংশ তত্ত্বজ্ঞান সংক্রান্ত।[১৪৪] ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখায় অধ্যাত্মবাদী ধারার প্রবেশ, বিকাশ ও প্রসারের ফলে শিক্ষামূলক সাহিত্যেও বিস্তৃতি সাধিত হয়। যার ফলস্বরূপ ফারসির কাব্য শাখার বিশাল অংশ জুড়ে শিক্ষামূলক সাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে ওঠে এবং খুব কম সংখ্যক পদ্য সাহিত্যেরই সন্ধান মেলে যেখানে শিক্ষামূলক সাহিত্যের বিষয়াবলি অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে,

'হিজরী ষষ্ঠ শতকে কবি সানায়ী শিক্ষামূলক সাহিত্যে নতুন আঙ্গিক ও মাত্রা যোগ করেন। তত্ত্বকথা ও উপদেশের সাথে আধ্যাত্মিকতাকে সংমিশ্রিত করে তিনি শিক্ষামূলক সাহিত্যে তিনি অতি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত শিক্ষামূলক সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে 'সাইরুল ইলাল মায়া'দ','তারীকুত তাহ্কীক' ও 'হাদীকাতুল হাকীকা', শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ। নিঃসন্দেহে ফার্সী সাহিত্যে শিক্ষামূলক সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হচ্ছে হিজরী সপ্তম শতক। ষষ্ঠ শতকে গড়ে ওঠা উল্লিখিত সাহিত্যের বুনিয়াদ সপ্তম শতকে সা'দী শিরাযী ও মাওলানা জালালুদ্দীর রুমীর আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। হাদীস ও কুরআন মজীদের আয়াত ভিত্তিক, উপদেশ, নসিহত প্রভৃতি হচ্ছে মাওলানা রুমীর শিক্ষামূলক মাসনাভীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাসনাভী ছাড়াও অন্যান্য গদ্য রচনায়ও মাওলানা রুমী শিক্ষামূলক বিষয়াদির অবতারণা করেন। হিজরী অষ্টম শতকে শেখ মাহমূদ শাবেস্তারী আধ্যাত্মিক মাসনাভী কাব্যের আদলে আধ্যাত্মিক সাধনা ও ভাবধারার বর্ণনায় 'গুলশানে রায' নামক কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন-যা সুফীতাত্ত্বিক শিক্ষামূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন। খোরাসানের এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে লিখিত এই কিতাবটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যরীতির যুগে ও সাফাভী আমলে কবিরা যেহেতু নিযামী ও রুমীর তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক রচনাবলী এবং এই শ্রেণীর কবিতার অন্যান্য দক্ষ কবিদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, সেহেতু শিক্ষামূলক সাহিত্যের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে।'[১৪৫] এ সময় যে সব গ্রন্থ রচিত তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মালিক কোমী রচিত 'মাম্বাউল আনহার', মাওলানা কাযারী হারাভী রচিত

'নায ওয়া নিয়ায', আমীর আবদুল্লাহ মুহাম্মদ হাসেম শাহ কেরমানী রচিত 'মাযহারুল আসার', গাযযালী মামহাদী রচিত 'নাকশে বাদী' ও 'আসরারে মাকতুম' এবং আবাদী বেগ রচিত 'বুস্তানে খেয়াল'।[১৪৬]

'মাশরুতে (সাংবিধানিক বিপ্লব) যুগের শিক্ষামূলক সাহিত্যের প্রচলিত প্রধান বিষয়াদি ছিল স্বাধীনতার প্রতি জোরালো সমর্থন, জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এবং মূর্খতা, দারিদ্র্য ও অনাচারের প্রতি ঘৃণা পোষণ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মীয় বিষয়াদি ও নৈতিক শিক্ষার মূলনীতিগুলো প্রধানত পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ হতে সংগৃহীত। তবে ইসলামপূর্ব ইরানীদের রচনাবলীতেও শিক্ষামূলক সাহিত্য পাওয়া যায়।'[১৪৭]

ঘ. নাট্যসাহিত্য

প্রদর্শনীর দৃশ্যপটে আচরণ ও অভিনয়ের মাধ্যমে যে কাহিনী বর্ণনা করা হয় তাকে নাট্যসাহিত্য বলা হয়।[১৪৮] এ শ্রেণীর কবিতা বা দৃশ্যমান সাহিত্য নাটকের আকারে বিদ্যমান এবং তা কমেডি, ট্রাজেডি ও ড্রামা এই তিন ভাগে হয়ে থাকে।[১৪৯]

'সাহিত্যের এই ধরনটি ফার্সী সাহিত্যে চালু নেই। তবে একথা বলা যাবে না যে, ইরানে কোনো ধরনের প্রদর্শনীমূলক সাহিত্যকর্ম বিদ্যমান ছিল না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তাজিয়া, রাওযাখানী (যা মিলাদ অনুষ্ঠানের মতো কারবালার স্মরণ অনুষ্ঠান), খীমে শাববাজি (রাত্রিকালীন তাঁবুর খেলা) হাজী ফিরুয খেলা, উৎসব, ঈদ, প্রাচীন কাব্য আবৃত্তি উল্লিখিত সব ধরনের প্রদর্শনী (নাটক) ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের ও সরল প্রকৃতির।'[১৫০]

কাজেই ইরানে যদি প্রদর্শনী তথা নাট্য সাহিত্য ঠিক ইউরোপীয় অর্থে নাও থেকে থাকে তথাপি বলতে হবে যে, প্রদর্শনীসদৃশ নাটক ও এর উপাদান অবশ্যই বিদ্যমান ছিল।[১৫১] কারবালার শহীদদের তাযিয়ার বিষয়বস্তু হচ্ছে, আল্লাহতা'য়ালার ও শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ।[১৫২]৭৮টি তাজিয়া নিয়ে পুলি সংকলন এবং ১৫টি তাজিয়া নিয়ে লিতেন ও ১০৫৫টি তাজিয়া সম্বলিত চোরুলী সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।[১৫৩]

আর অন্যদিকে, 'শাবীয়েখানী নাট্য সাহিত্যের একটি ধরনরূপে সাফাভী আমল থেকে এবং সাফাভী শিয়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় চালু হয়। মোল্লা হোসাইন ওয়ায়েয কাশেফীর মতো লোকেরা 'রাওয়াতুশ শোহাদা' গ্রন্থে কারবালার ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করে এ ধরনের প্রদর্শনী সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মীর্য আগা খান কেরমানী তিনটি রচনার সাহায্যে-যা মূলত প্রদর্শনীমূলক কাহিনী সাহিত্য, ইরানে নাটক লেখায় বিরাটভাবে সাহায্য করে। কিছুসংখ্যক লোক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থগুলোকে নাটকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। যেমন-আলী আসগার

গার্মীসীরীর মতো কেউ কেউ ইউসুফ-যুলাইখা অবলম্বনে 'ইলাহেয়ে মেসর' (মিশরের দেবী) রচনা করেন। হুসাইন আলী মাল্লাহ মাওলানা রুমীর মাসনাভী হতে চয়ন করে রচনা করেন 'পীরে চাঙ্গী'।'[১৫৪]

ঙ. ইরানী গল্প সাহিত্য

প্রাচীন যুগে বিশেষত রাজ-রাজাদের দরবারে সভাকবি বা দরবারী কবিদের ন্যায় গল্প-কাহিনী শোনানোর জন্য কিছু লোকদের রাখা হতো যারা মৌখিকভাবে বিভিন্ন বিষয়াদির বর্ণনাপূর্বক গল্প-কাহিনী শোনাতেন। বিশেষ করে হিজরী নবম শতকের পরে এমন লোক ছিলেন-যাদের নাম দাফতারনেবীস।[১৫৫] উল্লেখ্য যে, ফেরদৌসির যুগে খোরাসানের গল্পকার ও বর্ণনাশিল্পীদের কয়েক জনের নাম পাওয়া যায়। যেমন-আজাদ সার্ভ সীসতানী-যিনি মার্ভে বাস করতেন।[১৫৬]

ফারসি সাহিত্যের গল্প-কাহিনী সম্ভার ইরানি সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী এবং প্রদর্শনী সাহিত্যের ভূমিকা পালনকারী। তবে, এসব গল্প-কাহিনীগুলোতে সুনির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদির বর্ণনা থাকত না। কেননা, এসব গল্পের বেশিরভাগই সাধারণত রূপকথার কল্প-কাহিনীর বিবরণ প্রাধান্য পেতো। তবে জাতীয় বিষয় যেমন-জাতীয় বীরদের বীরত্বগাথার গল্প-কাহিনীর বর্ণনার দ্বারাও জনগণকে উদ্দীপিত করা হতো। এসব গল্প-কাহিনী ধীরে ধীরে ইসলামী যুগে লিপিবদ্ধ করা হয়।[১৫৭]

ফারসি সাহিত্যে বিদ্যমান ইরানের প্রাচীন গল্প-কাহিনীগুলোকে ১০ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-[১৫৮]

১. প্রেম ও গীতিধর্মী গল্প
২. সুফীয়ানা বা আধ্যাত্মিক গল্প
৩. বীরত্ব ও সাহসিকতার গল্প
৪. ধর্মীয় ও মাযহাবী গল্প
৫. ব্যঙ্গাত্মক গল্প
৬. দার্শনিক ও প্রতীকী গল্প
৭. লোকজ গল্প বা সর্বজনীন লোককাহিনী
৮. বাস্তবধর্মী গল্প
৯. মাকামে বর্ণনার গল্প
১০.উপমাধর্মী গল্প-কাহিনী।

১. প্রেম ও গীতিধর্মী গল্প

আশেক (প্রেমিক) মাশুকের (প্রেমাস্পদের) সম্পর্ক, প্রেম-ভালোবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যকার অবস্থা ও কার্যকলাপ এসব গল্প-কাহিনীতে সাধারণত প্রধান উপজীব্য ও আলোচিত বিষয় হিসেবে সুদীর্ঘ কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে থাকে। যেমন- ফখরুদ্দীন আসয়াদ গুরগানীর 'ভীস ওয়া রামীন', নিযামী গাঞ্জাবী রচিত 'লাইলী ওয়া মজনুন' ও 'খোসরু ওয়া শিরীন' অনুরূপভাবে 'ইউসুফ ওয়া যুলাইখা'।[১৫৯]

২. সুফীবাদী ও আধ্যাত্মিক গল্প/ সুফীয়ানা বা আধ্যাত্মিক গল্প

'এসব গল্প-কাহিনী সাধারণত সুফীতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা হতে উৎসারিত। হিজরী ষষ্ঠ শতকের পর থেকে ফার্সী সাহিত্যে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। সানায়ী 'হাদীকা' গ্রন্থে, আত্তার 'মানতিকুত তায়ের' গ্রন্থে এবং মাওলানা রুমী 'মাসনাভী'তে এ জাতীয় গল্প কাহিনী প্রচুর ব্যবহার করেছে।'[১৬০] এসব গল্প-কাহিনতে বাহ্যিক ও পার্থিবতামুখী গল্প-কাহিনী বর্ণনার করা হয়ে থাকে এবং এসব গল্প-কাহিনী ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক মর্মার্থ উদ্ধার করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ-মাসনাভী'তে মাওলানা রুমী বর্ণিত বাদশাহ ও বাঁদীর কাহিনীটি বাহ্যিকভাবে প্রেমের কাহিনী; কিন্তু কাহিনীতে বিদ্যমান প্রত্যেকটি চরিত্র ও উপাদান অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত।[১৬১]

৩. বীরত্ব ও সাহসিকতার গল্প

বীরত্বব্যঞ্জক গল্প-কাহিনী ফারসি সাহিত্যে বহুল প্রচলিত এবং এ শ্রেণীর গল্পের মাধ্যমে ইরানি গল্পসাহিত্য বিভিন্ন সমাজের সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে, ইরানি গল্প সাহিত্য বিশ্বের বিভিন্ন যুগের লোকসমাজে প্রচলিত গল্প-কাহিনীর মাঝে একটি আলাদা স্থান করে নিতে ও সমাদৃত হতে সক্ষম হয়। বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্র ও আচার-আচরণের উপস্থাপনা এর প্রধান উপজীব্য বিষয়।

'এর দু'টি ভাগ আছে, রূপকথার বীরদের কাহিনী আর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিকদের কাহিনী। রূপকথার বীরত্ব কাহিনীগুলোতে সাধারণভাবে রুস্তম, ইস্‌ফান্দিয়ার ও সোহরাবের ন্যায় চরিত্রগুলো দেখা যায়, যা শাহনামার রূপকথা অংশে বিধৃত।'[১৬২]

অন্যদিকে, 'ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গল্প বলতে সেসব বীরত্ব কাহিনীকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো হিজরী ষষ্ঠ শতকের পর ফার্সী সাহিত্যে চালু হয়েছে এবং সাফাভী যুগে ধর্মীয় উচ্চাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে। এই শ্রেণীর গল্প-কাহিনীর নমুনা হিসাবে আলেকজান্ডার, সামাক আয়ারের কাহিনী এবং তারসুসীর দারাবনামের কথা উল্লেখ করা যায়।'[১৬৩]

৪. ধর্মীয় ও মাযহাবী গল্প

ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ সাধারণত এ ধরনের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উল্লেখ থাকেন। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রের বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনাই এ জাতীয় গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: 'সীরায়ে হামযা' ও 'আবু মুসলিমনামে'-এর মতো একক গ্রন্থে[১৬৪] এ ধরনের গল্প-কাহিনী বর্ণিত।

৫. ব্যঙ্গাত্মক গল্প

সনাতন সাহিত্যে ছোট পরিসরের এসব গল্প-কাহিনী বেশ অপ্রচলিত ও কম বিস্তৃত। প্রায়শই দেখা যায় না। শুধু উবায়েদ যাকানীর রচনায় এ শ্রেণীর গল্পের সন্ধান মেলে। উবায়েদ যাকানীর এসব ব্যঙ্গ-কাহিনীর মধ্যে 'আখলাকুল আশরাফ' ও 'মুশ ও গোর্বে' (ইদুর ও বিড়াল) নামক কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়।[১৬৫] আবার ব্যঙ্গ-রসাত্মক গল্প-কাহিনীর সম্ভারও এ শ্রেণীর গল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেমন-ফার্সী সাহিত্যে মোল্লা নাসিরুদ্দীন সম্পর্কিত যেসব কাহিনী আছে সেগুলোও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।[১৬৬]

৬. দার্শনিক ও প্রতীকী গল্প

ফারসি সাহিত্যে এ শ্রেণীর গল্পসাহিত্য বেশ প্রসিদ্ধ যেগুলো সাধারণত রহস্যমণ্ডিত ও প্রতীকধর্মী হয়ে থাকে। সাধারণত দার্শনিক চিন্তা-চেতনা থেকে সাহিত্যিকগণ এই বৈশিষ্ট্যের গল্প রচনা করে থাকেন। ফার্সী সাহিত্যে ইবনে সীনা তার 'হাই ইবনে ইয়াকযান' গল্পের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকায় আছেন।[১৬৭] দার্শনিক চিন্তাধারার সমন্বয়ে গল্পগুলো নান্দনিক সাহিত্য শৈলীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। দার্শনিক ও প্রতীকী গল্পের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'আকলে সোর্খ' (লাল বুদ্ধি)।[১৬৮] ফারসি সাহিত্যে এ শ্রেণীর গল্প-কাহিনীর মধ্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হলো-'আওয়াযে পারে জিব্রাঈল'(জিব্রাঈলের ডানার আওয়ায), 'রুযী বা জমায়াতে সুফিয়ান' (সুফীদলের সাথে একদিন) ও 'কেসেসেয়ে গুরবাতুল গ্বারবিয়ে', কবি নিযামী গাঞ্জাভীল 'হাফত পেইকার' গ্রন্থে বিধৃত 'গুম্বাদে সীয়াহ' (কৃষ্ণ গম্বুজ) গল্পটিও এই শ্রেণীর।[১৬৯]

৭. লোকজ গল্প বা সর্বজনীন লোককাহিনী

প্রত্যেক সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির সাহিত্যাঙ্গনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে সবসময়ই এ জাতীয় গল্প-কাহিনী বিদ্যমান। আর, সেখানে সংশ্লিষ্ট সমাজ ও সভ্যতার চিন্তা-চেতনা এবং বাস্তবতার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে। কিন্তু, ফারসি সাহিত্যে এর পূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে কোনেরূপ গবেষণা সম্পন্ন হয়নি। 'এ ক্ষেত্রে শুধু যেসব

গল্প-কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায় তাহলো জিন-পরীর কিচ্ছা। 'আজায়েবুল মাখলুকাত' বা উদ্দীপনামূলক গল্প ও কাহিনী। যেমন 'সেন্দবাদ নামে', 'হাজার ওয়া ইয়েক শাব', 'বখতিয়ার নামে' ও 'তুতী নামে'।'[১৭০]

৮. বাস্তবধর্মী গল্প বা বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী

এসব গল্প-কাহিনী মূলত এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাস্তব চরিত্র ও জীবন সম্পর্কিত বর্ণনা। এর সর্বপ্রাচীন নমুনা হিসাবে আবু সাঈদ আবুল খায়েরের নাতিরা তাঁর সম্পর্কে যেসব পুস্তক রচনা করেছেন, সেগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়।[১৭১]'আসরারুত তাওহীদ ' এবং আবু সাঈদের জীবন চরিত ও বক্তব্য সমগ্র, শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত গল্প-কাহিনীগুলো এ শ্রেণীভূক্ত।

৯. মাকামে বর্ণনার গল্প বা মাকামে গল্পসম্ভার

ছোট গল্পকে মাকামে বর্ণনার গল্প বুঝায়, যে গল্পগুলোতে কোনো এক ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার বর্ণনা করা হয়। মাকামা গল্পের নায়কের চরিত্র গল্পের শেষ ভাগে ঘটনার দৃশ্যপট হতে হারিয়ে যায় এবং নিজের ভাগ্য ও পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনাকারীকে অজ্ঞতার মধ্যে রেখে দেয়।[১৭২] শেখ সা'দী তাঁর 'গুলিস্তান'-এ মাকামা

গল্পের ব্যবহার করে সবাইকে ছাড়িয়ে এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। তবে, ফার্সী ভাষায় মাকামের গল্প শুরু হয়েছে হামিদীর (মৃত্যু ৫৫৯/ ১১৬৩ খ্রি.) মাকামাতের মাধ্যমে।[১৭৩]

১০.উপমাধর্মী গল্প-কাহিনী

উপমার মাধ্যমে কাহিনীর বর্ণনা ও চিত্রায়ন করলে তাকে উপমাধর্মী গল্প-কাহিনী বলে। ফারসি সাহিত্যে পশু-পাখির মুখ দিয়ে বলানো গল্প-কাহিনীগুলো এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এসব গল্প-কাহিনীতে পশু-পাখিদের চরিত্রের ভূমিকায় রেখে তাদেরকে সমাজের মানুষের উপমা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

'এ জাতীয় গল্পের উন্নত নমুনা হচ্ছে 'কালিলা ও দেমনা'-যা ভারতীয় প্রাচীন কাহিনী হতে অনুবাদ করা হয়েছে। 'কালিলা ও দেমনা'র পরে ফার্সী সাহিত্যের অন্যতম উপমানির্ভর গল্প হচ্ছে 'মার্যবান নামে' ও 'আনওয়ার সুহাইলী'।'[১৭৪]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. খান, আবদুস সবুর, *আধনিক ফারসি ছোট গল্প*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০০৯, পৃ. ১৯।
২. https://bn. www.wikipedia.org.
৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, (অনুবাদ-তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও ঈসা শাহেদী), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, পৃ. উপক্রমনিকা।
৪. খান, আবদুস সবুর, ঐ, পৃ. ভূমিকা।
৫. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ভূমিকা।
৬. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৭৯, পৃ. ১।
৭. খান, আবদুস সবুর, ঐ।
৮. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ।
৯. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
১০. ঐ।
১১. খান, আবদুস সবুর, ঐ।
১২. ঐ।
১৩. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, *ভূমিকা অংশ*, পৃ.১০।
১৪. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ১-২।
১৫. খান, আবদুস সবুর, ঐ।
১৬. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
১৭. খান, আবদুস সবুর, ঐ।
১৮. আহমাদ, জালালে আলে, *জালালে আলে আহমদের নির্বাচিত ছোটগল্প*, (অনুবাদ-খান, আবদুস সবুর), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ভূমিকা।
১৯. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৩।
২০. খান, আবদুস সবুর, ঐ।
২১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৪৫।
২২. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৩।
২৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৪৫।
২৪. বাহা'র, মুহাম্মাদ তাকী, *সাবক শেনা'সী ১ম খণ্ড*, পৃ. ২৮৩-৯।
২৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
২৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৬৮।
২৭. খান, আবদুস সবুর, *ফারসি উপন্যাসে জীবন ও মানবিকতা*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশে বই মেলা, ২০১৩, পৃ. ১২।
২৮. খান, আবদুস সবুর, ঐ, পৃ. ২১।
২৯. খান, আবদুস সবুর, ঐ, পৃ. ৩৩।
৩০. খান, মনজুরুল আলম, *আধুনিক ইরান*, ঢাকা, পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ১৭।
৩১. ফারশীদাভারদ, *দারবা'রেয়ে আদাবিয়া'ত ওয়া নাক্বদে আদাবী ২য় খণ্ড*, পৃ. ৭৯৪।
৩২. হুমা'য়ী, *ফুনুনে বালা'গাত ওয়া সানা'য়া'তে আদাবী*, পৃ. ৯৪।
৩৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১২১।
৩৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১২২।
৩৫. শামীসা', সিরুস, *আনভা'য়ে আদাবী*, পৃ. ৪৮।
৩৬. শামীসা', সিরুস, ঐ, পৃ. ৫২।
৩৭. সাফা', ড. যবীউল্লাহ, *হামা'সে সারা'য়ী দার ঈরা'ন*, পৃ. ৫-৬।
৩৮. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১২৩।

৩৯. ঐ।
৪০. ঐ।
৪১. ঐ।
৪২. শামীসা', সিরুস, ঐ, পৃ. ৫৩।
৪৩. সাফা', *হামা'সে সারা'য়ী দার ঈরা'ন* ও শামীসা', *আনভা'য়ে আদাবী*
৪৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৪৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, পৃ. ১২৩, ১২৪।
৪৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, পৃ. ১২৪।
৪৭. ক্রিস্টিন সেন, *প্রথম মানব, ইরানের রূপকথার ইতিহাসের প্রথম শাসক*
৪৮. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৪৯. সাফা', ড. যবীউল্লাহ, *হামা'সে সারা'য়ী দার ঈরা'ন*, পৃ. ২৮।
৫০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৫১. ঐ।
৫২. ঐ।
৫৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১২৫।
৫৪. ঐ।
৫৫. রায্‌মজু, *আনভা'য়ে আদাবী*, পৃ. ৫৯।
৫৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৫৭. ঐ।
৫৮. ঐ
৫৯. শামীসা', সিরুস, ঐ, পৃ. ৫৯।
৬০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৬১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৩৯।
৬২. কুব, যার্‌রীন, *শেরে বী দুরুগ, শেরে বী নেকা'ব* (*মিথ্যাহীন নেকাবহীন কবিতা*), পৃ. ১৪৩।
৬৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৬৪. ফারশীদাভারদ, *দারবা'রেয়ে আদাবিয়া'ত ওয়া নাক্বদে আদাবী* ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।
৬৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৬৬. কুব, যার্‌রীন, ঐ, পৃ. ১৪৫।
৬৭. কুব, যার্‌রীন, ঐ, পৃ. ১৪৩।
৬৮. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪০।
৬৯. ঐ।
৭০. ময়েজউদ্দীন, মোহাম্মদ, *রাহনুমায়ে সুখান*, কুরআন মনযিল, ঢাকা, তা. বি. পৃ. ৫৭।
৭১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৭২. শামীসা', সিরুস, *সেইরে রোবাঈ*, পৃ. ১৩।
৭৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪১।
৭৪. কাশেফী, ওয়া'য়েয, *বাদায়েউল আফকা'র ফি সানায়ে'ল আশআ'র*, পৃ. ৭২।
৭৫. শামীসা', সিরুস, *সেইরে রোবাঈ*, পৃ. ২৬।
৭৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৭৭. ঐ।
৭৮. ঐ।
৭৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪২।

৮০. **ওমর খাইয়াম:** 'চাহার মাকালে'-এর বিবরণীতে জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কিত নিবন্ধে ওমর খাইয়ামের নাম পরিচয় সম্পর্কে এসেছে: খাজা ইমাম ওমর খাইয়াম হুজ্জাতুল হক হাকীম আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইব্রাহীম আল খাইয়াম নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের সূচনা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে অনেকের মতে ১০৩৮-১০৪৮ খ্রি. এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১২৩-১১২৪ খ্রি. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে *মাকালাতু ফি'ল জাবরী ওয়াল মুকাবিলা, মুসাদিরাতু, কিতাব-ই-উকলিদাস, মুশকিলাতুল হিসাব, রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম* উল্লেখযোগ্য। [দ্রষ্টব্য: বাদাখশানী, মীর্যা মকবুল বেগ, *আদব নামেয়ে ইরান*, এস ডি প্রিন্টার্স, লাহোর, তা. বি., পৃ. ২২৭-২৩৪; সাফা', যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান* ১ম খণ্ড, এন্তেশারাতে কোকনুস, তেহরান, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ, পৃ. ২৬৩-২৬৬; নোমানী, আল্লামা শিবলী, *শেরুল আজম* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।]

৮১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪৬।

৮২. সাফা', যবীউল্লাহ, *তা'রিখে আদাবিইয়া'ত দার ঈরা'ন* ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৯।

৮৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪৮।

৮৪. কুব, যার্‌রীন, *বা' কা'রভা'নে হোলে*, পৃ. ১৩৭।

৮৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।

৮৬. কুব, যার্‌রীন, *বা' কা'রভা'নে হোলে*, ঐ।

৮৭. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৫০।

৮৮. শামীসা', সিরুস, *সেইরে রোবাঈ*, পৃ. ১৫১-১৫২।

৮৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।

৯০. গুলবুন, *বাহা'র ওয়া আদাবে ফা'রসী* ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২।

৯১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৫১।

৯২. খা'নলারী, পারভেজ নাতেল, *ভা'য্‌নে, শে'রে ফা'রসী*, পৃ. ৭১।

৯৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।

৯৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৫২-১৫৩।

৯৫. তা'হের, বাবা, *দীভা'নে আশয়া'র*, পৃ. ৮।

৯৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৫৩।

৯৭. আয্‌কা'য়ী, *বা'বা' তা'হের না'মে*, পৃ. ২৫৫।

৯৮. ময়েজউদ্দীন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫১।

৯৯. শামীসা', সিরুস, *আনভা'য়ে আদাবী*, পৃ. ২৬৫।

১০০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৫৪।

১০১. হুমা'য়ী, ঐ, পৃ. ১১৬।

১০২. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৫৫।

১০৩. কায়েস, শামসে, *আল মুজা'ম*, পৃ. ৩৬১।

১০৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।

১০৫. শামীসা', সিরুস, *আনভা'য়ে আদাবী*, পৃ. ২৭১।

১০৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৫৬।

১০৭. শামীসা', সিরুস, *সেইরে গাযাল দার শে'রে ফা'রসী*, পৃ. ২৫।

১০৮. কায়েস, শামসে, *আল মু'জাম ফী মায়া'ইর আশআ'রুল আজম*, পৃ. ৩৫৮।

১০৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৭২-১৭৩।

১১০. **সাদি শিরাজি:** ফারসি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। যিনি মানবতাবাদী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। তবে তাঁর দার্শনিক, পর্যটক ও জনসেবক হিসেবেও পরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে। তাঁর পুরো নাম আবু মুহাম্মদ মুশাররফ উদ্দিন(শারপুদ্দিন) মুসলেহ বিন আবদুল্লাহ বিন মুশাররফ আস্ সা'দি আশ শিরাজী। তবে সর্ব সাধারণের কাছে সা'দি নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ১১৮৪ খ্রি. মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১ ও ১১৯৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।সা'দ ইবন জঙ্গী (৫৯৯-৬৩২ হি.) কবির প্রতি অনুগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ সাদী কাব্যনাম গ্রহণ করেন। ৬৯১ হি. মোতাবেক ১২৯২ খ্রি. শিরাজ নগরে

মৃত্যুবরণ করেন। সাদীর রচনাবলীর মধ্যে কারীমা, বূস্তান ও গুলিস্তান অন্যতম। [দ্রষ্টব্য: Brown, E. G., *A literary History of Persia Vol. II,* The Syndics of Cambridge University Press, 1969, pp. 526-528; সাফা', যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান*, এন্তেশারাতে ফেরদৌস, চাপখানেয়ে রামীন, তেহরান, ১১তম সংস্করণ, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ, পৃ. ৫৮৪-৫৮৫।]

১১১. হাফেজ শিরাজি: তাঁর পুরোনাম শামসুদ্দিন মুহম্মদ হাফেজ শিরাজি। তিনি ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে শিরাজ নগরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁকে শিরাজী বলা হয়। তিনি *দিওয়ানে হাফেজ* রচনার জন্য বিখ্যাত। তাঁর মধ্যে এশকে এলাহির প্রেম ছিল গভীর। সুফিবাদের যে ধারা তাঁর রচনার মধ্যে দেখা যায় সেটি অত্যন্ত পরিপূর্ণ ও খুবই শক্তিশালী। আবদুর রহমান জামি তাঁকে '*লিসানুল গায়েব*' (অদৃশ্যের ভাষ্যকার) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে গযলকাব্যের রচয়িতা হিসেবে তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে *তরজমানুল আসরার* (রহস্যের মর্মসন্ধানী) উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বাল্যকালে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করে হাফিজ উপাধি অর্জন করেন। হাফিজের কাব্য প্রতিভার একমাত্র নিদর্শন *দীওয়ান* (কাব্য সমগ্র) যা *গযল*, *কাসীদা*, *রবাঈ* ও *মসনবী*র সমাহার। [দ্রষ্টব্য: শাফাক, রেজা যাদেহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, চাপ খানে আরমান, তেহরান, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ, পৃ. ৩০৭; Arberry, A. J., *Classical Persian Literature*, Geprge Allen And Unwin ltd. London, p. 330; নোমানী, আল্লামা শিবলী, *শেরুল আজম*, আল ফয়সাল, লাহোর, ১৩২৫ হিজরী, পৃ. ১৬৯।]

১১২. শামীসা', সিরুস, *সেইরে গাযাল দার শে'রে ফা'রসী*, পৃ. ১২।

১১৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৭৮-১৭৪-১৮০।

১১৪. ময়েজউদ্দীন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫৯।

১১৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

১১৬. ঐ, পৃ. ১৯৫।

১১৭. ঐ, পৃ. ১৯৬।

১১৮. ফেরদৌসি: বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি এবং ইরানের জাতীয় কবি। তাঁর উপনাম আবুল কাসেম এবং উপাধি ফেরদৌসি। তিনি ৩২৯/৩৩০ হি. মোতাবেক ৯৪০/৯৪১ খ্রি. ইরানের 'তুস' নগরের 'তাবরান' এলাকার 'বায' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪১১ হি. মোতাবেক ১০২০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে *শাহনামা* ও *ইউসূফ-জোলেখা* অন্যতম। বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য *শাহনামা*র মাধ্যমে তিনি ইরানিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে সুরক্ষিত ও কালজয়ী করে নিজেও কালজয়ী হয়েছেন। [দ্রষ্টব্য: সাফা', যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান* ১ম খণ্ড, এন্তেশারাতে ফেরদৌস, তেহরান, ১২তম সংস্করণ, ১৩৭১ সৌরবর্ষ, পৃ. ৪৫৮-৪৫৯; শাফাক, রেজা যাদেহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১ম সংস্করণ, তেহরান, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ, পৃ.৭৯; নোমানী, আল্লামা শিবলী, সাইয়েদ মোহাম্মদ তাকী খরদায়ী গিলানী (অনু.) *শেরুল আজম ২য় খণ্ড*, দুনিয়ায়ে কিতাব, তেহরান, ১৩৬৩ সৌরবর্ষ, পৃ. ৭১।]

১১৯. শামীসা, সিরুস, *আনওয়া ই আদাবি*, নাশরে মিতরা, তেহরান, ১৩৮৬ সৌরবর্ষ, পৃ. ২৯৪।

১২০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৯৬।

১২১. ঐ।

১২২. নিকুবাখত, নাসের, (উদ্ধৃতি) *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, পৃ. ৭৬।

১২৩. সানায়ী গাযনাভী: তাঁর মূল নাম হাকিম আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানাই গজনভি। তিনি ষষ্ঠ হিজরি শতকের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। সুফি ভাবধারায় জীবন যাপনের জন্য ইতিহাসে তিনি একজন সুফি কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে, ড. যাবিহুল্লাহ সাফা তাঁকে পঞ্চম হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়ে গজনিতে জন্মগ্রহণকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি শুধু ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেছেন। পরে তিনি অনুতপ্ত হয়ে এরফান বিষয়ক কবিতা রচনায় মনোনিবেশ হন। এ সময়ে তিনি কাবা শরীফে হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজব্রত তাঁকে এরফানি জগতের চিন্তা চেতনায় শক্তি যোগিয়েছিল। এরপর থেকেই তিনি দুনিয়াকেন্দ্রিক চিন্তা পরিত্যাগ করে এরফানি চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তাঁরপর থেকে তিনি খোরাসানে একজন সুফি হিসেবে পরিচিতি পান। একারণে তাঁর কবিতাগুলো প্রশংসা ও এরফানমূলক এ দুটি বিষয়ে বিভক্ত। তাঁর

কবিতাগুলো সুফিবাদের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ৫২৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর *হাদিকাতুল হাকীকাত* রচনাটি সুফিবাদের জন্য একটি উৎকৃষ্টতম নমুনা যা মসনবি আকারে রচিত। এটিকে *এলাহীনামা* নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এ কাব্যগ্রন্থটি সুফিবাদের জন্য একটি উৎকৃষ্টতম রচনা। এটি আল্লাহর সাথে তাঁর গভীর প্রেমের পরিচয় বহন করে। তাঁর অপর রচনার নাম *সিয়ারুল উব্বাদ ইলাল* ১৭৭ *মা'দ* নামক মসনবি গ্রন্থ। মানুষ সৃষ্টির রহস্য, চরিত্র ও প্রজ্ঞা দর্শনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অপর পাঁচ শত বয়েতের রচনার নাম *কারনামে বালখ*। তাঁর *তরীকুত তাহকিক* রচনাটি একটি ছোট্ট কাব্যগ্রন্থ। এ কবিরনামের সাথে *এশকনামে* ও *তাজরিবাতুল উলুম* কাব্যগ্রন্থ সম্পৃক্ত। *বাহরাম ওয়া বেহরুয* রচনাটি তাঁর রচনা হিসেবেঅভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর মোট রচনা হল ছয়টি। [দ্রষ্টব্য: সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান ২য় খণ্ড*, পৃ. ৫৫৩; সায়ফ, আবদুর রেযা, ও মারাকাবি, গোলাম হোসাইন, *মাসনাভীহায়ে সানাঈ*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৯, পৃ.৭; সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (জেলদে দোওম), পৃ. ৫৫৩; শাকিবা, পারভিন, *শেরে ফারসি আয আগায তা এমরুয*, এন্তেশারাতে হীরমান্দ, তেহরান, ১৩৭৩, পৃ. ৯৭;সায়ফ, আবদুর রেযা, ও মারাকাবি, গোলাম হোসাইন, *মাসনভীহায়ে সানাঈ*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৯, পৃ. ১৩।]

১২৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

১২৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ.১৯৮।

১২৬. **নিযামী গানজুবী:** তাঁর পুরো নাম হাকীম আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস ইবন ইউসুফ নিযামী। ৫৩০/ ৫৩৫ হি. তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মাত্র সতের বছর বয়সে আধ্যাত্মিক সফলতা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আলী আসকর যাদেহ ৬০৫ হি.,কাজবীনী তাঁর *আসারে বেলাদ* গ্রন্থে ৫৯০ হি. মুহাম্মদ মুঈন ও যবীহউল্লাহ সাফা ৬১৪ হি. বলে উল্লেখ করেন। তিনি গাঞ্জ শহরেই মৃত্যুবরণ করেন। নিযামীর পাঁচটি মসনবী গ্রন্থ রয়েছে যা পাঞ্জেগাঞ্জে নিযামী বা পঞ্চরত্ন হিসেবে সমধিক পরিচিত। এ পঞ্চরত্ন ছাড়াও দিওয়ানে নিযামী নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন রয়েছে। [দ্রষ্টব্য: যানযানি, বারায়াৎ, *আহওয়ার ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, মুআসেসেয়ে এন্তেশারাত ভা চাপে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭২ সৌরবর্ষ, পৃ. ১-২, ১৩-১৪; Brown, Edward G., *A Literary History of Persia vol. II,* Cambridge University Press, London, 1928, p. 401.]

১২৭. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৯৭।

১২৮. **জামি:** জামি হিজরি নবম শতকের কবি যিনি না'ত সাহিত্য রচনার জন্য মুসলিম বিশ্বে খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থের শুরুতে নবী করীম (সা.) এর উপর এক বা দু'টি করে কবিতা রয়েছে; যা নবীপ্রেমের উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি ছিলেন একজন সুফি সাধক এবং অল্প বয়সেই তাঁর হৃদয়ে অধ্যাত্মজ্ঞান এবং সুফিদের প্রতি ভালবাসা তাঁর জায়গা করে নেয়। তাঁর পিতা আহমদও ছিলেন একজন আলেম, সুফিভক্ত ও খোদাপ্রেমিক ব্যক্তি। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করে চলতেন। এরফানি কবিতা এবং সুফিতত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা তাঁর অন্যতম নিদর্শন। তাঁর রচিত *ইউসুফ-জুলেখা*, *হাফত আওরাঙ্গ*, *বাহারিস্তান*, *সালামান ওয়া আবলাস*, *লাইলি ও মাজনুন*, *নাফাহাতুল উনস*, প্রভৃতি গ্রন্থগুলো সুফিবাদের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া তাঁর রচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক রেযা যাদেহ সাফাক উল্লেখ করেছেন ৫৪টি, যাবিহুলল্লাহ সাফার মতে ৪৮টি, আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে বিরত থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কথা বলেছেন। এ কথা সত্য যে, তিনি গদ্য ও পদ্যে, আরবি এবং ফারসি ভাষায় মৃত্যু পর্যন্ত রচনাকর্মে লিপ্ত ছিলেন। জামি খোরাসা প্রদেশের 'জাম' নামক ক্ষুদ্র নগরীতে খারজেদে ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৯৪ মতান্তরে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে পরলোগমন করেন। তাঁর পুরো নাম নূরুদ্দীন আবুল বারাকাত আব্দুর রহমান ইবনে নিযামুদ্দীন আহমদ ইব্ন জামি। [দ্রষ্টব্য; শাফাক, সাদেক রেযা যাদেহ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৩১; জুনায়দি, আজিমুল হক, পৃ. ২১৭-৮; সাফা, যাবিউল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান ৪র্থ খণ্ড*, ফেরদৌসি পাবলিকেশন্স, তেহরান, ১৩৮৫ সৌরবর্ষ, পৃ. ৩৪৭; বাদাখশানী, মীর্যা মকবুল বেগ, *আদব নামেয়ে ইরান*, ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, লাহোর, তা.বি., পৃ. ৫৮২-৫৮৩; Brown, Edward G., *A Literary History of Persia vol. III,* At The University Press, Cambridge, London, 1969, p. 507.]

১২৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

১৩০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৯৮।
১৩১. ঐ।
১৩২. ইসফাহানী, জামালুদ্দীন, *দীভা'নে জামালুদ্দীন*, পৃ. ২-১১।
১৩৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৯৯।
১৩৪. ঐ, পৃ. ২০০।
১৩৫. রায্‌মজু, *আনভা'য়ে আদাবী*, পৃ. ৩৩।
১৩৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
১৩৭. নিকুবাখত, নাসের, *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, পৃ. ৩৭; গোয়ারি, সোযান, *আদাবিয়্যাতে ফারসি ওয়া তাহাবুলাতে অন*, পৃ. ৩৩।
১৩৮. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২০১।
১৩৯. ঐ।
১৪০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২০২।
১৪১. ঐ।
১৪২. হুমা'য়ী, *ফুনুনে বালা'গাত ওয়া সানা'য়া'তে আদাবী*, পৃ. ১০১।
১৪৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২০৩।
১৪৪. ঐ, পৃ. ২০৪।
১৪৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২০৪, ২০৫।
১৪৬. তামীমদা'রী, ড. আহমাদ, *এরফা'ন ও আদাব দার আসরে সাফাভী* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১-২৪৩।
১৪৭. তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঐ, পৃ. ২০৬।
১৪৮. ঐ।
১৪৯. ফারশীদাভারদ, *দারবা'রেয়ে আদাবিয়া'ত ওয়া নাক্বদে আদাবী* ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২।
১৫০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঐ।
১৫১. ফারশীদাভারদ, ঐ, পৃ. ৫৭।
১৫২. তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঐ, পৃ. ২০৭।
১৫৩. মালেকপুর, *আদাবিয়া'তে নোমা'য়েশী দার ঈরা'ন* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।
১৫৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঐ, পৃ. ২০৭-২০৮-২০৯।
১৫৫. ঐ, পৃ. ২১০।
১৫৬. ঐ, পৃ. ২০৯।
১৫৭. ঐ।
১৫৮. ঐ, পৃ. ২১০।
১৫৯. ঐ।
১৬০. ঐ, পৃ. ২১০।
১৬১. ঐ, পৃ. ২১০-২১১।
১৬২. ঐ, পৃ. ২১১।
১৬৩. ঐ।
১৬৪. ঐ।
১৬৫. ঐ।
১৬৬. ঐ।
১৬৭. ঐ।
১৬৮. ঐ।
১৬৯. ঐ।
১৭০. ঐ, পৃ. ২১২।

১৭১. ঐ ।
১৭২. ঐ ।
১৭৩. ঐ ।
১৭৪. ঐ ।

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

চতুর্থ অধ্যায়

ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা: সূচনা ও প্রসার

ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা: সূচনা ও প্রসার

ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার সূচনা

ফারসি সাহিত্য অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ একটি সাহিত্য। ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখায় এ আধ্যাত্মিক ধারা সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। ২৪৫ হিজরী সালের প্রখ্যাত সূফী প্রবক্তা জুননুন মিসরীর মন্তব্যের বরাত দিয়ে আর. এ নিকলসন উল্লেখ করেছেন, `The Sufis are folk who have preferred God to everything, so that God has preferred them to everything.'[১] এই আধ্যাত্মিক চিন্তা ফারসী-কাব্যের বিস্তৃত অংশ জুড়ে ভাস্বর হয়ে আছে।[২] সূফী ও আরেফ সম্প্রদায়ের বিকাশ প্রক্রিয়া ইসলামের সূচনাকাল থেকেই প্রতিভাত হয়ে আসছে।[৩] যদিও হিজরী প্রথম শতাব্দীতে সুফীগণ সুশৃঙ্খল গর্বিত সংঘবদদ্ধার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু সূফীদের মতে, মহাপরক্রমশালী আল্লাহর ভয় তাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কারণরূপে কাজ করত।[৪] অন্যকথায় ইবাদতকারী মুসলমানই হচ্ছেন সুফী।[৫] আর, ফারসী সাহিত্যের বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে 'সূফী' প্রভাব।[৬]

দ্বাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ফারসী সাহিত্যে মরমীবাদের স্পর্শ বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বেশ কয়েকজন কবি তাঁদের সাহিত্যকর্মে মরমীবাদকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য প্রদান করেন।[৭] ইসলামি তাসাউফের সূচনার বিষয়টি সুনিশ্চতভাবে নির্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার হলেও এর আনুমানিক সূচনাস্তর সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যেমন, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পরবর্তী সময়ে সুফীগন অপেক্ষাকৃত উন্নততর ও সুশৃঙ্খল সংঘবদ্ধতার অধিকারী ছিলেন।[৮] সুফিদের এরূপ সুশৃঙ্খল জীবন যাপন ইতোপূর্বে লক্ষ্য করা যায় না । সুতরাং এসময় থেকেই ইসলামি তাসাউফের প্রারম্ভিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বলেই ধারণা করা যেতে পারে। কেননা, তাসাউফের পথের আধ্যাত্মিক সাধকদেরকে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের উচ্চ মাকামে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে অতিক্রম করতে হয়। এসব ধাপের মধ্যে বিদ্যমান থাকে বিভিন্ন আমল বা আচরণ ও কাজ। 'সাধারণত এ কাজগুলো হচ্ছে নামায আদায়, কুরাআন তিলাওয়াত এবং বিভিন্ন ধরনের কঠিন ও কষ্টকর কাজ। শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তারের 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' ও মাওলানা আব্দুর রহমান জামীর 'নাফাহাতুল উন্‌স' প্রভৃতি গ্রন্থে এসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে।'[৯]

তাসাউফ হচ্ছে সকল আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সমষ্টি, তবে নদী বা ঝর্ণার পানি পানের বিভিন্ন জায়গার ন্যায় ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকতে।[১০] এ ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে তুলনা ও পর্যালোচনা করলে

আমরা দেখতে পাব যে, সুফীদের আকিদা-বিশ্বাসের একটা বড় অংশই অন্যান্য জাতির আরেফগণের তথা আধ্যাত্মিক পুরুষদের আমলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১১] সূফীমতবাদের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করে মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী উল্লেখ করেছেন, 'সূফী দর্শনের আত্মা ফরিদ উদ্‌দীন আত্তার, সানাই দুই চোখ এবং আমার স্থান এসবের পরে।'[১২] যদিও তৎপরবর্তীকালে ফারসি সাহিত্য তথা অধ্যাত্মবাদের জগতে মাওলানা রুমিকেই শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিগনিত করা হয়। উল্লেখ্য, ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার ধারা অধিক মাত্রায় প্রচলন ও সূচনার প্রাক্কালে যে কয়েকজন ফারসি কবি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন; এই দলের অন্যতম সানাই।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাসাউফের সর্বপ্রধান মূলনীতি ছিল জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি সীমাহীন তাওয়াক্কুল এবং তাঁর রহমতের জন্য সীমাহীন আশা।[১৩] হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দিতে বিভিন্ন পর্যায়ে এমনিভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি সীমাহীন তাওয়াক্কুলকারী বিশেষ ধরনের জীবন যাপনকারী কিছু ব্যতিক্রমধর্মী লোকের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়, যাঁদের এই ব্যতিক্রম ধারার বিশেষ জীবন যাপনের জন্য লোকেরা তাদেরকে আলাদা ও বিশেষ নামে এবং পরিচয়ে চিহ্নিত করত। অনতিকাল পরে তাঁরাই সুফি নামে অভিহিত হন।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দির সর্বাধিক বিখ্যাত সুফিদের মধ্যে হাসান বাসরী (ওফাত হি. ১১০/৭২৮ খ্রি.) এবং ইবরাহীম আদহাম (ওফাত হি. ১৬১/৭৭৭ খ্রি.)-এঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। হাসান বাসরী; দৃশ্যত তিনিই প্রথম সুফী এবং তিনি 'রে'আইয়াতু হুকুক্বিল্লাহ' (আল্লাহর হক আদায়) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।[১৪] হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দিতে এরকম আরো কিছু সুফির সন্ধান মেলে যাঁরা অত্যন্ত বড় মাপের সুফি হিসেবেই এলমে তাসাউফের জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে হলেন: রাবেয়া আদাভিয়ে (রাবেয়া বাসরী নামে খ্যাত), আবু হাশেম কুফী-সুফিয়ান সাওরীর উস্তাদ (মৃত্যু হিজরী ১৬১ সাল), ইবরাহীম আদহামের বিখ্যাত শিষ্য শাকীক বালখী যিনি হযরত ইমাম মুসা ইবনে জাফল (মুসা কাযেম) (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, মারুফ কারখী- যিনি হযরত ইমাম রেযা (আঃ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ফুযাইল আয়ায (মৃত্যু ১৭৮ হি./ ৮০২ খ্রি.)।[১৫] হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)-এর ধারাবাহিক দারস-এর সংকলন 'মিসবাহুশ্ শারীআহ্' তাঁর দ্বারা সংকলিত বলে বর্ণিত আছে।[১৬] হিজরি তৃতীয় শতাব্দিতেও কয়েকজন সুফির আবির্ভাব ঘটে যাঁরা এলমে তাসাউফ তথা অধ্যাত্মবাদের ধারাকে মহিমান্বিতকারী করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এঁদের মধ্যে বায়েযীদ বাস্তামী (বোস্তামী) (ওফাত ২৩৪ হি./৮৫০ খ্রি.) প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্ট ভাষায় ফানা ফীল্লাহ্ (আল্লাহর জন্য আত্মবিলয়) ও বাকাবিল্লাহ্ (আল্লাহকে আশ্রয় করে স্থিতি লাভ) সম্বন্ধে কথা বলতেন।[১৭] তাঁর রচনাবলী ও উক্তিতে অস্তিত্বের তিনটি রূপ অর্থাৎ 'আনানিয়্যাত্' (আমিত্ব), 'ইন্নিয়্যাত্' (আমিত্বের অবশ্যম্ভাবিতা) ও 'হুভিয়্যাত্' (প্রকৃতি বা রূপ) সম্পর্কে আলোচনা

লক্ষ্য করা যায়।[১৮] এ শতাব্দির অন্যান্য সুফিদের মধ্যে যুনুনুন মিসরি (মৃত্যু ২৪০ হি./ ৮৫৪ খ্রি.), সাহল্ বিন আব্দুলাহ (মৃত্যু ২৮৩ বা ২৯৩ হি./ ৮৯৬ বা ৯০৫ খ্রি.), বাশার হাফী (মৃত্যু ২২৬ হি./ ৮৪০ খ্রি.), সের্‌রী সেকতী (মৃত্যু আনুমানিক ২৪৫ হিজরির কাছাকাছি), জুনাইদ বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৭ হি./ ৯০৯ খ্রি.), মানসুর হাল্লাজ (মৃত্যু ৩০৬ বা ৩০৯ হি./ ৯১৮ বা ৯১২ খ্রি.), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের সমসাময়িক হারেছ মুহাসিবী (মৃত্যু ২৪৩ হি.)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে-

'জুনাইদ বাগদাদীর উপাধি ছিল 'সাইয়েদুল তায়েফাহ্' (গোষ্ঠীর নেতা অর্থাৎ আরেফকুলের নেতা)। .... তিনি ছিলেন বাগদাদের সুফীদের মধ্যমণি; এ কারণে তাঁকে 'শায়খুত তায়েফাহ' বলা হতো। তিনি তাঁর রচনাবলীতে নৈতিক, আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমা, সেদ্‌ক (সত্যবাদিতা এবং কথা ও কাজের মিল), ইখলাস ও ইবাদাত সম্বন্ধে কথা বলেছেন। জুনাইদের নৈতিক-আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমা শারীয়াত ও তারীকাত-এ দুই অক্ষের শর্তাধীন।'[১৯]

যে ব্যক্তি হাকীকাতে উপনীত হয়েছে তাঁর জন্য শারীয়াত রহিত হয়েছে-তিনি এ আকিদার বিরোধী ছিলেন।[২০] কিন্তু আরেফগণের ইতিহাসে ইতিহাসে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুফী ছিলেন হুসাইন বিন মানসুর আল হাল্লাজ। তিনি ফার্স প্রদেশের লোক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। অধ্যাত্মবাদের ইতিহাসে মানসুর হাল্লাজ ছিলেন স্বাধীনচেতা, মানবিকতা, দুঃসাহস ও বীরত্বের প্রতীক।[২১]

তাসাউফে নতুন নতুন চিন্তা ও পরিভাষার উদ্ভব হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও এ শতাব্দী বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ:

দরবেশী ও পশমী পোশাক পরিধানের বাহ্যিকতাকে গুরুত্ব না দেয়া, যোহদ (কৃচ্ছ্রতা)-কে আধ্যাত্মিকতার পূর্বশর্তরূপে গণ্য করা, কোনো কোনো সময় ইবাদাত-বন্দেগী (আল্লাহর পরিচিতি লাভের পথে) প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয় বলে মনে করা; 'ইশক্ ও মুহাব্বত, দিল্ (হৃদয়), সুকর্ (মাস্ত অবস্থা) ও আত্মভোলা অবস্থার ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ, আরেফ (জ্ঞানী) ও মা'রুফ (জ্ঞাত)-এর ঐক্য বা একাত্মতা এবং সবকিছুকে হক (সত্য তথা আল্লাহ সব কিছুতে বিরাজমান) গণ্য করা।[২২] মোদ্দাকথা, অনেক বুযুর্গ ও আরেফের আবির্ভাবের দৃষ্টিতে বিচার করলে তাসাউফের ইতিহাসে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[২৩]

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত ও শীর্ষস্থানীয় সুফীগণ হচ্ছেন আবু বাক্‌র শিবলী (মৃত্যু আনুমানিক ৩৩৪ থেকে ৩৪৫ হিজরীর মধ্যে (৯৪৫-৯৫৬ খ্রি.), আবু আলী রুদ্‌বারী (মৃত্যু ৩২২ হি. / ৮৩৩ খ্রি.), আল্ লুমা গ্রন্থের রচয়িতা আবুন্ নাসর সাররাজ তুসী (মৃত্যু ৩৭৮ হি./ ৯৮৮ খ্রি.), আবুল ফায্‌ল সারাখসী (মৃত্যু ৪০০ হি./ ১০০৯ খ্রি.), আবু আব্দুল্লাহ রুদবারী (মৃত্যু ৩৯৬ হিজরী) ও আবু তালেব মাক্কী (মৃত্যু ৩৮৫ হিজরী) সাররাজ তুসী রচিত

আল লুমা ছাড়াও হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত অপর উল্লেখযোগ্য তাসাউফ গ্রন্থ হচ্ছে, আবু তালেব মাক্কী রচিত কুয়াতুল কুলুব।[২৪] হিজরি পঞ্চম শতক এলমে তাসাউফ তথা অধ্যাত্মবাদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী ধারার দৃষ্টিকোণ থেকে এ শতাব্দির গুরুত্ব আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, 'শেইখ আলী হুজভিরী রচিত 'কাশফুল মাহজুব' (আবৃতের উন্মোচন) এবং খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী রচিত 'ছাদ মেইদান' (একশত ময়দান) ও 'মানযেলুস সায়েদীন' (পথ পরিক্রমণকারীর মানযিলসমূহ) এ শতাব্দীর বিখ্যাত তাসাউফ গ্রন্থ। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ গাযযালীর রচনাবলী পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এরফান ও তাসাউফের গতিধারা নিয়ন্ত্রণে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে।'[২৫]

ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক গ্রন্থাবলির রচনাকারকদের আবির্ভাবই এ শতাব্দির আলাদা ও বিশেষ তাৎপর্যের কারণ। মূলত এসব গ্রন্থাবলি সে সময়ের অধ্যাত্মবাদী সাধক ও সুফিদের স্বীয় চিন্তা-বিশ্বাসেরই লিখিতরূপ। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর আবির্ভূত উল্লেখযোগ্য সুফী ও আরেফ ছিলেন- 'শেখ আবুল হাসান খারাকানী (মৃত্যু ৪২৫ হি./১০৩৩ খ্রি.), আবু সাঈদ আবিল খায়ের (মৃত্যু ৪৪০ হি./১০৪৮ খ্রি.)- যিনি প্রথম রোবাঈ (চতুষ্পদী কবিতা) লেখক সুফী ও আবু আলী ইবনে সীনার সমসাময়িক, আবু আলী দাক্কাক নিশাবুরী (মৃত্যু ৪১২ বা ৪১৫ হি./১০২১ বা ১০২৪ খ্রি.)- যার উপাধি ছিল শেইখে নোওহেগার (শোকগাঁথা গায়ক পীর), আবুল হাসান আলী বিন ওসমান হুজভিরী (মৃত্যু ৪৭০ হি./১০৭৭ খ্রি.), খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী (মৃত্যু ৪৮১ হি./১০৮৮ খ্রি.)- যার উপাধি ছিল 'পীরে হেরাত' (হেরাতের পীর) ও আবু হামেদ মোহাম্মদ গাযযালী (মৃত্যু ৫০৫ হি./১১১১ খ্রি.)।'[২৬]

হিজরি ষষ্ঠ শতক তথা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক ও তৎপরবর্তী সময়ের কবিদের মধ্যে অধ্যাত্মবাদী অন্তর্দর্শী একটি ধারা সূচিত হয়। সানায়ী ও আত্তারের ন্যায় কবিগণ সাহিত্যে এ ধারার প্রবক্তা ও সূচনাকারী ছিলেন।[২৭] ইসলামের প্রাথমিক যুগে সূচিত হওয়া তাসাউফ ও এরফান তথা ইসলামি মরমিবাদ সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন দর্শনের মতবাদে জায়গা করে নেয়ায় এটি নিজেই একটি সুবিন্যস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। ফলে এভাবে দেখা যায় যে- 'অধিকাংশ ফার্সী কবি ও সাহিত্যিক হিজরী ষষ্ঠ শতকের (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক) পর ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক সুফীতাত্ত্বিক বিষয়গুলো তাঁদের ফার্সী সাহিত্যকর্মে অন্তর্ভূক্ত করেন। বিশেষ করে সাব্‌কে এরাকী (ইরাকী রীতি), সাব্‌কে হেন্দী (ভারতীয় রীতি) ও সাব্‌কে দোওরেয়ে বাযগাশত্ (পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসার যুগের বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগের সাহিত্য রীতি)-এর কবিগণ এশরাকী, এরফানী ও সুফী দর্শনের বিষয়গুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের সাহিত্য কর্মের কাঠামো নির্মাণ করেছেন। এ শতাব্দীতে এরফানের বঃিপ্রকাশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কবিতার সাথে-এর (এরফানের) সংমিশ্রণ। কবি সানায়ী গায্‌নাভী (ওফাত ৫৪৫ হিজরী./১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ) ব্যাপকভাবে এর সূচনা করেন এবং শেখ ফারীদুদ্দীন আত্তারসহ অন্য সুফীগণ তা অব্যাহত রাখেন। এ

পরিবর্তন তথা সুফীদের এ ভূমিকার বদৌলতেই ফার্সী সাহিত্যের কাঠামোতে সুফীবাদের পরিভাষাসমূহ ব্যবহৃত হতে থাকে। এসব পরিভাষার মধ্যে আছে: খারবাতে মুগান (পীরের পানশালা), মেইয়ে মুগান (মুগানের শরাব), মুগানে (মুগান ধরনের), পীরে আযরাক পুশ (নীল পোশাক পরিহিত বৃদ্ধ/পীর), খিরকাহ (লম্বা ঢিলাঢালা জামা বিশেষ যা দরবেশরা পরিধান করেন), সুফী, ফাকর্ (নিঃস্বতা) ইত্যাদি। এ চিন্তাধারা ইরান ও ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে "তাসাউফ ও এরফান" নামে পরিচিত।'[২৮]

হিজরি ষষ্ঠ শতকের এরফান ও তাসাউফ পর্যালোচনা করলে এতে হিজরি পঞ্চম শতকের তাসাউফের ধারাবাহিকতারই প্রতিফলন দেখা যায়। এ যুগে বিরাজমান ধর্মান্ধতা এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অনুপস্থিতি ছিল সুফীদের অন্যতম সমস্যা।[২৯] হিজরি ষষ্ঠ শতকের সোচ্চার আরেফদের অন্যতম ছিলেন আইনুল কুযাত্ হামেদানী। তাঁর রচনাবলীর ভিত্তি ও কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে, ইশ্ক (প্রেম); আইনুল কুযাতের রচিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে: যুব্দাতুল হাক্বায়েক, শেকওয়াউল গারীব (আরবী ভাষায়), রেসালেয়ে ইয়াযদান শেনাখ্ত্, লাওয়াইহ্, তামহীদাত্ এবং ফার্সী ভাষায় লেখা তাঁর পত্রাবলী।[৩০] খোরসানের এলাকায় এরফানের নির্ভুল পরিচিতি তুলে ধরা, ইরানের পার্বত্য অঞ্চলের এরফানকে- যা ছিল এরফানের একটি অপরিচিত শাখা-পরিচিত করা এবং এরফানী অভিষ্টতা, মাস্তানে ও আশেকানে (আত্মভোলা ও প্রেমিকসুলভ) তাসাউফের কারণে তাঁর রচনাবলী বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।[৩১]

হযরত আব্দুল কাদের গিলানী (জিলানী) ষষ্ঠ শতকের একজন প্রখ্যাত অধ্যাত্মবাদী সাধক। তিনি হিজরী ৪৭১ (১৯৭৮ খ্রি.) সালে ইরানের গিলানে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৫৬০ বা ৫৬১ (১১৬৪ বা ১১৬৫ খ্রি.) সালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন; তাঁর উপাধি ছিল 'শেখে মাশরেক' (প্রাচ্যের পীর) ও 'গাউছে গিলান' (গিলানের গাউছ)।[৩২] তাঁর বহু কারামাতের কথাও বর্ণিত হয়েছে যা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৩] শেখ সা'দী তাঁর 'গোলেস্তান' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে তাঁর ব্যাপারে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন।[৩৪] আব্দুল কাদের জিলানী বেশ কিছু গ্রন্থের প্রণেতার ছিলেন। যা অধ্যাত্মবাদ তথা ইরান ও ফারসি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে কবিতা এবং নসিহত উল্লেখযোগ্য। যেমন: আল্-গুনিয়াতুত্ তালেবে তারিকেল হাক, আল-ফাতুহুর রাব্বানী (৬২টি নসিহত), ফতুহুল গায়েব ৭৮টি নাসিহত, ইয়াওয়াকিতুল হিকাম, ফুয়ুযাতুর রাব্বানিয়্যাহ্ এবং একটি কবতিা সংকলন।[৩৫]

এ শতকের অধ্যাত্মবাদী সাধকদের মধ্যে রুযবেহানী বাকলী শিরাযী অন্যতম যিনি শেখে শাত্তাহ নামেও খ্যাত ছিলেন; তিনি হিজরী ৫২২ (১১২৮ খ্রি.) সালে ফাসায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলী হচ্ছে:

'আরায়েসুল বায়ান', 'মাকনুনুল হাদীস', হাকায়েকুল আখবার', 'শারহে শাতহীয়্যাত্,' 'আবহারুল আশেকীন,' এবং তাঁর ফার্সী কবিতাবলি।[৩৭]

শেখ নাজমুদ্দীন কোবরাও হিজরি ষষ্ঠ শতকের খ্যাতিমান অধ্যাত্মবাদী সাধকদের অন্যতম। উল্লেখ্য, তিনি নানাবিধ উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। 'তাঁর উপাধিসমূহের মধ্যে ছিল 'শেখে ওয়ালী তারাশ' ও 'তাম্মাতুল কোবরা'। তিনি হিজরী ৬১৮ (১২২১ খ্রি.) সালে মোগলদের (মোঙ্গল) হামলায় শহীদ হন। মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী তাঁর শাহাদাত স্মরণে একটি গযল রচনা করেন।'[৩৮] এ থেকেই ধারণা করে থাকেন যে, মাওলানা রুমীর পিতা শেখ নাজমুদ্দীন কোবরার মুরীদ ছিলেন। এছাড়া জামী তাঁর 'নাফাহাতুল উন্স' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শেখ নাজমুদ্দীন কোবরার নামানুসারেই কিবরূয়ে ফিরকাহ গঠিত হয়েছে।[৩৯]

এছাড়া ষষ্ঠ হিজরি শতকের শেষ দিকে এবং সপ্তম হিজরি শতকের গোড়ার দিকে এলমে তাসাউফের ইতিহাসে খ্যাতনামা আরো কয়েকজন সাধকের আবির্ভাব ঘটে; তন্মধ্যে, খ্যাতনামা কবি শেখ ফারিদুদ্দীন আত্তার, আবু হাফস সোহরাওয়ার্দী (হিজরী ৫৩৯-৬৩২/১১৪৪-১২৩৪ খ্রি.) যিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'আওয়ারেফুল মায়া'রেফ'-এর রচয়িতা, আওহাদুদ্দীন কেরমানী (মৃত্যু ৬৩৫ হি./১২৩৭ খ্রি.) ও ইবনে ফারেস মেসরী (ওফাত ৬৩২ হি./১২৩৪ খ্রি.) তাঁদের অন্যতম।[৪০]

হিজরি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক এ কারণেও তাৎপর্যপূর্ণ যে, এ শতকেই তাসাউফের ইতিহাসের সর্বাধিক আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ দুজন তাত্ত্বিক মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী ও মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী'র আবির্ভাব ঘটে। এ কথা বলা আবশ্যক যে, 'ইবনুল আরাবীর দৃষ্টিভঙ্গি সেই যুগে ইবনে ফারেয, মৃত্যু ৬৩২ হিজরী (১২৩৪ খ্রি.), মাওলানা রুমী মৃত্যু ৬৭২ হিজরী (১২৭৩ খ্রি.), ফাখরুদ্দীন ইরাকী মৃত্যু ৬৮৮ হিজরী (১২৮৯ খ্রি.) প্রমুখের ওপর বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে এবং ফলশ্রুতিতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভাবধারার বিশাল ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। ইবনুল আরাবীর আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'নাফস' প্রসঙ্গ- যা সাহিত্যের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং হিজরী ৬২৭ সালে তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুসুসুল হিকাম' রচনা করেন; এটি ইসলামী জাহানে সুফী ধারার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।'[৪১]

আমরা যদি ইরানে তাসাউফের গুরুত্ব ও তার বিস্তার নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে দেখব যে, হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতক হচ্ছে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।[৪২] সপ্তম হিজরীর শুরুতে ইরানে মোঙ্গলদের হামলার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং ইরান ভূখণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান অস্থিরতা ও আতঙ্কজনক অবস্থাই ছিল বড় বড় সুফী ও মাশায়েখের প্রতি জনগণের ঝুঁকে পড়া এবং ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস স্থায়ী ও মজবুত হওয়ার ব্যাপারে তাদের চেষ্টা-

সাধনার অন্যতম প্রধান কারণ।[৪৩] আর হিজরি ষষ্ঠ শতকে ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার সূচনা ও তাৎপর্যের বিষয়টি পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে,

'ষষ্ঠ শতকে (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) ইরানে যে সামাজিক অবস্থা এবং শাসকের রাজনৈতিক কাঠামো এমন কতকগুলো উপাদানে পরিণত হয়েছিল যা বিস্তৃতভাবে এরফানকে একটা শৈল্পিক রং দান করে এবং সুফী ও আরেফগণ কবিতার ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মহান আধ্যাত্মিক কাব্য চর্চার দিকে অগ্রসর হয়। এই প্রক্রিয়া বা ধারা কেবল তাসাউফের উন্নতির কারণেই হয়নি, বরং ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যেও বিশেষ সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল এবং ফার্সী সাহিত্য ও কাব্যে যুক্ত হয়েছিল আধ্যাত্মিক ভাবধারা, অর্থ, ভাবার্থ ও তাৎপর্য, বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়ের এক বিশাল সংগ্রহ। যার ফলশ্রুতিতে ফার্সী সাহিত্যে এক নতুন কাঠামো বা আকৃতি প্রদান করা হয়েছিল এবং যাকে বিশেষ দরবারী সাহিত্যের কাঠামো থেকে বের করে আনা হয়।'[৪৪]

ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ, প্রসার ও বিকাশ

মধ্যযুগের ফারসি সাহিত্যে চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। আর এ উৎকর্ষতাই ফারসি সাহিত্যে উত্তরোত্তর বিকাশ সাধন করে এবং এর প্রসারের পথকে অধিকতর সুগম করে তোলে। ফলে ফারসি সাহিত্যে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়। 'মধ্যযুগে ফারসি সাহিত্য উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছে। এ যুগে আবুল কাসেম ফেরদৌসী, ফারসি ভাষায় শাহনামা রচনা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছড়ান। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ওমর খইয়াম, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, হাফেজ সিরাজি, জালাল উদ্দিন রুমি প্রমুখের ন্যায় বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতিমান কবিদের আগমন ঘটে।'[৪৫] এসময় বিশেষত ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখায় অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক কবিতা রচনার দ্বারা পারস্যের কবিগণ বিশেষ সবিশেষ খ্যাতির অধিকারি হন। আর ফারসি সাহিত্যের উৎকর্ষ, বিকাশ ও প্রসারে এ অধ্যাত্মবাদী কাব্য ধারা এবং এঁর রচয়িতা কবিগণই সবচেয়ে অগ্রগণ্য। 'আরবী সাহিত্যের মতো ফারসী সাহিত্যের কাব্য শাখাই সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইরানীয় ভূখণ্ডে ইসলামি শাসন কায়েম হয় তখন থেকেই ফারসি সাহিত্যের নবজন্মের সূত্রপাত হয় এবং কবি-সাহিত্যিকগণও নব উন্মাদনায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ফারসি সাহিত্যের আসলরূপ ইসলামীয় শাসন আমল থেকেই আরম্ভ হয় বলা চলে।'[৪৬] অধ্যাত্মবাদী কাব্য ধারার কবিগণের মধ্যে শীর্ষেই রয়েছেন আবু সাঈদ আবুল খায়ের, হাকিম সানায়ী গাযনাবী, ফরিদুদ্দিন আত্তার, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি, হাফেজ শিরাজি, আল্লামা আবদুর রহমান জামি প্রমুখ।

'এসব নামের মাধ্যমেই ফার্সীর প্রথম দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়। এরাই ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের রাজাধিরাজ, এরাই ছিল এর সুউচ্চ দৃঢ় শিখর, এই বাগানের চিরসবুজ ফুল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ফার্সী সাহিত্যে সর্বজনগ্রাহ্য

বিষয়গুলোর মধ্যে সুনিশ্চতভাবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, এর খ্যাতি ও বিস্তারের ব্যাপকতা প্রধানত ক্লাসিক কবিতার কাছেই ঋণী।'[৪৭]

ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত। ফারসি সাহিত্যের বিস্তৃতি, বিকাশ, উৎকর্ষ ও প্রসারে ফারসি সাহিত্যের সমৃদ্ধ কাব্য শাখায় অধ্যাত্মবাদী ধারার শ্রেষ্ঠতম কবিগণের মূল্যবান সাহিত্যকর্ম যুগ যুগে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও অনসৃত হয়ে আসছে। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব কাব্যকর্মের ভাব প্রয়োগে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যমোদীদের দ্বারা রচিত হয়েছে অগণিত গ্রন্থ এবং ফারসি অধ্যাত্মবাদী ধারার রচনা শৈলীর অনুবাদও হয়েছে। এসবের ফলে ফারসি কাব্য সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী ধারার কবিদের সুখ্যাতি ও এর প্রচার-প্রসার অধিকতর উচ্চ মার্গে পৌঁছে যায়।

ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখার যুগশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি-আবু সাঈদ আবুল খায়েরের গুরুত্ব ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার সূচনাকারী ও অধ্যাত্মবাদ নামক বীজের অঙ্কুরোদগমকারী হিসেবে; অন্যদিকে এর উৎকর্ষ, বিকাশ ও প্রসারে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে যাঁরা খ্যাত তাঁরা হলেন যথাক্রমে-শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার নিশাবুরী ও মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি। ফারসি সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদের সূচনা, উৎকর্ষ, বিকাশ ও প্রসারে তাঁদের ভূমিকা এবং আধ্যাত্মিক দর্শন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

আবু সাঈদ আবুল খায়ের (মৃত্যু ৪৪০ হি. / ১০৪৮): আধ্যাত্মিক দর্শন ও রুবাঈ

``The first poet of note in the Sufi movement was Abu Said ibn Abil Khayer (A.D. 968-1049), who revived and popularized the quatrain as a verse form and established its position as a common vehicle of mystical thought. He also laid the foundation of that system of metaphors and symbols familiar in the work of his successors, which uses the earthly and bodily pleasure to describe Divine Love and which, for lack of a better, has been employed to a greater or less extent by all believers in the love of a Diving Being. Its limitation are seen in Rabbinical and early Christian literature, which abounds in curiuously anthropomorphic pictures of the God-head, but nowhere does symbolism take such strange forms as in Sufi poetry, where love, wine and beauty are all brought into service to picture the relationship between God and man.''[৪৮]

আবু সাঈদ আবুল খায়েরের জন্ম ও বংশ পরিচয়

আবু সাঈদ মাহনা নামে প্রসিদ্ধ ফাযলুল্লাহ ইবনে আবুল খায়ের ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতকের আরেফ ও মুহাদ্দেস।[৪৯] তিনি হিজরী ৩৫৭ সালের মুহররম মাসে রবিবার জন্মগ্রহণ করেন।[৫০] আবু সইয়'দ ফজলুল্লাহ্ খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত খাওয়ারান জিলার প্রধান নগরী মায়হানাতে ৩৫৭ হিজীরির ১লা মহরম [৯৬৭ খ্রী: ৭ই ডিসেম্বর] জন্মগ্রহণ করেন।[৫১] তাঁহার পিতার নাম আবুল খায়ের কিন্তু বাবু বু'ল-খয়ের নামেই সমাজে পরিচিত ছিলেন।[৫২] দৃশ্যত তার পিতা সুফীতাত্ত্বিক ও দরবেশ প্রকৃতির লোক ছিলেন।[৫৩] তিনি ধর্মভীরু ও ভক্ত ছিলেন, ইসলামের শরিয়ত ও তরিকতের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচিত ছিলেন।[৫৪] এবং সুলতান মাহমুদের সহিত তার ওঠাবসা ছিল।[৫৫]

আবু সাঈদ আবুল খায়েরের বংশ পরম্পরা সম্পর্কে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, আবু সই'য়দ পীর পরম্পরায় হযরত মুহম্মদ (দঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।[৫৬] আবু সই'য়দের সুফী সিজরা-[৫৭]

হযরত মুহম্মদ (দঃ)

।

হযরত আলী (৬৬১ খ্রীঃ)

।

হাসান বসরী (৭২৮ খ্রীঃ)

।

হাবীব আজমী (৭৩৭ খ্রীঃ)

।

দায়ুদ তাই (৭৮১ খ্রীঃ)

।

মারুফ কারখী (৮১৫ খ্রীঃ)

।

সরী সক্বতী (৮৬৭ খ্রীঃ)

।

জুনায়েদ বাগদাদী (৯০৯ খ্রী ঃ)

।

মুরতায়েশ বাগদাদী (৯৩৯ খ্রীঃ)

।

আবু নসর আল সররাজ তুসী (৯৮৮ খ্রীঃ)

।

আবুল ফসল হাসান সরখী

।

আবু সাঈদ আবিল খায়ের

আবু সাঈদের আধ্যাত্মিক জীবন ও দর্শন

আবু সাঈদ শৈশবেই পিতার সঙ্গে দরবেশদের সামা'র[৫৮] মজলিসে যোগ দিতেন।[৫৯] তিনি খাজা আবু মুহাম্মদ আইয়ারীর কাছে কুরআন শিক্ষা করেন।[৬০] তিনি আবুল কাযেম বাশার ইয়াসীনের সান্নিধ্যে গিয়ে তাসাউফের সঙ্গে পরিচিত হন।[৬১] বিশরের নিকটই তিনি নিষ্কাম প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এই নিষ্কাম প্রেমই সুফী ধর্মের ভিত্তি।[৬২] আবু সাঈদ মার্ভে আবু আব্দিল্লাহ আল হিযরীর কাছে ফিকাহশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন।[৬৩] উত্তরকালে আবু সাঈদ ফিকাহ শাস্ত্রের একজন দক্ষ পণ্ডিতে পরিণত হন। এরপর তিনি সারাখস শহরের পীর আবুল ফাযল হাসানের সন্ধান লাভ করে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। 'আসরারুত তাওহীদ' গ্রন্থে মুহাম্মদ মুনাওয়ারের ভাষ্য অনুযায়ী আবু সাঈদের যা কিছু ছিল সবই পীর আবুল ফাযলের কাছ থেকে পাওয়া।[৬৪] আবু সাঈদের যাবতীয় জ্ঞানগত মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি তাঁর কাছেই ঋণী।[৬৫] উত্তরকালে আবু সই'য়দ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গেই আরোহণ করেছিলেন।[৬৬] মুহাম্মদ বিন মুনাওয়ারের 'আসরারুত তাওহীদ' মারফত আরো জানা যায় যে, তিনি আবদুর রহমান সুলামীর কাছ থেকে খিরকা (খেলাফত) লাভ করেন।[৬৭] আবু সাঈদ মাহনায়, তারপর কিছুদিন নিশাপুরে আধ্যাত্মিক সাধনা এবং লোকজনকে পথনির্দেশনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৬৮]

‘আসরার লেখক মুহম্মদই বুল মুনাবারের পিতামহ আবু সই’য়দের পৌত্র শেখুল ইসলাম আবু সই’য়দের সনদ অনুসারে লিখিয়াছেন। আবু সাঈদ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করেন। সুদীর্ঘকাল কঠোর যোগাভ্যাসে ও আধ্যাত্মিক ব্রত উদযাপনের ফলে শিক্ষানবিশীকালে যে দিব্য দর্শন ও দিব্যোন্মাদনা মাঝে মাঝে লাভ করিতেন তাহা স্থায়ীরূপে আধ্যাত্মিক আলো হইয়া দেখা দিয়াছিল।’[৬৯]

তাঁর কঠোর যোগাভ্যাসের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন তার উক্তি হিসাবে বর্ণিত আছে যে, ‘দৃষ্টিশক্তিতে অন্ধ ছিলাম, শ্রবণশক্তিতে বধির ছিলাম, বাকশক্তিতে বোবা ছিলাম, এক বছরকাল কারো সাথে কথা বলিনি।[৭০] আমাকে পাগল নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৭১] ‘আমার একটি সাধনা প্রকোষ্ঠ ছিল, আমি তাহাতে উপবেশন করিয়া আত্মভোলা হইয়া পড়িতাম, আধ্যাত্মিক আলো প্রাপ্ত হইতাম এবং আমার নিজের আত্মসত্তার অন্ধকার বিদুরিত করিয়া দিত।’[৭২] তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শনের মূলকথা হচ্ছে, কৃচ্ছ্রতা, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আনন্দের মাধ্যমে সংঘাত পরিহার, সত্য ছাড়া অন্য কিছু না দেখা এবং আত্মাভিমান পরিহার করা।[৭৩] আর কৃচ্ছ্রতা সাধনার গুরুত্বটা নিহিত রয়েছে ইন্দ্রিয়ের কামনা-বাসনাকে অবদমিত করার মধ্যে।[৭৪]

‘আবু সাঈদ সর্বদা এই কথাগুলি জপ করিতেন।

প্রিয়তম বিনে আমার শান্তি নাই,

আমার প্রতি তোমার হৃদয়তা

আমি গণনা করিতে পারি না।

যদিচ আমার দেহের প্রতিটি কেশ

জিহ্বায় পরিণত হয়,

তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার

সহস্রাংশের এক অংশও প্রকাশ পায় না।

তিনি বলিয়াছেন, ‘ইহা মঙ্গলময় অনুগ্রহ আনয়ন করিয়াছিল। উহার ফলে শৈশবে আমার নিকট আল্লাহ্‌র রাস্তা উন্মুক্ত হইয়াছিল।’[৭৫]

আবু সাঈদের জীবনাবসান

তিনি ৮৩ সাল ৪ মাস জীবনকাল অতিবাহিত করার পর ৪৪০ হিজরীর শাবান মাসের কোনো এক বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন।[৭৬] সুদীর্ঘ জীবনকালে ফারসী সাহিত্যে রেখে গেছেন তিনি অমূল্য সম্পদ।[৭৭]

আবু সাঈদ আবুল খায়েরের আধ্যাত্মিক রোবাঈ

মরমী রুবাঈ ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিক ধাঁচের কবিতা রচনার ভিন্ন একটি খাত যা আবু সাঈদ আবুল খায়েরের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। আবু সই'য়দ বলিতেন যে প্রায় ৩০ হাজার কবিতার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন।[৭৮] এ সম্পর্কে ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

'খোরাসানী রচনাশৈলীর একজন অন্যতম কবি ও সুফীবাদী চতুষ্পদী কবিতার রচয়িতা হলেন আবু সাঈদ আবিল খায়ের। তিনি আনুমানিক ৭২০টি রোবাঈ (চতুষ্পদী কবিতা) রচনা করেন। তবে তাঁর কবিতার ভাষা প্রাচীন পদ্ধতির। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তাঁর অনেক প্রেম ও এরফান বিষয়ক রোবাঈ রয়েছে। আর সাহিত্যের দিক থেকেও তাঁর কবিতাগুলো মনে হয় সহজ-সরল এবং সাহিত্যালঙ্কার থেকে মুক্ত। অধিকাংশ ইরানী সুফী রোবাঈ রচনার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তন্মধ্যে আবু সাঈদ আবুল খায়েরের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা, তিনি মরমী রোবাঈ রচনা করেন, এমন কি সানায়ীর পূর্বেই আরেফদেরকে ফার্সী কবিতার আঙ্গিনায় উপনীত করেন।'[৭৯]

আবদুস সাত্তার বলেন,

'তাঁর কাব্য-ভাবনায় সূফীবাদ প্রকট এবং প্রত্যেকটি 'রুবাই' যেন এক একটি মুক্তো খণ্ডের মতোই উজ্জ্বল। তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিক স্পর্শ ছাড়াও রয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের আর্তি। তাঁর বিভিন্নধর্মী কয়েকটি রুবাইয়াতের অনুবাদ এইরূপ:

১. চোখ

আমার দুচোখ জুড়ে তোমার দৃষ্টির ছায়া আছে,
তাই চোখ ভালোবাসি তোমোকে যে পেয়ে এতো কাছে,
কি করে পৃথক করি তোমাকে আমার চোখ থেকে
চোখ যাক, তুমি থাকো–খুশীতে আমার প্রাণ নাচে।

২. আত্মা

সকালের মৃদু হাওয়া এনেছে আত্মায় ঘ্রাণ,
এই ঘ্রাণ খুঁজে ফিরে কোথায় রয়েছে তব প্রাণ;
ভুলে গেছি সব আমি এ হৃদয়ে নেই কিছু আর,
ঘ্রাণেই পেয়েছি সব, আমি তাই পেয়েছি যে ত্রাণ।

৩. চালক

আল্লাহ্, পাঠাও তুমি, বিশ্বের চালক একজন---
এবং পাঠাও মশা; নমরুদ সবাই এখন;
অত্যাচারী ফেরাউন এখানের প্রতি ঘরে ঘরে
নীল নদ আজো আছে, এখন মূসার প্রয়োজন।

৪. ঝাড়ু

সমাজের ময়লা নিতে শক্ত এক ঝাড়ু দরকার,
হাতুড়ির প্রয়োজন উঁচুনীচু এক করবার;
কতকাল দেখি বলো একঘেয়ে এই রীতি-নীতি?
কেয়ামত ছাড়া বুঝি হবে নাকো উত্থান আবার।'[৮০]

তাঁর রুবাঈর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এসেছে,

'তাঁর রূবাঈর অপরাপর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে, প্রেম, দাসত্ব, ও স্বাধীন চেতনার মধ্যখানে সম্পর্ক ও সংযোগ। সম্ভবত তা কাসসাব আমুলীর উক্তি থেকেই নেয়া হয়েছে।[৮১] যাতে তিনি বলেছেন যে, 'যতক্ষণ আযাদ না হও, ততক্ষণ বান্দা হবে না।'[৮২]

"স্বাধীনতা ও প্রেম যেহেতু একীভূত হয় না
দাস হয়ে গেলাম তাই, ছেড়ে একদিকে কামনা।
এরপর থেকে যেভাবে উচিত ভালোবাসে আমাকে
কথা ও শত্রুতা বিদায় নিল মাঝখান থেকে।"[৮৩]

আবু সাঈদ আবুল খায়েরের সাহিত্যকর্ম ফারসি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর জীবন ও বক্তব্য সম্পর্কে উত্তরকালে তাঁর নাতিরা বাস্তব বর্ণনা ভিত্তিক কিছু পুস্তক রচনা করেন; যেগুলো ফারসি সাহিত্যে ইরানি গল্পসাহিত্যের পর্যায়ভূক্ত। এগুলোকে বস্তুনিষ্ঠ কাহিনীও বলা হয়। 'আসরারুত তাওহীদ'ও এর প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ। আবুল খায়েরের নাতিদের মাধ্যমেই ফারসি সাহিত্যে তাঁর অবদান লিখিত আকারে এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।

শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার (মৃত্যু ৬২৭ হি./ ১২২৯ খ্রি.): আত্মদর্শন ও কাব্যবৈশিষ্ট্য

'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে মার্জিত ও সংযত সূফীমত মহাকবি সা'ধীতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, আত্তারে তাহার সূচনা। এই সময়ে ভাবী উন্নত সুফীমতের যে চর্চারাম্ভ হয়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে উহা পরিপুষ্ট হয়। তাহারই উজ্জ্বলতম সৃষ্টি হাফিয, জালালউদ্দীন রুমী ও আবদুর রহমান জামী।'[৮৪]

শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের জন্ম ও পরিচয়

সুফি কবি ও দার্শনিক শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার ফারসি সাহিত্যের কাব্যাকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সালজুকী শাসনামলে (১০৩৯-১১৫৭ খ্রি.) ইরানের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, এ যুগের খ্যাতিমান দার্শনিক ও কবি শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার।[৮৫] শেখ ফারিদুদ্দীন আত্তার (মৃত্যু ৬২৭ হি./১২১৯ খ্রি.) ছিলেন এমন গযল রচয়িতা যার গযল আধ্যাত্মিক গীতিকবিতায় পরিবর্তনের নমুনা।[৮৬] আবু তালেব মুহম্মদ ফরিদউদ্দীন আত্তার নিশাপুরের এক আতর ব্যবসায়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৭] অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, 'তাঁহার পূর্বপুরুষেরা নিশাপুরের পুগগাঁ নামক গ্রামে বসবাস করিতেন। তাঁহার পিতা ইব্রাহীম বিন ইসহাক আতরের ব্যবসা করিতেন।'[৮৮] তাঁর পিতা তৎকালীন সময়ের একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও ঔষধ বিক্রেতা ছিলেন।[৮৯] আত্তারের জন্ম তারিখ সম্পর্কে ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আত্তার ষষ্ঠ হিজরী শতকের দ্বিতীয় শতকে (৫১৩ হি./১১১৯ খ্রি.) নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[৯০] ফারসী সাহিত্যের কালক্রম গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম নিশাপুরে।[৯১] খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তারের প্রকৃত নাম মুহম্মদ।[৯২] আবদুস সাত্তার বলেন, তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ ইব্রাহীম।[৯৩] আত্তারের প্রকৃত নাম 'মোহাম্মদ'।[৯৪] তাঁর পুরোনাম ফরিদ উদ্দীন হামিদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইব্রাহীম বিন ইসহাক আত্তার কাদকানী নিশাপুরী।[৯৫] তবে তিনি আত্তার নামেই সমধিক পরিচিত।[৯৬] 'আত্তার' অর্থই ভেষজবিজ্ঞানী।[৯৭] ফরিদুদ্দীন তাঁহার লকব।[৯৮]

ফরিদুদ্দিন আত্তারের জীবনাবসান

৬২৭ হি./ ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে নিশাপুরে আত্তারের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা যায়। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ বলেন, 'আত্তারের জীবনকুসুম এইখানে উন্মেষিত হয় এবং নানা দিগ্দেশে সুরভি বিতরণ করিয়া পরিশেষে আবার এইখানেই বৃন্তচ্যুত হয়।'[৯৯] লুতফী আলী বেগের 'আতশ কদা' অনুযায়ী আত্তার দীর্ঘজীবী প্রাপ্ত হন এবং একশত চৌদ্দ বছর জীবিত ছিলেন।[১০০]

আত্তারের শিক্ষা, ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্মিক দর্শন ও সাহিত্যকর্ম

আত্তারের শিক্ষা এবং তাঁর জীবনে ধর্মবোধের অঙ্কুরোদগম সম্পর্কে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ বলেন, 'শৈশব হইতেই আত্তারের জীবন গভীর ধর্মভাবে প্রণোদিত ছিল। কৈশোর হইতেই ত্রয়োদশ বৎসর তিনি শিক্ষা ব্যপদেশে ইমাম রেযা নামক জনৈক সিদ্ধ তাপসের দরগাহে অতিবাহিত করেন।'[১০১] অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, 'প্রকৃত ব্যাপার এই যে তিনি আশৈশব বৈরাগ্যপ্রিয় ছিলেন। তিনি দীনবন্ধু ছিলেন। তিনি তদীয় পিতার শিষ্য কুতুবুদ্দিন হায়দারের শিষ্য ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত রাজদুত ছিলেন এবং ৫৯৭ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তখন আত্তারের বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। আত্তার বাল্যকালেই সুফী সাধনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। (দৌলত শাহ দ্রষ্টব্য)।'[১০২] কর্মজীবনে আত্তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পিতার পেশা গ্রহণ করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।[১০৩] এ পেশায় অবস্থান করেই তিনি আধ্যাত্মিক রহস্য সম্বলিত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন।[১০৪] আবদুস সাত্তার আত্তারের সুফি জীবনে প্রবেশ এবং সুফি জীবনে উন্নতি সাধন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

'তাঁর সূফী জগতে প্রবেশের মূলে প্রখ্যাত সূফী-সাধক শায়েখ রোকন উদ্দীনের প্রভাব অনস্বীকার্য। শায়েখ রোকন উদ্দীনের সাহচর্যেই তিনি সূফী সাধকে উন্নীত হন। জানা যায়, যখন তিনি সূফী জগতে প্রবেশ করেন তখন জাগতিক চিন্তা এবং ব্যবসায় পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছিলেন। সূফীতত্ত্বের কাব্য ক্ষেত্রে তিনি সানাই এবং রুমীর সমতুল্য।'[১০৫]

রুমীর উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুস সাত্তার আরো বলেন,

আত্তার রূহ বুদ উ সানাই দুচশ্ম-ই-উঁ,

মা আজ পে ই সানাই উ আত্তার আমাদিঁ।

'অর্থাৎ সূফীজগতে কিংবা সূফীদেহে আত্তার আত্মাস্বরূপ এবং সানাই দুটো চক্ষু। আর আমার স্থান এদের পরে।' সূফীজগতে কতটা উন্নত হলে মওলানা রুমীর মতো সূফী-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এমন মন্তব্য করতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়।[১০৬]

আত্তারের এই আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধান লাভ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, "আখবারে তাজকেরা" গ্রন্থে একটি ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে: এক দিবস খাজা ফরিদুদ্দীন স্বীয় দোকানে উপবেশন করিয়া আছেন, হঠাৎ এমন সময় তথায় জনৈক ফকির আসিয়া উপনীত হন। বহুক্ষনাবধি তাঁহার দোকানের আসবাবপত্রাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে খাজা সাহেব অতিশয় বিরক্ত হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করার অনুযোগ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতে চাহিলেন। তদুত্তরে সেই ফকির বলিলেন, 'আপনার বিষয়ে আপনি দৃষ্টি রাখুন। আমার এই গমন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। আমি সত্বরই যাইতেছি।' এই কথা বলিয়া তিনি তথায় শায়িত হইলেন। খাজা সাহেব আসিয়া দেখেন তাঁহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনা তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দোকানের সমস্ত দ্রব্য চতুর্দিকে বিতরণ করিয়া ফকিরী অবলম্বন করিলেন। মৌলানা শিবলী এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন যে দুঃখের বিষয়, জীবন চরিত রচয়িতারা আত্তারের রচনাবলী পাঠ করেন নাই। কেননা তাঁহার গ্রন্থসমূহেই দেখিতে পাওয়া যায় সুফী দলভুক্ত হইবার পর, তিনি 'আসার' এবং 'আরেফীন' গ্রন্থ রচনা করেন। 'মসীবতনামা' এবং 'ইলাহীনামা' তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ।'[১০৭]

আত্তারের অপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হলো-'রিয়াজুল আরফীন' (সৌন্দর্যের বাগান), 'লিসানুল গায়্যাব' (অদৃশ্য জিহ্বা), 'মাদহারুল আজায়েব' (আশ্চর্যের প্রকাশ)।[১০৮] আত্তারের কাব্যে দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইসলামি ঐতিহ্য এবং কাব্যশিল্পের বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।[১০৯] শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার ফারসি সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার রচনাশৈলীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে এক বিশাল-বিস্তৃত স্থান দখল করে আছেন। আধ্যাত্মিক গযল ও মসনভি রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। আত্তারের আধ্যাত্মিক রচনাবলির সম্পর্কে ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

'তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক মাসনাভী ও গযল যেমন 'মানতেকুত তায়ের' রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে একটি পরিবর্তন এন দেন যা পরবর্তী শতকে মাওলাভীর (মওলানা জালালুদ্দীন রুমী) ন্যায় অনেকের নিকট সাদরে গৃহীত হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক গদ্যশৈলীও 'তাযকেরাতুল আউলিয়া' শীর্ষক গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে মাসনাভী আদলে রচিত কাব্যগ্রন্থ হলো 'মুসবাত নামে' (দুঃখ-যন্ত্রণার গাথা), 'এলাহী নামে' (স্বর্গীয় গাথা), 'মানতেকুত তায়ের' (পাখিদের কথোপোকথন বা সংলাপ), 'খোসরু নামে' এবং রোবাঈ সংকলন হলো 'মুখতার

নামে'। উল্লেখিত মাসনাভীগুলোতে ফারিদুদ্দীন আত্তারের কাব্যরীতি, শিল্পকলা ও সাহিত্যালঙ্কার থেকে মুক্ত রয়েছে, যদিও এগুলোর কিছু শ্লোকে সাহিত্যালঙ্কার দেখতে পাওয়া যায় যা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, সুফী ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করার কারণে তিনি কবিতার গঠন ও আকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং তাঁর নিকট যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো কবিতার এরফানী অর্থ ও বিষয়।'[১১০]

জীবনের সুদীর্ঘ অংশ তিনি ব্যয় করেছেন সূফীদর্শণ ভারাক্রান্ত কবিতা লিখে। তাঁর অসংখ্য কবিতা বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিজাম-ই-আরোদীর 'চাহার মাকালা' অন্যতম।[১১১] সাবলীলতা ফরিদুদ্দিন আত্তারের কবিতাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভাষাগত সাবলীলতা ও রূপকধর্মী বর্ণনা তাঁর কবিতাগুলোকে ঐশ্বর্য দান করেছে। যা ফারসি সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবস্থান তৈরি করেছে। 'পাখিদের কথোপোকথন' নামক এক রূপক গল্পে, ইরানের কবি আত্তার, পাখিদের গল্প বর্ণনা করেন।[১১২] তাঁর 'মানতেকুত তায়ের'-এর গল্পটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি এরকম-

'পাখিরা 'কাফ' পর্বতের অপর পাশে বসবাসকারী তাদের 'সিমোরগ-এর অনুসন্ধানে বের হয়। এদেরকে সাতটি উপত্যকা (শর্ত) অতিক্রম করতে হয়– অনুসন্ধান, প্রেম, বোধশক্তি, বিচ্ছিন্নকরণ, ভাবসম্মেলন, বিস্ময়, মিলন। রাজার অনুসন্ধানে বহির্গত পাখিদের মধ্যে মাত্র ত্রিশটি পাখি (ফারসি ভাষায় 'সি' মানে ত্রিশ এবং 'মোরগ' মানে 'পাখি' গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। বাকিরা রাস্তায় ধ্বংস হয়ে যায়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর ত্রিশটি পাখি রাজার উযীর দ্বারা পরীক্ষিত হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এদের জন্য প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করা হল। এরা প্রবেশ করে শান্তি পেল এবং বুঝতে পারল যে, তারাই 'সিমোরগ' (স্রষ্টা) এবং 'সি মোরগ' ত্রিশটি পাখি ছাড়া অন্য নহে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এরা তখন নিজেদের আদি অস্তিত্ব পেল।'[১১৩]

তাঁর কবিতার সাবলীলতা এমনভাবে উপস্থাপিত যে, কোনো সাধারণ ব্যক্তি তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম।[১১৪] এ প্রসঙ্গে ড. আহমাদ তামীমদারী বলেন,

'তাঁর কবিতা সহজ-সরল বাক্য-বিন্যাসে ও সাধারণ মানুষের কথোপোকথনের ভাষায় রচিত-যাকে সুফী কাব্য সাহিত্যের ঐতিহ্যগুলোর একটি বলে গণ্য করা যায় হয়। আত্তার ছিলেন সে ঐতিহ্যধারারই অনুগামী। মনে হয় তিনি খোরাসানী প্রাচীন ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং বিশেষ করে তাঁর মাসনাভীগুলাতে এর পৌনঃপুনিক ব্যবহারও একবারে কম নয়। তাঁর 'মানতেকুত তায়ের' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি হলো এরফানী ও প্রতীকাশ্রয়ী সাহিত্যের পরিপূর্ণ নিদর্শন। 'মানতেকুত তায়ের'-এর বর্ণনা ও কাহিনীগুলো বাহ্যিক আকৃতিতে এক প্রকারের কাহিনী, বর্ণনা ও উদ্ধৃতি বটে, তবে এর অন্তর্নিহিত অর্থে তা হলো শৈল্পিক গভীরতা-আধ্যাত্মিক ও সুফী

মতাদর্শ বিষয়খ শিক্ষা। প্রথমে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয় তুলে ধরেছেন, অতঃপর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য উপমাভিত্তিক কাহিনীগুলো অবতারণা করেন-যা এগুলোর চূড়ান্ত কাঠামো, আর এই আলোচ্য কাঠামোটি এরফানী শিক্ষাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিষ্কার করে দেয়। আত্তার পশু-পাখিদের ব্যবহার করেছেন মূলথ মানব জাতির ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীকে প্রতিভাত বা ফুটিয়ে তোলার জন্য।

তাঁর দীভানে (কাব্য সমগ্র) তিন ধরনের গযল তথা প্রেমময়, আধ্যাত্মিক ও দরবেশীসুলভ (কালান্দারানে) গযল বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর দরবেশীসুলভ গযল প্রকৃতপক্ষে এক প্রকারের আধ্যাত্মিক গযল যা মতানৈক্য ও মতবিরোধকে অবলম্বন করেই সামাজিক, ধর্মীয় ও চারিত্রিক পরিচয় ও নিয়ম তুলে ধরার মাধ্যমে রচিত হয়েছে। ধর্মহীনতা প্রদর্শন, খ্রিস্টানদের প্রতি ভালোবাসা, শরাবপান (দুঃখ-বেদনার উপশম) ইত্যাতি হলো এ গযলগুলোর বিষয়বস্তু এবং এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, ফারিদুদ্দীন আত্তার 'মালামাতিয়ে তারীকে' কে পছন্দ করতেন।'[১১৫]

তাঁর কিছু প্রতীকী ভাবধারার গযল রয়েছে, যেগুলো কেবল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যেতে পারে।[১১৬] যেমন এই জগত তারই সৌন্দর্যের প্রতিভাস, নফসের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ও প্রেমাস্পদের ইচ্ছার সামনে আত্মবিলীন করে দেয়া, দুনিয়ার বন্ধন ও মোহজাল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি।[১১৭] আত্তার গযলে আধ্যাত্মিক পরিভাষাগুলোর প্রতীকী রূপ দেয়া ছাড়াও গযলের সামগ্রিক কাঠামোতে তাঁর চিন্তাধারারও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।[১১৮] তবে এসব কবিতায় তাঁর চিন্তধারার উপজীব্য বিষয় এক ধরনের মানসকেন্দ্রিকতা ও নির্জনতার অনুসঙ্গ।[১১৯] তাঁর এ জাতীয় গযলের একটি উদাহরণ:

বন্ধুর প্রতি

সে আমাকে বলেছে একাকীঃ

'আত্মার জাগ্রতকারী সাধক-প্রবর

অযথা ঔষধ নিয়ে রাতদিন ব্যস্ত থাকো তুমি।

ঔষধ দেহের ব্যাধি নিরাময় করে-

কবিতা ও জ্ঞান জেনো আত্মার খোরাক।'[১২০]

আত্তার তাঁর কবিতায় ভণ্ড সাধু ও ইমামদের তীর্যকভাবে আক্রমণ করেছেন। তাদেরকে লোক দেখানো কপট সাধু বলে তিরস্কার করেছেন এবং তিনি তা করেছেন নির্ভয়ে। এ পর্যায়ে আত্তারের গযলে বর্ণনার শক্তিমত্তা ও অনাবিল অসংকোচ প্রকাশের নমুনা তাঁর গযলে খুঁজে পাই।[১২১]

ভণ্ড ইমামদের প্রতি আত্তার–

হে ইমাম, আমাকে দেখাও

তোমাদের মাঝে শুধু সেই একজন

যে একাকী জেগে আছে আত্মার সমীপে;

তোমরা সবাই নিমজ্জিত

অন্ধের সাগরে।

অন্তত দেখাও একজন

যে বলে, 'আমি তো ঠিক আছি।'

তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ

আসল বস্তুতে পৌঁছাবে না।

হাজার ফ্যাসাদ দেখি তোমাদের পুণ্য মসজিদে,

কেউ কি করেছে ঝগড়া কোনদিন সরাইখানায়?

তোমাকে দেখাতে পারি বহুজন সরাইখানায়

মদের নেশায় যারা বুঁদ হয়ে আছে;

তোমাদের ইচ্ছা যদি বুঁদ হয়ে থাকা

তাহলে আমাকে বলো মদের মাহাত্ম্য কিবা আছে?

সরাই খানার লোক সকলেই কেমন প্রেমিক।

তোমদের মাঝে কেউ এমন প্রেমিক আছে বলো?[১২২]

তাঁর *দিওয়ান* খুবই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। '*দীওয়ান*' কাব্য সংকলনে চল্লিশ হাজার ছত্র অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে বারো হাজার চার লাইনের 'রুবাই' ধরনের কবিতা আছে।[১২৩] পান্দ নামা তাঁর অপর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পান্দ নামা গ্রন্থটি নৈতিকতা ও শিষ্টাচার বিষয় সংক্রান্ত আলোচনার সমাহার।[১২৪]

উদাহরণস্বরূপ:

মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা, সায়্যিদুল মুরসালীন (সা.)- এর প্রশংসা, মুজতাহিদ ইমামগণের বর্ণনা, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দরবারে মুনাজাত, চুপ থাকার উপকারিতা, সৎস্বভাবের বর্ণনা, ধ্বংসাত্মক বিষয়ের বর্ণনা, ভাগ্যবানদের বর্ণনা, নিরাপত্তার কারণসমুহ, বিনয় ও দরবেশগণের সাহচর্য, দুর্ভাগ্যের কারণসমুহ, সাধনার বর্ণনা, দরিদ্রতার বর্ণনা, বোকার পরিচয়, বিপদমুক্তির বর্ণনা, জিকিরের ফজিলত, কুস্বভাবের বর্ণনা, উপদেশ ও সৌভাগ্যের বর্ণনা, ক্রোধের নিন্দা, আয়ু অমূল্য সম্পদ, দানশীলতা ও নিশ্চুপ থাকার বর্ণনা, নারী ও শিশুদের বর্ণনা, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনাসমুহের বর্ণনা, রাজ্যপতনের কারণ, সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ, যেসব কাজের ওপর ভরসা করা যায় না তার বর্ণনা, উপদেশ ও শুভকামনা সংক্রান্ত আলোচনা, আল্লাহর পরিচয়, সেবার উপকারিতা, দান-সদকার বর্ণনা, মেহমানের আপ্যায়ন, অল্পে তুষ্টি, মুত্তাকীর পরিচয়, সহনশীলতা, মানবতা, আত্মীয়তার বন্ধন ও অলসতা বর্জন ইত্যাদি।[১২৫]

তাঁর সমগ্র রচনা হয়ে আছে আধ্যাত্মিকতা, সুফিদর্শন ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পাথেয়।[১২৬] আত্তারের আধ্যাত্মিক দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবদুস সাত্তার তাঁর ফারসী সাহিত্যের কালক্রম গ্রন্থে লিখেছেন,

'আল্লার সান্নিধ্যে পৌঁছুতে গেলে নিজেকে পবিত্র করতে হয়। পবিত্র না করে মহা পবিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না- এটাই আত্তার দর্শনের মূল সুর। ফরিদ উদ্‌দীন আত্তারই একমাত্র কবি যিনি ব্যক্তিবিশেষের উপর কোনো স্তুতিবাচক কবিতা লিখেন নি।'[১২৭] আত্তার 'মালামাতিয়ে তারীকে'-কে পছন্দ করতেন যা তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিভাত হয়।[১২৮] তাঁর আধ্যাত্মিক গযলের নমুনা এইরূপ:

"প্রেমিকেরা, যারা বন্ধুর সুবাস ছোঁয়ায় প্রাণ চঞ্চল হয়,

সারাক্ষণ জ্বলে চন্দন হয়ে প্রেমাগ্নির চুল্লিতে।

প্রেমিকেরা যখন চৈতন্য ফিরে পেল বিহ্বলতা ছেড়ে

প্রেমাস্পদের সম্মুখে নামাযে দাঁড়ায় বিনম্র মস্তকে।"[১২৯]

হিজরী ষষ্ঠ শতকে সানায়ীর মাধ্যমে শুরু হওয়া আধ্যাত্মিক গযল সপ্তম শতকে এর পূর্ণতার গতিধারায় আত্তারের পর মওলানা জালালুদ্দিন রুমির কাছে উপনীত হয়।[১৩০]

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (মৃত্যু ৬৭২হি./ ১২৭৩ খ্রি.): 'আত্মাদর্শন' ও কাব্যবৈশিষ্ট্য

ইরানের জাতীয় কবি ফেরদৌসির 'শাহনামা' ইরানীয় সাহিত্যকে যে প্রকাশভঙ্গী ও মননশীলতার অধিকারী করে গেল, তারই ধারা অনুসরণ করে গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উমর খৈয়্যাম রচনা করলেন তাঁর কালজয়ী 'রুবাইয়াত', নিযামি তাঁর 'সেকেন্দারনামা', ও 'ইউসুফ-যোলেখা', প্রাচ্যের শেক্সপিয়ার শেখ সাদি তাঁর 'গুলিস্তান' ও 'বুস্তান', এবং রুমি তাঁর বিখ্যাত 'মসনভি'।[১৩১] ইসলামী তাসাউফের ইতিহাসে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী সবিবেশেষ গুরুত্বের অধিকারী।[১৩২]

রুমির জন্ম, শৈশব, জ্ঞানার্জন ও পারিবারিক জীবন

জালালুদ্দিন রুমি ১২০৭ খ্রিষ্টব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর (৬ রবিউল আউয়াল, ৬০৪ হিজরী) তদানিন্তন পারস্যের খোরাসান প্রদেশের বাল্‌খ[১৩৩] নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩৪] একইসাথে পরিবারটি ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে অভিজাত ও সাংস্কৃতিক।[১৩৫] স্বনামধন্য পিতা মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ[১৩৬] (৫৪৩-৬২৮ হিজরী) এবং পিতামহ হোসাইন বিন আহমাদ খাতিবি উভয়েই তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম, প্রসিদ্ধ সুফি, জ্ঞানসাধক, সুবক্তা, খ্যাতনামা পণ্ডিত ও আরেফ হিসেবে সর্বমহলে সুপরিচিত ছিলেন।[১৩৭]

তাঁর বংশ তালিকা হলো: মুহাম্মদ জালালুদ্দিন বিন মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন বিন হোসাইন বিন আহমাদ বিন মাহমুদ বিন মওদুদ বিন সাবিত সাইব বিন মোতাহার বিন হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)[১৩৮] রুমির জন্মকালীন খোরাসান প্রদেশটি ছিল খাওয়ারিযম সাম্রাজ্যের অধীন।[১৩৯] রুমি পারিবারিক পরিবেশে পিতার নিকট হতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাপসশ্রেষ্ঠ শায়খ ফরিদউদ্দিন আত্তার শিশু জালালকে নিরীক্ষা করে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'আপনার এই শিশু সন্তানের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখবেন, কালে একজন কামেল পুরুষ হবে সে।[১৪০] কারও মতে, সুফি, কবি ও দার্শনিক আত্তার বালক রমির কথাবার্তায় অত্যধিক মোহিত হন এবং মন্তব্য করেন যে, 'এই বালক একদিন তাঁর প্রেমের আগুন দিয়ে এই পৃথিবীর প্রেমিকদের পোড়াবে।'[১৪১] উত্তরকালে আত্তারের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব প্রমাণই পৃথিবীবাসি দেখতে পায়। কেননা, রুমি প্রেমের জগতে এমন আগুনের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যে আগুনে প্রেমিকরা পুড়ে গিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সমর্থ্য হয়।[১৪২]

ইরানে মোঙ্গলদের সম্ভাব্য আক্রমণের কারণে খাওয়ারিযম প্রশাসনের সাথে সৃষ্ট মতবিরোধের জের ধরে জালালুদ্দিন রুমি শৈশবেই স্বীয় পরিজনের সাথে খোরাসান ত্যাগ করে বাগদাদ হয়ে মক্কা শরিফে গমন করেন।[১৪৩] 'অতঃপর ১২১৭ সালেমালাতিয়া পৌঁছেন। ১২১৯ সালে সিভাস-এ আসেন এবং ইবযিন জান-এর নিকট আকশিহির নামক স্থানে চার বছর অবস্থান করেন। ১২২২ সালে লারিন্দ গমন করেন এবং তথায় সাত বছর অবস্থান করেন।'[১৪৪] সেখানেই রুমির বৈবাহিক জীবন শুরু হয়। ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ উনিশ বছর বয়সে রুমী ' গওহর' বা মুক্তা নাম্নী এক মেয়েকে বিয়ে করনে এবং তাঁদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং তাঁর নাম রাখা হয় সুলতান ওয়ালেদ।[১৪৫]

অবশেষে সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের আমন্ত্রণে স্বীয় পিতাসহ ১২২৮ সালে কৌনিয়ায় এস স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১৪৬] এখানেই ১২৩১ সালে রুমির পিতা, সমকালীন ইসলামি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শক্তিশালী নেতা ও পুরোধা বাহাউদ্দিন ওয়ালেদ ইন্তেকাল করেন।[১৪৭] চব্বিশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর (৬২৮ হি:/১২৩০-৩১ খ্রি.) পিতার পূর্বতন শিষ্য, মহান সাধক সাইয়েদ বুরহানুদ্দিন মুহাক্কিক তিরমিযির (মৃ: ৬৩৭ হি:/ ১২৩৯-৪০ খ্রি.) প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানেসুদীর্ঘ নয় বছর (৬২৯ হি:/১২৩২ খ্রি. হতে ৬৩৭হি:/১২৩৯-৪০ খ্রি. পর্যন্ত) যাবত শরিয়ত ও মারেফাত বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত থাকেন।[১৪৮] পরবর্তীতে আলেপ্পোর হালাবিয়া এবং সিরিয়ার দামেশ্ক থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, কালাম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও তর্কশাস্ত্রসহ যুগোপযোগী অন্যান্য বিষয়াবলীর ওপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে ওঠেন।[১৪৯] এই শহরেই তিনি মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর[১৫০] সাহচর্যে থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভ করেন।[১৫১] সূফতিত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জন করে তিনি কোনিয়ায় ফিরে আসেন এবং সেখানে তাঁর পিতৃ প্রতিষ্ঠিত কলেজে যোগদান করে জ্ঞান-বিতরণ শুরু করেন।[১৫২]

রুমির পিতৃআসন লাভ, আধ্যাত্মিক জীবন ও দর্শন এবং সাহিত্যকর্ম

পিতার মৃত্যুর পর মাওলানা পিতার মুরীদগণের অনুরোধে পিতার স্থলাভিষিক্তরূপে লোকদেরকে হেদায়াত ও উপদেশ দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৫৩] এবং অল্পদিনেই তাঁকে 'সুলতান উল্ উলামা' বা জ্ঞানজগতের শাসক আখ্যায় ভূষিত করা হয়।[১৫৪] তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশ দান ও শিক্ষা-দীক্ষা সর্বমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়-যার ফলে তাঁর মুরীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০,০০০।[১৫৫] মওলানা রুমীর সূফীতত্ত্বে সাফল্যের মূলে ফরিদ উদ্দীন আত্তারের আশীর্বাদ এবং সূফী-গুরু শামস-ই-তাব্রীজের সাহচর্য বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।[১৫৬] উল্লেখ্য

যে, তিনি নিশাপুরে শেখ ফারিদুদ্দীন আত্তারের (রহ.) সাথে সাক্ষাত করেন এবং সাক্ষাতে শেখ আত্তার তাঁর 'আসরার নামে' কিতাবটি তাঁকে উৎসর্গ করেন।[১৫৭] আত্তার সম্পর্কে রুমি উল্লেখ করেন:

হাফ্ত শহ্রে এশ্ক্রা আত্তার গাশ্ত;

মা হানুয আন্দর গমাকে কুচা'য়েম।[১৫৮]

অর্থাৎ, প্রেমের সাতটি নগরী পরিভ্রমণ করেছেন আত্তার

আমরা এখনও একটি গলিপথের বাঁকের মধ্যে রয়ে গেছি।[১৫৯]

রুমি রচিত অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'দিওয়ান-ই-শামস তাবরীজ,' 'মসনবী', ও 'রুবাইয়াত' প্রভৃতি।[১৬০] পদ্যে লিখিত তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনার নাম 'মাসনাভীয়ে মা'নাভী'।[১৬১] 'মাওলানার রোবাঈগুলো অধ্যাপক ফোরুযানফারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গদ্য রচনা সম্ভারের মধ্যে রয়েছে 'মাকাতীব', 'মাজা'লিস', 'ফীহে মা ফীহে'। তবে তাঁর গযল বা 'দীভানে কাবীর' কিংবা গাযালিয়াতে শামস-এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর গযলগুলো তাঁর পীর ও মুরশিদ শামস তাবরিযীর নামে প্রচলিত যা আবেগ-উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণায় সাফল্যমণ্ডিত। তিনি স্বীয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর গুরু শামসের সাথে একাত্ম হয়ে যান।'[১৬২]

গুরুর প্রভাব সম্পর্কে রুমি স্বয়ং দিওয়ানে শামস তাবরিযিতে লিখেছেন:

'প্রেম-সমুদ্র যখন প্রচণ্ড উচ্ছাসে উদ্বেলিত, আমার অনুপ্রাণিত আত্ম তখন দক্ষিণ বামে দৃকপাত না করেই নৃত্য করতে থাকল উর্মিছন্দে আর গগন-বিদারী কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'কে আছো শক্তিমান চক্ষুষ্মান, এগিয়ে এস, আমাকে অনুসন্ধান কর, উদঘাটন কর আমার স্বরূপ।' হে তাবরিয-সূর্য! বিশ্বের সমুদয় জাগ্রত আত্মা তোমারই প্রদীপ্ত আত্মার পানে রয়েছে ধাবমান, সূর্যের পশ্চাতে ভাসমান স্বর্ণোজ্জ্বল মেঘপুঞ্জের মতো।'[১৬৩]

মাওলানার সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় শামসে তাবরিযীর সাথে সাক্ষাতের পর।[১৬৪] ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত সূফীদরবেশ শামস তাব্রীজ তাঁর নিজ দেশ তাব্রীজ থেকে কোনিয়ায় আগমন করেন এবং তাঁর জ্যোতির্ময় সূফীদর্শন তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে রুমীর জীবনে আমুল পরিবর্তন ঘটে।[১৬৫] যদিও তিনি বিভিন্ন শিক্ষকের সান্নিধ্যে তখনকার প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন; কিন্তু শামসে তাবরিযীর সাহচর্য ও বিশেষ দৃষ্টির প্রভাবে তাঁর মধ্যে ভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয়।[১৬৬]

বেশ কয়েক বছর রুমি তাঁর সাহচর্যে কাটান এবং সূফীতত্ত্বের দিব্যজ্ঞান অর্জন করেন।[১৬৭] শামস তাবরিযি মৌলানা রুমির চিন্তা-দর্শন, রীতি-নীতি, চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গীমা, যিকির-আযকার, আমল-আখলাক, তালিম-তারবিয়াত সবকিছুই যেন এক নিঃশ্বাসে বদলে দিলেন।[১৬৮] 'প্রথম জীবনে রুমী ছিলেন মূলত একজন শরিয়তপন্থী চিন্তাবিদ। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু শাম্‌স তাবরেজী-এর সংস্পর্শে আসার পর (১২৪৪ খ্রি.) থেকে তাঁর জীবনে এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিবর্তন সূচিত হয়। তখন থেকে তিনি মরমী গজল ও কবিতা রচনা শুরু করেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ধর্মনৃত্য ও ধর্ম সঙ্গীতের প্রচলন করেন। তাঁর ভক্তদেরকে ' 'মৌলভী সম্প্রদায়' নামে অভিহিত করা হয়।'[১৬৯]

রুমি শামস তাররিযি সম্পর্কে তাঁর *দিওয়ানে শামস তাবরিযি*-তে ব্যক্ত করেন:

এসেছে এসেছে জীবনে আমার

এসেছে চন্দ্র সূর্য আমার

এসেছে শ্রবণ দৃষ্টি আমার

রৌপ্য বরণ বন্ধু আমার,

এসেছেসোনার খনি আমার

এসেছে মাথায় নেশা আমার

এসেছে চোখের আলো আমার

আরো যত চাও না কেনো

সবই দেখো এসেছে আমার।

.....

সময় এবার হয়েছে পানের

পানীয়ে জ্ঞান চমকাবে আমার

উড়ার সময় হয়েছে এবার

ডানা পালক এসেছে আমার।[১৭০]

উল্লেখ্য যে, রুমীর শিষ্যরা শামসকে পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শামস দামেস্কে চলে যান। কিন্তু রুমীর জীবনে নেমে আসে দারুণ বিয়োগব্যথা।[১৭১] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল-আফলাকির 'মানাকিবুল-আরেফিন' গ্রন্থের বক্তব্য অনুসারে রুমির শ্রেষ্ঠ বেদনা-বিধুর কবিতাসমূহ রচিত হয়েছে শামস তাবরিযির বিরহ-ব্যথাকে কেন্দ্র করে।[১৭২]

'তাঁর গযলের প্রথম উপজীব্য বিষয় হচ্ছে আধ্যাত্মিক কবিতায় প্রচলিত বিষয়বস্তু অর্থাৎ প্রেম। তবে এই প্রেম উদ্দীপনাময় ও পবিত্র। এই সেই প্রেম যা মাওলানা শামসে তাবরিযীর অস্তিত্বের মধ্যে প্রত্যাশা করা হয়েছে। তাতে মাশুক বা প্রেমাস্পদ ভিন্ন আর যা কিছু আছে সবই পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। শামসে তাবরিযী নিরুদ্দেশ হবার পরেই এই প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং দীভানে শামসের মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।'[১৭৩]

মাওলানার একটি বিখ্যাত গযল:

"সব ছাড়া থাকতে পারি তোমায় ছাড়া আর বাঁচি না

তোমার ব্যথা এই অন্তরে-কোথাও যেতে আর পারি না।

জ্ঞানের দু'চোখ মাতাল তোমার জীবন জগৎ তোমার অধীন

আনন্দ-গান তুমিই যে গাও, তোমায় ছাড়া আর বাঁচি না।"[১৭৪]

সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'দিওয়ানে শামস তাবরিযি' ও 'মসনভি' রুমি তাঁর জীবনে শামস তাবরিযি আগমন পরবর্তী জীবনেই রচনা করেন। রুমির মসনভি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মাসনাভী গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক শিক্ষাসমূহের একটি সংকলন।[১৭৫] যাকে আধ্যাত্মিকতার আকর বলা পারে।[১৭৬] 'সাধারণত মাওলানার গযল আকৃতির কাঠামো ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর গযল অত্যন্ত উদ্দীপনাময় আবেগতাড়িত ও তাপসসুলভ ভঙ্গিতে রচিত। অপর শ্রেণীটিতে রয়েছে আত্মার পরিশুদ্ধি ও মানবীয় উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কিত বর্ণনা ও নির্দেশনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর গযলের ফাঁকে ফাঁকে তিনি গল্পেরও অবতারণা করেছেন এবং তার জন্য আধ্যাত্মিক গল্প গযলের কাঠামো নির্মাণ করে। যেমন একটি গযল রচনা করতে গিয়ে মাঝখানে দু'টি শ্লোকে একটি গল্পের অবতারণা করেছেন।'[১৭৭]

"একদা এক লোক পথিমধ্যে সাথী হয় বায়েজিদ বোস্তামীর

বায়েজিদ জিজ্ঞাস করেন, তোমার কী পেশা হে আত্মভোলা!

বলল, আমি গাধার চাকুরে। বায়েজিদ তখন বললেন তাকে;

হে আল্লাহ তার গাধার মৃত্যু দাও যেন আল্লাহর বান্দা সে হয়।"[১৭৮]

'তিনি আধ্যাত্মিক গযলকে উচ্চ মার্গে নিয়ে যান এবং তাঁর পরে কেউই ফার্সী সাহিত্যে তাঁর ন্যায় এ ধরনের গযল রচনা করেননি বা করতে পারেন নি। আধ্যাত্মিক গযল তার পূর্ণতা অর্জনের গতিধারায় দীভানে শামসে উন্নতির শিখরে উপনীত হয়। সানায়ীর মাধ্যমে শুরু হওয়া আধ্যাত্মিক কবিতার উত্তরাধিকার আত্তারের মাধ্যমে মাওলানা রুমীর কাছে চলে আসে এবং মাওলানার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। মাওলানা যে সময় হিজরী সপ্তম শতকে আধ্যাত্মিক গযলকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যান তখন প্রকৃতপক্ষে ফার্সী গযলের একটি শাখাকে পূর্ণতায় ভরে দেন।'[১৭৯] রুমির দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে-আত্মাতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ, ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৮০]

'রুমির মতে, আল্লাহ থেকেই মানবাত্মার উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর মতে, 'আল্লাহ থেকে পৃথক হওয়ার পর অস্থায়ীভাবে হলেও আত্মা আবার সাধকের ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে আবাস খুঁজে নেয়। মূল উৎস স্থল থেকে পৃথকীকৃত হওয়ার ফলেই আত্মা দেহের পিঞ্জরে বন্দী অবস্থায় থাকে। মানব দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ অবস্থায় আত্মা ততটা স্বাতন্ত্র্য বোধ করে না। এ কারণেই, আত্মার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আদি উৎপত্তি স্থলে ফিরে যাওয়া এবং আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে তার আদি উৎপত্তি স্থলে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তার দেহের অবসান বা মৃত্যু হয়। তবে জীবনের অবসান হয় না। জীবন ফিরে যায় আল্লাহর কাছে।' এ জন্যই কুরআনে বলা আছে– 'আল্লাহই শুরু এবং আল্লাহই শেষ। আর তাঁর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করি।'[১৮১]

রুমির মসনভি'তে তাঁর এই চিন্ত-দর্শনেরই প্রকাশ ঘটেছে। রুমি তাঁর মসনভি'তে উল্লেখ করেন:

"বাঁশীর আওয়াজ শোনো, করুণ কাহিনী তার সুরে–

বিয়োগ ব্যথার কথা সেই সুরে আসে ঘুরে ঘুরে।

বাঁশিটি বলছে, 'আহা আমাকে তো কেটে বাঁশ থেকে

মানব দুঃখের কথা সুর তোলে বলে একে একে।

ছেঁড়া খোড়া এ হৃদয়ে বিদায়ের সকরুণ সুর–

প্রেমের রহস্য করে উন্মোচিত– বিয়োগ-বিধুর।

মূল থেকে চলে এসে, মূলে ফিরে যাবার ইচ্ছায়

এমন সুখ ও দুঃখ সুরের ভিতরে বাজে হায়!'[১৮২]

মাওলানা রুমী প্রধানত আত্মা ও প্রত্যক্ষীকরণ নিয়ে ব্যস্ত।[১৮৩] মাওলানা রুমীর রচনাবলীতে যে বিষয়টি প্রধান ও প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে তা হচ্ছে বিরহ-বিচ্ছেদ এবং অনুযোগ-অভিযোগ।[১৮৪] এই বিরহ ও বিচ্ছেদ আকস্মিক ও চূড়ান্ত নীরবতার রূপ ধরে ষষ্ঠ খণ্ডের শেষে বিলীন হওয়ার সাথে যুক্ত হয়ে যায়।[১৮৫] উল্লেখ্য, মাসনাভীর প্রথম দিকের বেইত বা নেইনামে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়টি অনেক আগে থেকেই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষকদের মনোযোগ কেড়েছে এবং এ সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ মজুদ রয়েছে।[১৮৬]

যেহেতু মাওলানা রুমীর রচনাবলীতে 'নেই' (বাঁশি)-এর রূপক ও রহস্যেও এক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে, তা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, 'নেই' তার আক্ষরিক ও ভাবার্থের দিক থেকে আত্মহারা আরেফের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।[১৮৭] আর এই প্রতিচ্ছবিই তাঁর সমগ্র রচনার প্রধান, প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। 'সত্যের আলোকে স্নান করে নিজেকে পবিত্র করা যায় এবং সে আলোই হচ্ছে প্রেম–আর এই প্রেম-সত্যই ধ্বনিত হয়েছে রুমীর সমগ্র রচনায়। তাঁর বিখ্যাত 'মসনবী' গ্রন্থ ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এবং ছাব্বিশ হাজার কাব্য-ছত্র ছাড়াও রয়েছে নীতিকথা সম্বলিত কেচ্ছা-কাহিনী। কেচ্ছা-কাহিনীসমূহও সূফীতত্ত্ব ও আল্লাহর প্রেমে প্রোজ্জ্বল।'[১৮৮]

গল্পের প্রতীকী চরিত্রের মাধ্যমে ইশারা-ভঙ্গিতে তাঁর তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন তিনি এবং এগুলোর উপস্থাপন এতটাই সাবলীল ও সুস্পষ্ট যে, এসব তত্ত্বের তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য তত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।[১৮৯] যেকোনো সাধারণ পাঠকই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে।[১৯০] মাওলানা রুমী সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাই তাঁর কাব্য ও সাহিত্যকর্মে বিশেষ করে তাঁর গদ্য সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন বলে পরিলক্ষিত হয়।[১৯১] উল্লেখ্য, তাঁর গযলে এ জাতীয় কিছু পরিভাষা এসেছে যেমন-সিদ্ধ শালগম, সব্জী, ছাগল, থলে ও ঝোলা, ঝুড়ি, গরগরা প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।[১৯২]

রুমির আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার মূলে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের প্রভাব। মাওলানা রুমী কুরআন মজীদ ও তার আয়াতসমূহের সাহায্য নিয়ে, বিশেষ করে তাঁর মাসনাভীতে এমন শিল্প-সৌন্দর্য ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন যে, তাকে পাহলভী ভাষার কুরআন নামে আখ্যায়িত করা হয়।[১৯৩] তাঁর দৃষ্টিতে কুরআন মজীদকে যেমন তিন শ্রেণী অর্থাৎ সর্বসাধারণ, বিশেষ ও স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালা স্বতন্ত্রভাবে জানেন, তেমনি মাসনাভীও এই পর্যায়ভূক্ত।[১৯৪] মাসনাভীতে ব্যবহৃত কুরআনের ভাবার্থভিত্তিক আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করা। তাঁর মসনভি'কে বলা হয় তাওহিদের কণ্ঠস্বর, সায়কালে রুহ (আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার রেত), প্রেমের

সঙ্গীতমালা, দর্শনের তত্ত্বভাণ্ডার, শরিয়ত ও তরিকতের গূঢ় রহস্যের বিশ্বকোষ এবং কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফের শিক্ষার নির্যাস।[১৯৫] মনস্তাত্ত্বিক বা চিন্তাধর্মী স্তরে, মাসনাভীতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষামূলক বিষয় ছাড়াও বাহ্যিকভাবে এর কিছু অধ্যায় মাওলানা রুমীর ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট।[১৯৬] যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন: "হে বন্ধুগণ কান পেতে শোনো এ কাহিনী

সেতো আসলে আমাদের অবস্থারই বর্ণনা।"[১৯৭]

'যদি কেউ মাওলানা রুমীর জীবনের উত্থান ও পতন তথা আলো-আঁধারকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন তবে মাসনাভীর কাহিনীগুলোতে তাঁর জীবনের নির্দেশনাগুলো অবশ্যই পেয়ে থাকবেন। যেমন ওয়ালীদের (সাধক) সত্যের পথে চলার প্রতি অবিশ্বাসীদের ঈর্ষা এবং আধ্যাত্মিক ও মহৎ ব্যক্তিদেরকে তিরস্কার করা যা মাসনাভীতে অধিক হারে উল্লিখিত হয়েছে এবং মাওলানা রুমীর জীবনেও এগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়।'[১৯৮]

উচ্চাঙ্গের সংগীত, হাকিকাতের চিত্র, সত্যাভ্যাস, বিশুদ্ধ কথনে প্রভাব বিস্তার, আনন্দ ও দুঃখ-সংঘাত, এরফানের নতুন কাঠামোসমূহ, অসংখ্য তালমীহ (পরোক্ষ ইঙ্গিত), প্রতীকী ভাষা ও অধ্যাত্মবাদের ভাবধারা সম্বলিত উচ্চাঙ্গের মহাকাব্য নির্মাণ ইত্যাদি হলো তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।[১৯৯] পূর্ববর্তীকালের সূফীগণ কেবল সনাতন ধারার সাহিত্যের আওতায় থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেছে।[২০০] কিন্তু রুমির রচনাবলীতে আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর নবতর ধারা এবং একই সাথে এতে বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, তাঁর মসনভি'তে বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। তাঁর ঐন্দ্রজালিক ভাষা ও বক্তব্যের নিখাঁদ শারাবান তহুরায় মিশে আছে চিরন্তন প্রেম যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহা প্রেমের ডোরে আবদ্ধ করে প্রতিটি মানব হৃদয়কে।[২০১] কল্পনার মৌলিকতা, বৈচিত্র্য, পরিমিতিবোধ, পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছতা, সাবলীল আকর্ষণ অনুভূতি ও চিন্তার গভীরতা ছিল তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য।[২০২]

রুমির ইন্তেকাল

মাওলানা রুমির ইন্তেকাল হয় ৬৭২ হিজরীর ৫ই জমাদিউল আখের মাসে।[২০৩] আফলাকী 'মানাকিবুল আরেফীন' গ্রন্থে তাঁর মৃত্যুকালের ঘটনাবলীর বিবরণ বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।[২০৪] মহান এ যুগশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধকের ইন্তেকালে কৌনিয়ায় শোকের ছাঁয়া নেমে আসে। লোকেরা ৪০ দিন পর্যন্ত শোক পালন করেছিলেন। ফারসি সাহিত্যে 'পাহলভি ভাষার কুরআন রচয়িতা' হিসেবে খ্যাত এ কালজয়ী আধ্যাত্মিক সাধকের মাযার বর্তমান তুরস্কের কৌনিয়া শহরে অবস্থিত। এবং যা 'কুব্বাতুল খাযারা' নামে প্রসিদ্ধ।[২০৫]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৭৯, পৃ. ২৩।
২. ঐ।
৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, (অনুবাদ-তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও ঈসা শাহেদী), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, পৃ. ২০।
৪. গানী, *বাহাস দার অ'সার ওয়া আফকা'র ওয়া আহভা'লে হা'ফেয* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।
৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঐ।
৬. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ঐ, পৃ. ২২।
৭. ঐ, পৃ. ৪২।
৮. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৯. ঐ, পৃ. ১৮-১৯।
১০. ঐ, পৃ. ১৮।
১১. কুব, যার্‌রীন, *আরযেশে মিরা'সে সুফীয়ে*, পৃ. ১১।
১২. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪২।
১৩. গানী, *বাহাস দার অ'সার ওয়া আফকা'র ওয়া আহভা'লে হা'ফেয*, ঐ, পৃ. ২৬।
১৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২১।
১৫. ঐ।
১৬. মুতাহ্‌হারী, *অ'শেনা'য়ী বা' উলুমে এসলা'মী*, পৃ. ১০০।
১৭. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
১৮. কুরবীন, *তা'রিখে ফাল্‌সাফেয়ে এসলা'মী*, পৃ. ২৭৩।
১৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২২।
২০. কুরবীন, *তা'রিখে ফাল্‌সাফেয়ে এসলা'মী*, পৃ. ২৭৪।
২১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
২২. গানী, ঐ, পৃ. ১৭।
২৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
২৪. ঐ, পৃ. ২২-২৩।
২৫. ঐ, পৃ. ২৩।
২৬. ঐ।
২৭. ঐ, পৃ. ১৭।
২৮. ঐ, পৃ. ১৭-২৪-২৫।
২৯. সাজ্‌জা'দী, *মাবা' নীয়ে এরফা'ন ওয়া তাসাউফ*, পৃ. ৪।
৩০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২৫।
৩১. হারভী, মা'য়েল, *খা'স্‌সিয়্যাতে অ'য়েনেগী*, পৃ. ৪১।
৩২. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২৬।
৩৩. সাজ্‌জা'দী, *মাবা' নীয়ে এরফা'ন ওয়া তাসাউফ*, পৃ. ১২০।
৩৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৩৫. ঐ।
৩৬. শিরা'যী, বাকলী, *আবহারুল আশেকাইন, মুক্বাদ্দামে*, পৃ. ১২৪।
৩৭. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৩৮. ঐ।
৩৯. জা'মী, *নাফা'হাতুল উন্‌স*, পৃ. ৪২৩।
৪০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ২৭।

৪১. ঐ, পৃ. ২৭-২৯।
৪২. ঐ, পৃ. ৩১।
৪৩. সাফা', *তা'রিখে আদাবিয়া'ত দার ঈরা'ন খণ্ড ১/৩*, পৃ. ১৬৫।
৪৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৫২।
৪৫. খান, আবদুস সবুর, *ফারসি উপন্যাসে জীবন ও মানবিকতা*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশে বই মেলা, ২০১৩, পৃ. ১০, (ভূমিকা)।
৪৬. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৩।
৪৭. আহমাদ, জালালে আলে, *জালালে আলে আহমদের নির্বাচিত ছোটগল্প*, (অনুবাদ-খান, আবদুস সবুর), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ভূমিকা।
৪৮. Prof. R. Levy, *Persian Literatore,* P. 36.
৪৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪২।
৫০. মুনাওয়ার, মুহাম্মদ বিন, *আসরা'রুত তাওহীদ*, পৃ. ৯।
৫১. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৪৪-৪৫।
৫২. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, পৃ. ৪৫।
৫৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪২।
৫৪. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ।
৫৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ
৫৬. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ।
৫৭. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ।
৫৮. **সামাঃ** আল্লাহ প্রেমের সঙ্গীত। তবে সামা'র মজলিস হতো সাধারণ গান-বাজনার মজলিস হতে ভিন্ন ধরনের। সুফীদের দৃষ্টিতে সামা' হচ্ছে অন্তরের সংকীর্ণতা ও বিমর্ষতা দূরীকরণের মাধ্যম। সুফীগণ সাধারণত 'আল্লাহ' নামের এবং কুরআন মজীদে আল্লাহকে বুঝাতে ব্যবহৃত সর্বনাম 'হুয়া' শব্দ অবলম্বনে ও আল্লাহর বিভিন্ন গুণবাচক নামের যিকির করতেন। খোরাসানে সর্বপ্রথম আবু সাঈদ আবুল খায়ের হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে (খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী) সামা'র প্রচলন করেন। ইমাম গাযযালী প্রমুখের মতে শরীয়াতে সামা'র ও নৃত্যের অনুমতি নেই, তাই তাঁরা সামা'র অনুমতি দিতেন না, কিন্তু মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী প্রমুখ আরেফগণের নিকট সামা' বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। [দ্রষ্টব্যঃ তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, (অনুবাদ-তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও ঈসা শাহেদী), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, পৃ. ২০; কুব, যার্‌রীন, *আরযেশে মিরা'সে সুফীয়ে*, পৃ. ৯৪।]
৫৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪২-১৪৩।
৬০. রুহ, জামা'ল উদ্দীন আবু, *হা'লা'ত ওয়া সুখানা'নে বু সায়ীদ*, পৃ. ১৩।
৬১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪২।
৬২. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, পৃ. ৪৬।
৬৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪৩।
৬৪. ঐ।
৬৫. মুনাওয়ার, মুহাম্মদ বিন, *আসরা'রুত তাওহীদ*, পৃ. ১৭।
৬৬. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ।
৬৭. মুনাওয়ার, মুহাম্মদ বিন, ঐ, পৃ. ২৪।
৬৮. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪৩।
৬৯. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, পৃ. ৬০-৬১।
৭০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
৭১. রুহ, জামা'ল উদ্দীন আবু, ঐ, পৃ. ৩২।
৭২. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭।
৭৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪৪।

৭৪. কুব, যার্‌রীন, *জুস্‌তেজু দার তাসাউফ ১ম খণ্ড*, পৃ. ৬৪।
৭৫. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, পৃ. ৪৭।
৭৬. রুহ, জামা'ল উদ্দীন আবু, ঐ, পৃ. ১০৯-১১০।
৭৭. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ২২।
৭৮. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, পৃ. ৪৮।
৭৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৮০-১৪২।
৮০. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ২১-২২।
৮১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৪৫।
৮২. রুহ, জামা'ল উদ্দীন আবু, ঐ, পৃ. ২২।
৮৩. ঐ।
৮৪. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ, *পারস্য প্রতিভা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ষষ্ঠ ও যুক্ত সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ২২৪।
৮৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৩৪৭।
৮৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৭৮।
৮৭. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ২২৬।
৮৮. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, পৃ. ১২২।
৮৯. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
৯০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৫২।
৯১. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪৪।
৯২. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ।
৯৩. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
৯৪. নিশাবুরী, শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার, *মুসীবত নামা*, নূরানী বেসাল (সম্পা.), কিতাবফোরূশীয়ে যাওয়্যার, তেহরান, ১৩৬৪ সৌরবর্ষ, পৃ. ৩৬৭; ফোরূযানফার, বদীউয্‌যামান, *শারহে আহওয়াল ওয়া নাগ্বদ ওয়া তাহলীলে আসারে শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার নিশাবুরী*, এন্তেশারাতে আন্‌ জুমানে আসার ওয়া মাফাখেরে ফারহাঙ্গী, তেহরান, ১৩৭৪ সৌরবর্ষ, পৃ. ১।
৯৫. সাফা, যবীউল্লাহ, *গানজ ওয়া গানজিনে*, মোআসসেসেয়ে এন্‌শারাতে আমির কাবির, তেহরান, ১৩৬৩ সৌরবর্ষ, পৃ. ২০৪।
৯৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
৯৭. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
৯৮. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ।
৯৯. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ২২৭।
১০০. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
১০১. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ, ঐ।
১০২. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ, পৃ. ১২৩
১০৩. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
১০৪. কেয়া, যাহরা খানলারি, *রাহনুমায়ে আদাবিয়াতে ফারসি*, কিতাব খানেয়ে ইবনে সিনা, তেহরান, ১৩৪০ সৌরবর্ষ, পৃ. ২৬৭; আনুশেহ, হাসান, *দানেশনামায়ে আদবে ফারসি*, ওয়াযারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাদে ইসলামী, তেহরান, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ, পৃ. ১৭৮০।
১০৫. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
১০৬. ঐ।
১০৭. উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, ঐ।
১০৮. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪৫।

১০৯. শাকিব, নে'মাতুল্লাহ কাজী, *বেসূয়ে সীমোরগ*, মোআসসেসেয়ে এন্তেশারাতে সিক্কে, তেহরান, ১৩৮০-১৩৮১ সৌরবর্ষ, পৃ. ১৩২।
১১০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৫২-৮৮-৮৯।
১১১. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
১১২. Armajani, Yahya, *Middle East Past and Present*, Prentice-Hall, Inc., Englewood cliffs, New Jersey, 1970, p. 232.
১১৩. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অন্যন্যা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৬৩।
১১৪. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৩৪৮।
১১৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৮৯-৯০।
১১৬. পুরনা'মদারীয়া'ন, *দিদা'র বা' সীমুর্গ*।
১১৭. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৭৯।
১১৮. সাবুর, *অ'ফা'কে গাযালে ফা'রসী*, পৃ. ২০৫-২০৬।
১১৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৭৮।
১২০. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪৫।
১২১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
১২২. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪৬।
১২৩. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪৫।
১২৪. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
১২৫. শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের *পান্দনামা* কাব্যগ্রন্থ, পৃ. প্রতিটি কবিতার শিরোনাম দ্রষ্টব্য।
১২৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
১২৭. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪৪।
১২৮. **'মালামাতিয়ে তারীকে':** একদল সুফী যারা গোপনে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতে মশগুল থাকেন এবং প্রকাশে এর বৈপরীত্য প্রদর্শন করেন। [দ্রষ্টব্য: অনুবাদক-*ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৯০, তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, (অনুবাদ-তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও ঈশা শাহেদী), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, পৃ. ৯০।
১২৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮০।
১৩০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৭৯-১৮০।
১৩১. ইউসুফ, মনিরউদ্দীন, *ফেরদৌসীর শাহনামা*, (অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৬।
১৩২. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৩১।
১৩৩. **বাল্‌খ:** হিজরী সপ্তম শতকে প্রাচীন পারস্যের এই বাল্‌খ নগরী ছিল শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যমত শ্রেষ্ঠ নগরী। বর্তমানে এই শহরটি আফগানিস্তানের অন্তর্গত। মৌলানা রুমিকে 'জালালুদ্দিন বাল্‌খি' বলা হয়। ইরান ও তার সীমান্তবর্তী দেশসমূহে তিনি 'জালালুদ্দিন বাল্‌খি' নামেই সমধিক পরিচিত।
১৩৪. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫০; Hakim, Khalifa Abdul, *The Metaphysics of Rumi,* The Institute of Islamic Culture, Lahore, 4th impression, 1956, p. 1.
১৩৫. সাইফ, খালিদ, *জালালুদ্দিন রুমি প্রেমের কবিতা*, বাঙলায়ন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৯।
১৩৬. **মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ:** জালালুদ্দিন রুমির পিতা মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ ছিলেন একজ নধর্মপ্রচারক, যশস্বী সুফি-সাধক ও 'মা'রিফ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি যুবক বয়সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যেও জন্য তাঁকে 'সুলতানুল উলামা' বা জ্ঞানীদের সম্রাট বলা হত। খোরসানের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা কঠিন বিষয়সমূহের সমাধান লাভের আশায় তাঁর নিকট আসত। তিনি সকাল হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সাধারণ পাঠদানে ব্যস্ত থাকতেন। যুহরের পর বিশিষ্ট ব্যক্তিদেও বৈঠকে মারেফাত ও হাকিকাত সম্পর্কে

আলোচনা করতেন এবং সোমবার ও শুক্রবার সাধারণ জনসভায় ভাষণ দিতেন। তিনি ছিলেন একজন আজীবন জ্ঞান-সাধক ও চিন্তাবিদ। [দ্রষ্টব্য; *ইসলামী বিশ্বকোষ* ১*ম খন্ড*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৫১৬; সাইফ, খালিদ, *জালালুদ্দিন রুমি প্রেমের কবিতা*, বাঙলায়ন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৯।]

১৩৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ* ১*ম খন্ড*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৫১৬।

১৩৮. হোসাইন, আসগর, *মাওলাভীয়ে মা'নাভী*, সাহারানপুর, ১৯৪৩, পৃ. ৪।

১৩৯. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, প্রকাশক-ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৬৬।

১৪০. ইসহাক, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, *বিশ্ব প্রেমিক রুমী প্রথম খন্ড*, সিফাত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ. ২।

১৪১. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ।

১৪২. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪৯।

১৪৩. আনিসুজ্জামান, ড. (সম্পাদিত), *আন্তর্জাতিক রূমী সম্মেলন'০৭ স্মারকগ্রন্থ*, আল্লামা রূমী সোসাইটি ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১৪।

১৪৪. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৬৭।

১৪৫. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৪৯-৫০।

১৪৬. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ।

১৪৭. আশরাফী, মোঃ ফজলুর রহমান, *বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা*, আর, আই, এস পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭৩।

১৪৮. ইসহাক, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৩।

১৪৯. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঐ, পৃ. ১৬৪; *ইসলামী বিশ্বকোষ* ১*ম খন্ড*, ঐ, পৃ. ৫১৭।

১৫০. **ইবনুল আরাবিঃ** ইবনুল আরাবি স্পেন দেশীয় বিখ্যাত সুফি দার্শনিক। তাঁর পুরো নাম শায়খুল আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি ওরফে মোহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে মোহাম্মদ আল আরাবি ইবনে আহামদ ইবনে আবদুল্লাহ। অনেক সময় তাঁকে আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে আলি মহিউদ্দিন আল হাতেমি আল আন্দালুসি ওরফে ইবনে আরাবি বলা হয়। পাশ্চাত্য জগতে তিনি ইবনুল আরাবি এবং স্পেনে ইবনে সুরাকা নামে পরিচিত। তিনি ২৯ জুলাই ১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দে (৫৬০ হিজরী) সুফি মতবাদে অনুধ্যান পরায়ণ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দে/ ৬৩৮ হিজরীর ২৮ শে রবিউস্‌সানি জুমারাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর নশ্বর দেহাবশেষ কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে 'আল কিবরিত আল আহমার' নামক স্থানে সমাহিত হয়। সুফি সাধনায় তিনি এত উন্নত হন যে তাঁর ভক্তরা 'তাঁকে শায়খুল আকবর' বা শ্রেষ্ঠ শায়খ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দুইশত ঊননব্বই বলে উল্লেখ করা হয়। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল ফতুহাল মক্কিয়া' বা মক্কার প্রত্যাদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইবনুল আরবি সুফি মতবাদকে পূর্ণতত্ত্ব দর্শন সমান্বিত করে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। [দ্রষ্টব্যঃ সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, *ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দিন রুমী*, বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৮৪, পৃ. ২৮-৩০-৪৫]

১৫১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮১।

১৫২. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৫০।

১৫৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮০।

১৫৪. সাত্তার, আবদুস, ঐ।

১৫৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮১।

১৫৬. সাত্তার, আবদুস, ঐ।

১৫৭. জা'মী, *নাফা'হাতুল উন্‌স*, পৃ. ৪৬০।

১৫৮. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ২৩৩।

১৫৯. আনিসুজ্জামান, ড. (সম্পাদিত), ঐ, পৃ. ৬১।

১৬০. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঐ, পৃ. ১৬৪।

১৬১. [দ্রষ্টব্যঃ *মাসনাভী*]

১৬২. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮২-৯২।
১৬৩. ইসহাক, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, ঐ, পৃ. ২৩।
১৬৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮১।
১৬৫. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
১৬৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮১।
১৬৭. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
১৬৮. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৬৮।
১৬৯. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঐ।
১৭০. আনিসুজ্জামান, ড. (সম্পাদিত), ঐ, পৃ. ৭২-৭৩।
১৭১. সাত্তার, আবদুস, ঐ।
১৭২. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৭১।
১৭৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮৩-১৮৪।
১৭৪. *গাযালিয়াত ২য় খণ্ড*, গযল নং ৫৫৩,
১৭৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৩০।
১৭৬. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (সংকলন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০১, পৃ. ২১২।
১৭৭. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮৪।
১৭৮. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮৪।
১৭৯. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৯২-১৮২-১৮৫।
১৮০. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঐ।
১৮১. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঐ, পৃ. ১৬৭।
১৮২. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৫৪-৫৫।
১৮৩. নিকলসন, *তাফসীরে মাসনাভ*, পৃ. মুকাদ্দামে (ভূমিকা)।
১৮৪. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৩১
১৮৫. কুব, যার্‌রীন, *বাহার দার কুযে*, পৃ. ৯।
১৮৬. জা'ফারী, যামা'নী, *ফি না'মে*, পৃ. মুকাদ্দামে (ভূমিকা)।
১৮৭. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।
১৮৮. সাত্তার, আবদুস, ঐ, পৃ. ৫১।
১৮৯. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৭৯।
১৯০. আনিসুজ্জামান, ড. (সম্পাদিত), ঐ, পৃ. ৪৫।
১৯১. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৯৩।
১৯২. সাবুর, ঐ, পৃ. ২২৯।
১৯৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৩০।
১৯৪. হুমায়ী, *তাফসীরে মাসনাভীয়ে মাওলাভী*, পৃ. ৫০-৫১।
১৯৫. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা, *মসনবী শরীফ প্রথম খন্ডের প্রথমার্ধ*, খায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১১।
১৯৬. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৯৩-৯৪।
১৯৭. ঐ।
১৯৮. ঐ।
১৯৯. শামীসা', সিরুস, *সাব্‌ক শেনা'সীয়ে শে'র* (কাব্যশৈলীবিজ্ঞান), পৃ. ২২৭।
২০০. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ৯৩।
২০১. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা, ঐ, পৃ. ৮।

২০২. সাফা, যবীউল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান ২য় খণ্ড*, রামীন প্রকাশনী, তেহরান, দশম মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ. ৯৭; সুবহানী, তাওফিক হা., *তারীখে আদাবিয়্যাত*, পায়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, তেহরান, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯০, পৃ. ২৫১-২৫২।
২০৩. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ, পৃ. ১৮১।
২০৪. আফলাকী, *মানা'কিবুল আ'রেফীন*, পৃ. ৫৯৫।
২০৫. তামীমদারী, ড. আহমাদ, ঐ।

205

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদ-সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাব

বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদ-সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাব

বঙ্গীয় অঞ্চলে অধ্যাত্মবাদ এবং মুসলিমদের প্রবেশ ও প্রভাব

অধ্যাত্মবাদী অনুভূতি মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন এক অনুভূতি। আর এ অনুভূতির উদ্দেশ্য হলো আত্মা ও হৃদয়ের প্রেম ও বহ্যিক জীবনের কর্মকান্ড এবং সাধনার দ্বারা অসীম সত্তা তথা মহান ও পবিত্র রবের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করা। এ অনুভূতির প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে যুগে যুগে বিভিন্ন স্থান ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন সাধক, তাপস ও স্রষ্টার সান্নিধ্যপ্রেমী অধ্যাত্মবাদীরা বিভিন্ন ও বিশেষ ধরনের সুশৃঙ্খল জীবন যাপন, ধ্যান ও সাধনায় রত থেকেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে এসব সাধকগণ তাঁদের অধ্যাত্মবাদী এসব অনুভূতির উৎকর্ষতার চরম প্রকাশ হিসেবে এগুলো লিপিবদ্ধ করে সেগুলোর সাহিত্যিকরূপও দিয়েছেন। সেসব সাহিত্যকর্ম অধ্যাত্মবাদী সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত এবং এগুলোর গভীর তাৎপর্য ও প্রভাব রয়েছে। আর এ প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন যুগের কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে বিদ্যমান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকদের দ্বারা এ জাতীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে।[১]

বঙ্গীয় অঞ্চলেও অধ্যাত্মবাদ এবং এ শ্রেণীর সাধকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এনামুল হকের মতে, সুফিদের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সুলতান কমরউদ্দিন রুমি (আগমন ১০৫৩ খ্রি.) বঙ্গীয় অঞ্চলে মরমিবাদ[২] নিয়ে আসেন।[৩] সমগ্র বাংলার গ্রাম, নগর-বন্দর-শহর অগণ্য, অসংখ্য ফকির-দরবেশ-পির-আউলিয়া-মরমি সাধক ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা ইসলামি মতবাদভিত্তিক ফকিরি-দরবেশি-সুফি মরমি ভাবধারা প্রচলিত হয়, তাঁরাই এখনো বাংলার ঘরে ঘরে আরব, পারস্য সমরখন্দ, বোখারার প্রতিধ্বনি তোলে।[৪] তাঁদের সৃষ্ট অধ্যাত্মবাদী উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন সাহিত্যকর্মও রয়েছে, যেগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাংলা সাহিত্যে আধ্যাত্মিক ভাব, আত্মদর্শন এবং মুসলিম সংস্কৃতি ঘিরে সাহিত্য চর্চা ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে।[৫] ঐতিহাসিকদের মতে, 'ভারতের চিন্তাজগতে আধ্যাত্মবাদের প্রভাব সর্বজনবিদিত।[৬] এই জাতীয় সাহিত্যের আবেদন আমাদের দেশে চিরন্তন।[৭] অতীন্দ্রিয়বাদ বা আধ্যাত্মবাদ বা ঐশ্বরিক চেতনা বাঙ্গালীর সহজাত প্রবণতা।[৮]

বঙ্গীয় অঞ্চলে মূলত ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমেই এ অধ্যাত্মবাদের সাধনা চর্চার সূচনা ও বিকাশ শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সৈয়দ বাশার শাহ (তিরোভাব ১০৩৯ খ্রি.) এবং পশ্চিম ভারতের (লাহোরে) দাতা গাঞ্জ বকশ (তিরোভাব ১০৭২ খ্রি.) অন্যতম। তাঁরা ছাড়াও আরো অন্যান্য অনেকের নাম ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির তথ্যমতে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে বাবা আদম শহিদ, শাহ সুলতান মাহি সওয়ার, মখদুম শাহদৌলা শহিদ,

মখদুম শাহ মামুদ গজনভি, বায়েজিদ বোস্তামি, শেখ ফরিদ, শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি, শাহ জালাল ইয়ামেনি, শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা প্রমুখ বিশেষ স্মরণীয়।[৯] অবশ্য বাংলার সামজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থের তথ্যমতে, আরব বণিকদের ব্যবসায় সূত্রে অষ্টম শতাব্দীতেই ভারতীয় অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন সম্ভব হয়।[১০] বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব ও সংসারত্যাগী ধর্মপরায়ণ ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, ও মরমি সাধকদের ধর্মপ্রচার, মানবসেবা, শিক্ষাদান, প্রেম, সাম্য, উদারতা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, ইত্যাদির ফলে বাংলার অগণিত বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[১১] ষোল শতকে চৈতন্যদেব এবং ঊনিশ-বিশ শতকে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন, রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ তাঁদের পুনরায় হিন্দু সমাজ ও ধর্মে গ্রহণ করার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদের বাউল অথবা অন্য কোনো নামে উল্লেখ করেন।[১২]

'হযরত উমর (রাঃ) (মৃঃ ৬৪৪ খ্রি.) এর সময়কালে মামুন ও মুহায়মিনের নেতৃত্বে ধর্ম প্রচারকদের একটি দল আসে বাংলাদেশে। তারা প্রথমেই এ দেশীয় ভাষা আয়ত্ব করেন। তারপর এদেশের কিছু লোককে আরবি শিক্ষা দিয়ে ধর্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর আরো পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য হতে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন। পারস্য হতে চট্টগ্রামে আগত বায়েজিদ বোস্তামি (মৃঃ ৮৭৪ খ্রি.) এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্রমান্বয়ে দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অসংখ্য ধর্ম প্রচারক এদেশে আসেন। ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ফরিদুদ্দিন গান্জ শাকর (১১৫৮-১১৮৯ খ্রি.), মাখদুম শাহ (১২৪০-১২৭৫ খ্রি.), শাহজালাল ইয়ামেনি (আগমন ১৩০৩ খ্রি.) ও তাঁর তিনশত দরবেশ সহচর, বদর শাহ (আগমন ১৩৪০ খ্রি.) এবং নূর কুতুবুল আলম (১৪১৮-১৪৩৩ খ্রি.) এদেশে আগমনকারীদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। এতদাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তাঁদের আবদান চিরস্মনণীয় হয়ে আছে।'[১৩]

সহজ জীবনযাত্রা প্রণালী, দৃঢ় চরিত্রবল ও গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্য এঁদের অনেক বেশী খ্যাতি ও সুনাম ছিল।[১৪] এঁদের সংস্পর্শে এসে বহু পাপী পাপাচারত্যাগ করে সাধু হয়েছে, আবার অনেক সংসারী পরোপকারে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে।[১৫] 'নওমুসলিমদের শিক্ষার জন্য সুফি মনোভাবের কবিরা বাংলা ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন। দু'জন বিখ্যাত সুফি কবি ছিলেন সৈয়দ সুলতান (আনু: ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.) ও হাজী মুহাম্মদ (আনু: ১৫৫০-১৬২০ খ্রি.)।'[১৬] সৈয়দ সুলতান লিখেছিলেন *জ্ঞানপ্রদীপ* ও *জ্ঞানচৌতিশা* আর হাজী মুহাম্মদ *নুর জামাল* ও *সুরতনামা*।[১৭] মধ্যযুগে বাংলায় রচিত এ জাতীয় প্রায় বিশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৮] এর মধ্যে রয়েছে শেখ ফয়জুল্লাহর (ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ) *গোরক্ষবিজয়*, অজ্ঞাতনামা কবির *যোগকলন্দর*, সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ*, *জ্ঞানচৌতিশা*, চট্টগ্রামের হাজী মুহাম্মদের (১৫৬৫-১৬৩০ খ্রি.) *সুরতনামা*, মীর মুহাম্মদ শফীর *নূরনামা*, শেখ চান্দের *হর গৌরী সম্বাদ* ও *তালেবনামা*, আবদুল হাকিমের *চারি মোকাম ভেদ* ও *শিহাবুদ্দীন পীরনামা*, আলী

রেজার (১৬৯৫-১৭৮০ খ্রি.) *ধ্যানমালা সিরাজ কুলুব*, *আগাম জ্ঞান সাগর*, বালক ফকীরের *জ্ঞান চৌতিশা*, গরীব নেওয়াজের *যোগ কলন্দর*, মোহসেন আলীর *মোকাম মঞ্জিল কথা*, কাজী শেখ মনসুরের *সিরনামা*, শেখ জাহিদের *আদ্য পরিচয়*, শেখ জেবুর *আগাম*, রমজান আলীর *আদ্যবক্ত*, রহিমুল্লাহর *তনতেলাওত* এবং সিহাজুল্লাহর *যুগীকাচ*।[১৯]

সুফিদের প্রচারিত ধর্ম নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমানদের অনেক আপত্তি ছিল সেজন্য তারা ইসলামি শরিয়ত ও নিয়ম কানুন প্রচারের জন্য বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছিলেন।[২০] উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিতাবের নাম হচ্ছে *কায়দানী কিতাব*, *তোহফা* ও *কিফায়াতুল মুসল্লীন*।[২১]

বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদের সূচনা ও প্রভাব

মূলতঃ বাংলার জনগণের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং তাঁদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের ক্ষেত্রে মরমিদের প্রভাব অপরিসীম ও সমাজ জীবনেও তাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[২২] এসব মনীষী ও সাধকদের কাহিনী, কারামত ও মানবগোষ্ঠির ওপর তাঁদের অপরিসীম প্রভাব নিয়ে বহু গীতি, কাব্য ও পুস্তক রচিত হয়েছে।[২৩] বঙ্গীয় অঞ্চলে আগত ইসলাম প্রচারক ও মনীষীদের একটি বিরাট অংশ ফারসি অধ্যাত্মবাদী ধারার সাহিত্যকর্মেব প্রভাবপুষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের প্রভাব সমভাবে এঅঞ্চলের মানুষের ওপরও পড়ে।

'বাংলা সাহিত্যের ধারায় আধ্যাত্মিক ভাবরস সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। কালের ব্যবধানে এ প্রভাব এতই বিস্তৃতি লাভ করে যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো বাংলা ভাষার মহান কবিগণও এ প্রভাবের বাইরে অবস্থান নিতে পারেন নি। হাফিজের শরাব দর্শন, খৈয়ামের সুরাহিবাদ, রুমির প্রেমদর্শন, আত্তারের আত্মদর্শন এবং জামির ভক্তিবাদ বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের অন্তর জগতে যে নাড়া দিয়েছে তার ফিরিস্তি তৈরী এ দুঃসাধ্য কাজ। উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবাল যেমন নিজেকে মৌলানা রুমির ভাবশিষ্য হিসেবে মনে করতেন তেমনি বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ এবং বাংলার আধুনিক কবিদের অনেকেই তাঁর ভাবধারা অবলম্বনে কবিতা লিখেছেন।'[২৪]

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ চরণ 'শুনহ মানুষ ভাই , সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই,' রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী নামক কাব্যগ্রন্থের 'দুই পাখি,' 'আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে, আমার প্রদীপ না জ্বালালে দেয় না কিছু আলো,' কবি নজরুলের 'মিথ্যা শুননি ভাই, এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই,' আধুনিক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' ইত্যাদি হয় রুমির মসনভি'র সোজাসুজি অনুবাদ অথবা তার ভাবরসের ঋণে ঋণী।[২৫] পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি, বিশেষ করে চণ্ডীদাস,

বিদ্যাপতি, চাঁদবাজি, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর ও সৈয়দ মুর্তজা হতে ধরে বিংশ শতাব্দীর লালন শাহ, হাসন রাজা, রমেশ শীল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রেহী কবি কাজী নজরুলের মরমি কবিতার ওপর পারস্যের শ্রেষ্ঠ মরমি কবি জালালালুদ্দিন রুমরি ভাবধারার অসাধারণ প্রভাব পড়েছে।[২৬] রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা পড়লে মনে হয় এ যেন মৌলানা ফারসি কবিতার ব্যাখ্যা ও ভাবসম্প্রসারণ।[২৭]

'কবি গুরু তাঁর 'পারস্যের যাত্রী' গ্রন্থে ইরানিদের বিষয়ে উল্লেখ করেন, 'এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তার পরে এখানে একটা জনশ্রুতি রয়েছে যে, পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য।' যদিও রবীন্দ্রনাথ সরাসরি ফারসি চর্চা করেন নি, তবু রবীন্দ্র সাহিত্যে ফারসি শব্দ ও পরিভাষার অনুপম ব্যবহার প্রত্যক্ষ করি। আমরা তাঁর রচনায় পরওয়ানা, গুল, বুলবুল, শরাব, সাকি প্রভৃতির ব্যবহার দেখি এবং অনুরূপভাবে হাফিজ হাফিজ, রুমি, সাদি প্রমুখ বিশ্বখ্যাত কবিদের পরিচয়ও পেয়ে থাকি।'[২৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থ হতে মসনভি'র সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কবিতার অংশবিশেষ এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হল:

এই করেছ ভালো নিঠুর

এই করেছ ভালো।

এমনি করে হৃদয়ে মোর

তীব্র দহন জ্বালো।[২৯]

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন,

'মসনভি গোড়া হতেই ইরানে কুরআন-কল্প ধর্মীয় মহিমায় বিমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কিরা যখন (১২০১-১৩৫০ খ্রি.) বাংলাদেশ জয় করে এদেশে ইরানি প্রভাবপুষ্ট সংস্কৃতির প্রবর্তন করেন, তখন তারা নিশ্চয় কুরআন-কল্প মহিমাময় 'মসনভি'কেও এদেশে জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নতুবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে এসে মুসলমান দূরে থাকুক এদেশের হিন্দুকেও তত্ত্বগরীয়ান মসনভি পাঠ ও আবৃত্তি করতে দেখতে পেতাম না।'[৩০]

বিশ শতকের এরূপ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামবাদি (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রি.), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৮২ খ্রি.), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি.), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.), ড. এনামুল হক (১৯০৬-১৯৯ খ্রি.)।[৩১] বঙ্গীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকগণ মানবতার কবি শেখ সাদি

(১১৮৪-১২৯২ খ্রি.) রচিত গুলিস্তান, বুস্তান, দার্শনিক কবি রুমির মসনভি এবং প্রেমের কবি হাফিজ শিরাযির (১৩১৫-১৩৯১ খ্রি.) 'দিওয়ান' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী এতদাঞ্চলে নিয়ে আসেন এবং এসবের চর্চা অব্যাহত রাখেন।[৩২]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদী ধারার সাহিত্যকর্ম উল্লেখযোগ্যভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ এসব সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এধারার কবিদের মধ্যে মুসলমান কবিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পদাবলী সাহিত্যেও মুসলমান কবিদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। পদাবলী এক প্রকার মরমি সঙ্গীত যা সুফি সঙ্গীত বা গজল থেকে প্রেরণা ভাব আহরণ করে রচিত হয়েছিল।[৩৩] সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান চৈতিষা' ও 'জ্ঞান প্রদীপ' হাজি মুহম্মদের 'নূরজামাল,' শেখ মনসুরের 'সিররনামা,' সৈয়দ মুর্তজার 'যোগকলন্দর,' আবদুল হাকিমের 'চারি মোকাম ভেদ,' শেখ চাঁদের 'হরগৌরি সম্পদ,' মুহম্মদ শফির 'নূরনামা,' ও আলি রাজার 'জ্ঞানসাগর,' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজির মধ্যে কয়েকটি এবং এসব গ্রন্থে সেযুগের মুসলমান সমাজে মিশ্র অতীন্দ্রিয়বাদের প্রচলন প্রতিফলিত হয়।[৩৪]

বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব

কয়েকশত বছর পূর্বে ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল।[৩৫] মুসলিমগণকর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ফলে এ সম্পর্কে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। কেননা, তাঁরা শুধু শাসনকার্যেই মনোনিবেশ করেননি বরং ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও চর্চাকল্পেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; যার অংশ হিসেবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যেরও উন্নতি সাধিত হয়। এছাড়াও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁদের গৃহীত এই পদক্ষেপ ও পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা ও পারস্যের সম্পর্কেও শক্তিশালী এক সেতুবন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হয়। আর, এর প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী ও ফলপ্রসূ।

'মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক বাংলা বিজিত হওয়ার পর, তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে। তাঁরা মনে করেন এ দেশের মানুষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের জন্য এ ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করা অত্যন্ত জরুরী। তাই মুসলিম শাসকগণ বাংলা ভাষার প্রচার, প্রসার এবং পরিচর্যার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যদিও এ সময়ের বাংলার অধিকাংশ শাসকই তুর্কী ও মুঘল ছিলেন। তা সত্ত্বেও ফারসি ভাষার ব্যবহার এককভাবে তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। এ কারণে দু'টি ভাষার কোনোটিকেই তাঁরা খাটো করে দেখেননি। এ সুবাদে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফারসি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে; যার মাধ্যমে এ দু'ভাষার মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।'[৩৬]

১. মুসলিমদের বঙ্গবিজয় ও ফারসি চর্চায় ভূমিকা

বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১২০৩-১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে।[৩৭] তবে আব্দুর রহিম তাঁর `*Social and Cultural History of Bengal,* গ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গ বিজয়ের সাল ১২০১ বলে উল্লেখ করেছেন। আর, এস. এম. আলী *A. N Choudhury*-এর *Dynamic History of Bengal* গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বঙ্গ বিজয়ের সাল ১২০৪ খ্রি. বলে উল্লেখ করেন।[৩৮]

তিনিই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৯] তনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিরাট এলাকা অধিকার করে রংপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে খানকা, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করে ফারসি শিক্ষাদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৪০] পরবর্তীকালে বঙ্গের মুসলিম শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।[৪১] বলা যায় মুসলিম শাসনামলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (১২০৩ খ্রি.-১৮৩৭ খ্রি.) অর্থাৎ প্রায় ছয়শত বছর ফারসি ভাষা উপমহাদেশের অফিস আদালতের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪২] সেমেটিক রক্তের বিজয়ী তুর্কী শাসক ও তাদের অনুগামী আরব ও ইরানের বণিক, ধর্ম প্রচারক, আলেম-উলামা ও সুফিগণ আরবি-ফারসি ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৪৩] তারা তুর্কী ভাষায় কথা বলতেন, আর রাজনীতিতে ফারসি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহার করতেন।[৪৪] এ সময় ফারসি ভাষা জানা এবং সে ভাষায় সাহিত্যচর্চা একটা আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হতো। ফারসির প্রচলন এ দেশে একটা আভিজাত্যে কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৪৫] বাংলায় আরবি-ফারসি ভাষার চর্চা, প্রচলন এবং সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিম বলেন,

আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান

যথেক এলম মধ্যে আরবী প্রধান॥

আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিৎ

ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত॥

ফারছি পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত।

নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥

ফারছি এলেম হয় আরবী তনয়।

আরবীর অনুরূপ ফারছি লিখয়॥

হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারছি নন্দন।

পুস্তকের লিখিয়ে (আমি) ফারছি কথন॥

এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার ।

নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার॥[৪৬]

এ সময় বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট হয়ে অত্যন্ত উঁচু মানের সাহিত্যসম্ভার রচনার দ্বারা বাংলার কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে পুথি ও প্রণয়োপাখ্যান মূলত ফারসি সাহিত্যে প্রভাবপ্রসূত।[৪৭] মধ্যযুগে এদেশে মানুষ জাতি-ধর্ম-শিক্ষা-রাজতন্ত্রের কারণে যে কয়টি ভাষার সাথে পরিচিত হয় তন্মধ্যে ফারসি অন্যতম।[৪৮] এ সময়ে মুসলমানদের রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রধান অংশই অনুবাদ মৌলিক রচনা খুবই সীমিত।[৪৯] অনুবাদের বিষয়বস্তু হিসাবে ধর্মশাস্ত্র, সুফিতত্ত্ব ও দর্শন, কাহিনীকাব্য, শোকগাথা, জঙ্গনামা ইতিহাস ইত্যাদি অনুসৃত হয়।[৫০] বাংলা কাব্যে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ফারসি ও উর্দু কাব্যের অনুবাদ রয়েছে।[৫১] দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ, আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, বাহরাম খান, সৈয়দ হামযা, সাবিরিদ খান, দোনা গাজী চৌধুরী, নওয়াজিশ খান, সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবর, সৈয়দ শেরবাজ চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রমুখ পাঠান মুঘল যুগের কবিরা, ফারসি কাব্য থেকে সরাসরি অথবা সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দুর মাধ্যমে ঐ কাব্যকাহিনীর ভাবাবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন।[৫২] ফারসি সাহিত্যের প্রেমোপাখ্যান ও বীরত্বগাথা অবলম্বনে পঞ্চদশ শতকে শাহ্ মুহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* ও *আমীর হামজা*, ষোড়শ শতকে দৌলত উজীর বাহরাম খানের *লাইলী-মজনু*, মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী*, সাবিরিদ খানের *হানিফা ও কয়রা পরী*, দোনাগাজীর সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সপ্তদশ শতকে আলাওলের সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, আবদুল হাকীমের লালমতি ও *সয়ফুলমুলুক*, *ইউসুফ-জোলেখা*, নওয়াজিশ আলী খানের *গুলে বকাওলী*, সৈয়দ মুহাম্মদ আকবরের *জবলমুলুক শামারেখ*, অষ্টাদশ শতকে আহাম্মদ মুকীমের *গুলে বকাওলী*, সৈয়দ হামজার *মধুমালতী*, ফেরদৌসির শাহ্নামার গল্প অবলম্বনে *সোহরাব-রুস্তম উপাখ্যান*, আলাওলের *পদ্মাবতী* ও *সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়।[৫৩]

২. মুসলিমদের বঙ্গবিজয় পরবর্তীকালে ফারসি চর্চা এবং বাংলা উপাখ্যান ও অনুবাদ সাহিত্য

'অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকে উপাখ্যানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এ সময়েই বেশিরভাগ ফারসি উপাখ্যানের বাংলা অনুবাদ হয়। মুসলমান কবিগণ প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত করেন। তাছাড়া তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত সাহিত্যও বাংলায় অনুবাদ

করেন। বাংলা কাব্য চর্চায় সুফি-সাধক অনুরাগীরাই প্রথমে এগিয়ে আসেন। ধর্মতত্ত্ব ও সাধনার কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা থেকে তারা অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেন। এভাবে ব্যাপকভাবে মধ্যযুগের বিচিত্রধর্ম অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।'[৫৪]

ফারসি ভাষায় রচিত *লাইলী-মজনুর* প্রেম কাহিনী নিয়ে দৌলত উযীর বাহরাম খান *লাইলী-মজনু* কাব্য রচনা করেন।[৫৫] মোল্লা জামির *য়ুসুফ জুলায়খার* কাব্যের অনুসরণে শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্য রচনা করেন এবং আবদুল হাকিম রচনা করেন দ্বিতীয় *ইউসুফ-জোলেখা*।[৫৬] তাঁর কাব্যে আখ্যানভাগও ছিল মোল্লা জামির ফারসি কাব্য।[৫৭] আলাওল আরব্য রজনী গ্রন্থের *সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল* উপাখ্যান রচনা করেন এর ফারসি অনুবাদ অবলম্বনে।[৫৮] তাছাড়া তিনি ফারসি কাব্য অবলম্বনে *সপ্তপয়কর*, *সিকান্দারনামা* ও *তোহফা* কাব্য রচনা করেন।[৫৯] আবদুল হাকিম ফারসি কাব্যাবলম্বনে *নূরনামা*, *ইউসুফ-জোলেখা*, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* গ্রন্থ রচনা করেন।[৬০] এছাড়া কবি শেরবাজ চৌধুরী ফারসি থেকে *ফিকর নামা*, কবি মুহম্মদ নওয়াজিশ খান ফারসি *গুলে বকাওলী* অনুবাদ করেন।[৬১] কবি নসরুল্লাহ্ খান ফারসি অবলম্বনে মুসার সওয়াল, আবদুল করীম খোন্দকার *দুলা মজলিস*, মুহাম্মদ নকী *তুতীনামা* এবং কবি আবদুস সামাদ *গুলিস্তান* ও *বুস্তা*-এর অনুবাদ করেন।[৬২] নিযামী গানজুবীর ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে পরাগল খান শাহা পরীর কিচ্ছা অনবাদ করেন।[৬৩] এছাড়া হাজী আলী *মওতনামা*, মুহাম্মদ আলী *হায়রাতুল ফিকাহ্*, আলী রযা ওরফে ফকীর *সিরাজ কুলুব* ফারসি মূল পুস্তক *সিরাজ কুলুব* থেকে অনুবাদ করেন।[৬৪] কবি হেয়াত মামুদ সর্বভেদ নাম দিয়ে ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।[৬৫] ফরহ্তুল্লাহ ফরহৎ কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত *হাতেমতাই* গ্রন্থটি সৈয়দ হামযা বঙ্গানুবাদ করেন। মুসশী কাদের উল্লাহ্ও *হাতেম তাই* এর একজন অনুবাদক বলে জানা যায়।[৬৬]

উল্লেখ্য যে, পয়গম্বরদের কাহিনী, হযরত রাসূল (সা.)-এর জীবন, কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত, আমীর হামযার যুদ্ধকাহিনী, হযরত আলীর পুত্র হানিফার যুদ্ধের বর্ণনা, সোনাভান, জৈগুন প্রভৃতি বীর রমণীদের বীরত্বগাথা হানিফার জঙ্গ, দাতা হাতেম তাইয়ের কেচ্ছা, আরবের প্রেমিক যুগল লাইলী মজনরি অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান, ইরানের প্রেমিক-প্রেমিকা শিরী-ফরহাদের করুণ প্রণয়কাহিনী, সোহরাব রুস্তমের কাহিনী যে ফারসি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৬৭]

মৌলভী আবদুল কাদির কর্তৃক অনূদিত সা'দির কবিতা *পুষ্পোদ্যান* ও *গোলেস্তার বঙ্গানাবাদ* নামে কলকাতা থেকে যথাক্রমে ১৯০১ ও ১৯০৫ খিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৬৮] রাজা রামমোহনের বদৌলতেও ফারসি ভাষা-সাহিত্যের ভাব বাংলা সাহিত্যে প্রবিষ্ট হয়েছে।[৬৯] আমিনুল্লাহ কর্তৃক সা'দির পান্দনামার কাব্যানুবাদ উপদেশ মালা শিরোনামে

১৯২৭ খিষ্টাব্দে নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয়।[৭০] ইসলামধর্ম সম্বন্ধে সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ মনীষী জামালুদ্দীন আফগানী কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত *নেচার* এবং *নেচারিয়া* নামক গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে *এসলাম তত্ত্ব* নামে প্রকাশিত হয়।[৭১]

মাওলানা ফরিদউদ্দীন আত্তার কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত *তাযকেরাতুল আওলিয়া* অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র *তাপসমালা* রচনা করেন।[৭২] এছাড়া গিরিশচন্দ্র সেন *দিওয়ান-ই-হাফিজ*, *গুলিস্তাঁ*, *বুস্তাঁ*, *মকতুবাত-ই-মখদুম*, *মস্‌নবী-ই-রুমী*, *মানতেকুত্তায়ের*, *কিমিয়া-ই-সাদত*, *গুলশন-ই-আসরার* পুস্তকগুলোর আংশিক অনুবাদ করেন।[৭৩] *তত্ত্বরত্নমালা* (বা তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধনীয় রচনাবলি) ভাই গিরিশচন্দ্র কর্তৃক পারস্য পুস্তক মানতেকুত্তায়ের ও মসনবীয়ে মৌলবীয়ে রোম থেকে সংকলিত।[৭৪] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে গিরিশচন্দ্রের অবদান অনন্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার মুসলমানী অধ্যাত্মবাদমূলক কিছু কবিতা অনুবাদ করেন।[৭৫] মাওলানা রুমির *মসনবী*র গদ্যানুবাদ করেন মৌলবী আযহার আলী বখতিয়ারী।[৭৬] 'মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির *মসনবী* শরীফের প্রথম কাব্যানুবাদ করেন চট্টগ্রামের মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ। অনুবাদটি অসম্পূর্ণ। 'শুকপাখি ও গজনবী হাকিমের কবিতাদ্বয়' অধ্যায় পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেছেন।'[৭৭] বাংলা পয়ারে রচিত ১৯২৩ খিষ্টাব্দে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।[৭৮]

পাকিস্তান আমলে, ১৯৫২ খিষ্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় *ইকবালের কবিতা* নামে একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়।[৭৯] সঙ্কলনটিতে কিছু খণ্ড কবিতার এবং *আসরারে-খুদি*'র কোনো কোনো অংশের অনুবাদ স্থান পেয়েছে।[৮০] এ সমস্ত খণ্ড কবিতার অধিকাংশই 'বাংগে দারা' থেকে নেওয়া।[৮১]

'১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আবুল ফারাহ মুহাম্মদ আবদুল হক অনূদিত *রুমূয-ই-বেখুদী*। ইকবালের মূল ফারসি অবলম্বনে মূলানুগ পদ্যানুবাদ করা হয়েছে বলে কাব্যটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অনুবাদ কাব্যেও সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। ইকবালের দার্শনিক তত্ত্ব-সম্বলিত ফারসি কাব্য *আসরারে খুদী*র বাংলা গদ্যানুবাদ করেছেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। গোলাম মোস্তফা ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন *কালাম ই ইকবাল*।'[৮২]

ইকবালের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে ইকবাল একাডেমি কর্তৃক নির্বাচিত উনিশটি কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন।[৮৩] বাংলাতে প্রচুর পরিমাণে অনূদিত হয়েছে ওমর খৈয়াম এবং হাফিজের কবিতা।[৮৪] বিনোদবিহারী মুখার্জী কর্তৃক *রোবাঈয়াৎ ই ওমর খৈয়াম* ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৮৫] নজরুল ইসলামও ওমর খৈয়ামের রুবাঈ অনুবাদ করেছেন।[৮৬] নজরুলের অনূদিত ১৯৮টি রুবাঈ ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৮৭] আজিজুল হাকিম অনূদিত

রোবাঈয়াৎ ওমর খৈয়াম ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে, সিকান্দার আবু জাফর অনূদিত *দীওয়ানে হাফিজ* ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে এবং শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির কর্তৃক শেখ সাদীর উপদেশমূলক কিছু কবিতার কাব্যানুবাদ *কারীমা* শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।[৮৮] এছাড়াও তৎকালীন সময়ে আরো অনেক ফারসি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ হয়েছে এবং অনুবাদের ধারা বর্তমান সময়েও অব্যাহত রয়েছে।

সুদীর্ঘকাল বঙ্গে মুসলিম শাসন অব্যাহত থাকা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনকল্পে শাসকদের আন্তরিকতা ও কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং ফারসি রাজ-ভাষার মর্যাদা লাভের কারণেই মূলত ফারসি ভাষার শব্দ বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে প্রায় ২ হাজার ৫০০ ফারসি ও ফারসি উচ্চারণে আরবি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে।[৮৯] অন্যদিকে, অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যদিয়েও বাংলা সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণ ফারসি শব্দ প্রবেশ করার উল্লেখযোগ্য একটি সুযোগ তৈরি হয়।

'সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) দরবারের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের রচনাবলি, জয়েনউদ্দীনের (পঞ্চদশ শতক) *রসুলবিজয়* প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। জয়েনউদ্দীন তাঁর *রসুলবিজয়ে* মুকুটের স্থলে 'তাজ', আরোহীর স্থলে 'সোয়ার' পিতামহের স্থলে 'দাদা' ইত্যাদি শব্দ ব্যহার করেছেন।'[৯০]

উদাহরণস্বরূপ:

তার পাছে সাজিলো সাজ নবী রাজেশ্বর॥

মুকুতা মণ্ডিত তাজ আজ অতি মনোহর॥[৯১]

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এ প্রভাব আরো ব্যাপকতা লাভ করে। সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.) ফারসি শব্দেই তাঁর কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম করেন *শবেমেরাজ* নামে। শবেমেরাজে তিনি আলিমান, আলিম প্রভৃতি শব্দ ছাড়াও আল্লাহ, রাসূলে খোদা, নূরে মোহাম্মদী, পীর-পয়গাম্বর ইত্যাদি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন।[৯২]

উদাহরণস্বরূপ:

দ্বিতীয় প্রণাম করি রছুল খোদার ।

নূর মোহাম্মদ বলি জগতে প্রচার॥

চতুর্থ প্রণাম করি পীর পেগাম্বরে।

এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়ার।

.....

আরবী ফার্ছি ভাষে কিতাব বহুত।

আলিমানে বুঝে ন বুঝে মূর্খ মূতা॥[৯৩]

উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম সর্বাধিক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৯৪]

৩. ফারসি সাহিত্যের প্রভাবপ্রসূত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা

ফারসি সাহিত্য বঙ্গীয় অঞ্চলে প্রবেশ করার পর হতেই বিভিন্ন পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিস্তার লাভ করে। ফলে এদঞ্চলের মানুষের ভাষা ও জীবনাচরণের ওপর ফারসির প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। ফারসির এ প্রভাব বাংলা সাহিত্যেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। আর এ প্রভাবের ফলেই বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট বিভিন্ন শাখা সৃষ্টি হয়। নিম্নে ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট বিভিন্ন সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো:

ক. বাংলা রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান

ফারসি সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত উঁচু মানের সাহিত্যসম্ভার রচনার দ্বারা বাংলার কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে পুথি ও প্রণয়োপাখ্যান মূলত ফারসি সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট। মধ্যযুগের অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকে উপাখ্যানের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা, এ সময়েই বেশিরভাগ ফারসি উপাখ্যানের বাংলা অনুবাদ হয়।

ফারসি সাহিত্যের প্রেমোপাখ্যান ও বীরত্বগাথা অবলম্বনে পঞ্চদশ শতকে শাহ্ মুহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* ও *আমীর হামজা*, ষোড়শ শতকে দৌলত উজীর বাহরাম খানের *লাইলী-মজনু*, মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী*, সবিরিদ খানের *হানিফা ও কয়রা পরী*, দোনাগাজীর সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সপ্তদশ শতকে আলাওলের সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, আবদুল হাকীমের লালমতি ও *সয়ফুলমুলুক*, *ইউসুফ-জোলেখা*, নওয়াজিশ আলী খানের *গুলে বকাওলী*, সৈয়দ মুহাম্মদ আকবরের *জবলমুলুক শামারেখ*, অষ্টাদশ শতকে আহাম্মদ মুকীমের *গুলে বকাওলী*, সৈয়দ হামজার *মধুমালতী*, ফেরদৌসির শাহ্নামার গল্প অবলম্বনে *সোহরাব-রুস্তম উপাখ্যান*, আলাওলের *পদ্মাবতী* ও *সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়।

খ. মর্সিয়া সাহিত্য

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান ব্যাপকভাবে বাংলায় প্রবেশ করে।[৯৫] এ সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যায়। কারবালার মরুপ্রান্তরে নিহত ইমাম হুসেন এবং অন্যান্য বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশংসাসূচক কবিতাই বিশেষভাবে মর্সিয়া নামে অভিহিত।[৯৬] শিয়া-ভাবধারার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ার ফলে এবং সুন্নী মুসলমানদের মনে ধর্মবোধ ও ধর্মপ্রবৃত্তি জাগরুক থাকার কারণে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকগণ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কারবালার ইমাম হোসেনের আত্মত্যাগ সম্পর্কিত ঘটনাকে ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয়।[৯৭] ষোড়শ শতকের দৌলত উজির বাহরাম খানের *জঙ্গনামা*, শেখ ফয়জুল্লাহর লেখা *জয়নাবের চৌতিশা*, মুহাম্মদ খানের *মক্তুল হোসেন* (১৬৫৪ খ্রি.), হেয়াত মামুদের *জঙ্গনামা* (১৭২৩ খ্রি.), কবি শেরবাজের *ফাতেমার হাজার সওয়াল*, *কাশিমের লড়াই*, কবি জাফরের *শহীদ-ই-কারবালা*, *সখিনার বিলাপ*, কবি হামিদের *সংগ্রাম হুসন* প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্যের ধারা তৈরি করে যা মূলত ফারসি সাহিত্যের মর্সিয়া সাহিত্যধারারই প্রভাব-জাত।[৯৮]

'কারবালার ঘটনাকেন্দ্রিক আরও একটি গ্রন্থ হচ্ছে কায়কোবাদের *মহরম শরীফ* এতে ইমাম হোসেনের শাহাদাতকে স্মরণ করে রচিত একটি মর্সিয়াও ঠাঁই পেয়েছে। কারবালার বেদনাবিধূর ঘটনা অবলম্বনে কায়কোবাদের জ্যেষ্ঠ মশাররফ হোসেন *বিষাদসিন্ধু* শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও কারবালার ঘটনা অবলম্বনে মর্সিয়া রচনা করেছেন এবং তাঁকে *ফাতেহায়ে ইয়ায দাহোম* ও *ফাতেহায়ে দোয়ায দাহোম* শীর্ষক সম্পূর্ণ ফারসি শিরোনামে কবিতা রচনা করতেও দেখা যায়।'[৯৯]

বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য রচনা প্রসঙ্গে গোলাম সাকলায়েন বলেন,

'এই কাব্যগুলির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তাঁহাদের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলেন ও তাঁহারা ইহার মারফত অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিলেন। বাংলা মর্সিয়া কাব্যগুলি প্রধানত অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে গড়িয়া উঠে। বাঙালি কবিগণ যদিও মূলত ফারসি ও উর্দু কাব্যগুলির ভাবকল্পনা ও ছায়া আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন তথাপি এগুলির মধ্যে তাঁহাদের মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ফলে এই কাব্যগুলি এক প্রকার অভিনব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর আরব পারস্যের মানুষের কাহিনী কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া কবিগণ যে বাগভঙ্গি ও পরিকল্পনা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব ও উদ্ভট হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, বাঙালি কবিগণ মাটির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।'[১০০]

গ. দোভাষী বা পুঁথি সাহিত্য

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে মুসলমান কবিদের হাতে আরবি-ফারসি শব্দবহুল দোভাষী নামে একটি কাব্যধারার জন্ম হয়।[১০১] এ বিষয়ে দুজন বড় কবি হলেন শাহ গরীবুল্লাহ (সপ্তদশ শতক) ও সৈয়দ হামজা (অষ্টাদশ শতক)।[১০২] এ পুথি সাহিত্যও মূলত অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাবপ্রসূত। দোভাষী সাহিত্যকে পুথি সাহিত্যও বলা হয়ে থাকে। এর অন্যান্য আরো অনেক নামকরণ করা হয়েছে। যেমন: দোভাষীপুথি, কলমীপুথি, এসলামি বাংলা, মুসলমানি বাংলা, মিশ্ররীতির সাহিত্য, মাঝিমাল্লার ভাষা, দোভাষী রীতি, বটতলার পুথি, চলতি বাংলা ইত্যাদি।[১০৩]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পুথি সাহিত্য বা ইসলামি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বলেন,

'এই পুথি সাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি এক শ্রেণীর বাংলা কাব্য, যাহার বিষয় বস্তু হইতেছে মুসলমানদের ধর্মীয় বা জাতীয় ঐতিহ্য। এই জন্য ইহাতে আমরা পাই পয়গম্বরদের (আ.) জীবন, হযরত রসূলুল্লাহের (দঃ) জীবনী, কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত, আমীর হামজার যুদ্ধকাহিনী, হযরত আলীর পুত্র হানিফার যুদ্ধের বর্ণনা, সোনভান-জৈগুন প্রভৃতি বীর রমণীদের লাভের জন্য হানিফার জঙ্গ, দাতা-হতেম তাই-এর কেচ্ছা, আরবের প্রেমিক যুগল লায়লী মজনুর অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান, ইরানের প্রেমিক প্রেমিকা শিরী ফরহাদের করুণ প্রণয় কাহিনী, কুরআন শরীফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৃত্তান্ত অবলম্বনে রোমান্টিক কাব্য য়ুসুফ-যোলায়খা প্রভৃতি। এইগুলি পাক ভারতের বাহির হইতে আমদানী। পাকভারতের ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা পাই কালুগাজী চম্পাবতীর কাহিনী। ইসমাইল গাযী, গোরাচাঁদ পীর, মোবারক গাযী, শাহজালাল, বনবিবি, বড়খাঁ গাযী প্রভৃতি পীরগণের ঐতিহ্যমূলক কাব্য। বাংলাদেশের মুসলিম শূরবীরগণও বাদ পড়েন নাই, যেমন ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলী, শমশের গাযী প্রভৃতি। এই পুথি সাহিত্য নারীগণকে অবহেলা করে নাই; যেমন দেওয়ানা মদিনা, ভেলুয়া সুন্দরী, মহুয়া, কাজলরেখা, নুরন্নেহার প্রভৃতি। বাংলায় কতকগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যমূলে হিন্দু বা বৌদ্ধ সমাজে উৎপন্ন হইলেও পুথি লেখকেরা সেগুলি ত্যাগ করেন নাই। এই জন্য আমরা মুসলমানি পুথি সাহিত্যের মধ্যে সত্যপীরের কাহিনী, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি বিষয়ের কাব্য দেখিতে পাই। মোট কথা, এই পুথি সাহিত্যকে বাংলার মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বলা যাইতে পারে।'[১০৪]

আলোচ্য পুথি সাহিত্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক প্রায় শতাধিক হিন্দু ও মুসলমান কবি ও তাঁদের কাব্য আবিষ্কারের ফলেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়।[১০৫] এ পুথি নির্ভর করেই বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ।[১০৬]

ঘ. জীবনী সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে জীবনী সাহিত্য নামে একটি সমৃদ্ধ ধারা গড়ে ওঠে যা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দু কবিদের লেখা চরিত সাহিত্যের অনুকরণে বাংলায় মুসলমান কবিরা যে জীবনী সাহিত্য রচনা করেন তার উৎস ও তথ্যসূত্র ছিল আরবি-ফারসি।

বাংলা সাহিত্যে রচিত জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন,

'চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের চরিতকথাগুলো যেমন একাধারে জীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও রূপকথাজাতীয় কাহিনীকাব্য এগুলোও তেমনি গ্রন্থ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও চৈতন্যচরিত্রগুলোর অনুকরণে এগুলো রচিত। নবীবংশ, রসুলবিজয়, জঙ্গনামা, মক্তুলহোসেন, হানিফার লড়াই, কাসাসুল আম্বিয়া, সিফতুল আম্বিয়া, হাতেমতাই, আমীর হামজা প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা সাধারণভাবে জীবনী-সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করি।'[১০৭]

'এ ধারার প্রধান কবি ছিলেন সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.)। তাঁর রচিত জীবনী কাব্যগুলো হলো: *নবীবংশ*, *শব-ই-মিরাজ*, *রসুলবিজয়*, *ওফাৎ-ই-রাসুল*। তেতাল্লিশজন ওলী-দরবেশের জীবন কাহিনী নিয়ে জনাব আলীর লেখা *কিসাসুল আম্বিয়া* হলো আরেকটি উল্লেখযোগ্য জীবনী কাব্য।'[১০৮] এ ধারায় আরো যারা কাব্য রচনা করেছেন তাদের মধ্যে মুহাম্মদ খাতের, শেখ চাঁদ, শেখ মনোহর, মুহাম্মদ উজির আলী, আবদুল করীম খোন্দকার, নসরুল্লাহ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।[১০৯]

ঙ. সওয়াল সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রচিত সওয়াল সাহিত্যও ফারসি সাহিত্যের প্রভাবের বাইরে যেতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে শেরবাজ চৌধুরী বলেন,

ফক্করনামা করি এক আছ এ কিতাব

কহিমু যথেক কথা আছে পরস্তাব।

সকলে না বুঝে দেখি ফারসি বচন

কহিমু বাঙ্গালা ভাষে বুঝিতে করণ।[১১০]

সওয়াল সাহিত্যে সাধারণত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাহিত্য রচনা ও বিদ্যাচর্চা হয়ে থাকে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন বা নীতিশাস্ত্র প্রচারের প্রথা সুপ্রাচীন।[১১১]

এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ বলেন,

'গ্রীক পণ্ডিতদেরও আগের কাল থেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান আহরণের রীতি চালু রয়েছে। ফলে সেকালের গ্রন্থে গুরুশিষ্যের কিংবা জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ঐহিক ও পারত্রিক সব রকমের বিষয় ও শাস্ত্র আলোচিত হত। আঠারো শতক অবধি আমাদের বাংলা ভাষায়ও উক্ত প্রাচীন রীতির অনুসরণে শাস্ত্রকথা ও তত্ত্বচিন্তা প্রশ্নোত্তরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।'[১১২]

এ প্রথার অনুসরণ করে বাংলায় রচিত হয় মুহাম্মদ আকীলের *মুসানামা* বা *মুসার হাজার সওয়াল*, ত্রিপুরার কবি শেখ সাদীর *গদামল্লিকা সংবাদ*, এতিম আলমের *আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল*, আলী রেজার *সিরাজ কুলুব*, শেখ শেরবাজ চৌধুরীর *ফক্কর নামা* বা *মল্লিকার হাজার সওয়াল*, সৈয়দ নুরুদ্দীনের *মুসার সওয়াল* প্রভৃতি কাব্য।[১১৩] এ ধারার আরো কয়েকজন কবি হলেন শেখ সাদী, এতিম আলম, আলি রজা, আবদুল করিম খোন্দকার, নসরুল্লাহ খোন্দকার, মুহাম্মদ আলী প্রমুখ।[১১৪]

আহমদ শরীফ বলেন,

'মধ্যযুগের এই গ্রন্থের লেখকরা লোক-শিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ দৃষ্টিতে এঁদের 'সওয়ালসাহিত্য'কে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। সেকালে কথকতার মাধ্যমে অথবা শ্রুতিস্মৃতির মাধ্যমেই নিরক্ষর মানুষ জগৎ ও জীবন, ধর্ম ও সমাজ, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো। আর এভাবে লব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে মানুষ পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে হত যত্নবান। সেদিক থেকে এ সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিমেয়। কেননা, এতে মানুষের মনুষ্যত্বেও বিকাশ না ঘটলেও সমাজশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছিল, একটি স্থূল নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা মানুষের পতন-পথরুদ্ধ রেখেছিল।'[১১৫]

৪. আঠারো ও ঊনিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসির অবস্থান

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে ও সাহিত্যে ফারসি ভাষার বিভিন্ন শব্দ এতো বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, বিশেষত প্রাত্যহিক জীবনের আবশ্যকীয় বাংলা শব্দ ও নামের স্থলে ফারসি শব্দ প্রতিস্থাপিত হয়ে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়। যেমন: মা-বাবা, আরাম-আয়েশ, আইন-আদালত, ঈমান-আকিদা, কম-বেশি, নামায-রোযা ইত্যাদি। উইলিয়াম গোল্ডস্যাক প্রণীত *Mussalmani Bengali-English Dictionary,* গোলাম মাকসুদ হিলালী প্রণীত *Perso- Arabic Elements in Bengali* এবং হরেন্দ্রচন্দ্র পাল রচিত *'বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ'* অভিধানগুলো বাংলা ও ইরানের ভাষার মধ্যস্থিত পারস্পারিক সম্পর্কের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।[১১৬]

'হিলালী প্রণীত *Perso- Arabic Elements in Bengali* (*বাংলা ভাষায় ফারসি আরবী উপাদান*) নামক অভিধানটিতে আরবি-ফারসি ভাষার প্রচুর শব্দের সমাহার পরিলক্ষিত হয়। এ অভিধানটিতে দেখানো হয়েছে ৫ হাজার ১৮৬টি ফারসি ও আরবি শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ যা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।'[১১৭]

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ভাণ্ডারেও ফারসি ভাষার শব্দের উপস্থিতিও কম নয়। গবেষক যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক *Perso Arabic Elements in Chittagong bangla* শিরোনামে যে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন তাতে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত প্রায় তিন হাজার আরবি-ফারসি শব্দ স্থান পেয়েছে।[১১৮]

উনিশ শতকেও ফারসি ভাষার শব্দাবলি ও এর সাহিত্য অনুসরণের ধারা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের গযলের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন:

মোদের নবী আল-আরাবী
সাজল নওশার নওল সাজে,
সে রূপ হেরি নীল নভেরই
কোলে রবি লুকায় লাজে॥
আরাস্তা আজ জমীন আসমান
হুর পরী সব গাহে গান,
পূর্ণ চাঁদের চাঁদোয়া দোলে
কা'বাতে নৌবত বাজে॥
কয় 'শাদী মোবারকবাদী'
আউলিয়া আর আম্বিয়ায়,
ফেরেশতা সব সওদা খুশীর
বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে॥
গ্রহ তারা গতি-হারা
চায় গগনের ঝরোকায়,

খোদার আরশ দেখছে ঝুঁকে

বিশ্ব-বিধুর হৃদয় রাজে॥[১১৯]

বাংলা সাহিত্যে, ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে সাহিত্য রচনার ধারা ও বাংলা সাহিত্যে পারসিক ধাঁচের সাহিত্যকর্মের সূচনা বঙ্গীয় অঞ্চলে ফারসির প্রবেশের পর হতেই বিদ্যমান। আর কালের পরিক্রমায় এতে আরো নতুন নতুন কবি সাহিত্যিকদের পদচারণা পরিলক্ষিত হয়। যদিও নজরুলই সর্বাধিক ফারসি শব্দ ব্যবহারে কাব্য রচনা করেছেন তবু তিনি ছাড়াও অন্যান্য অনেক কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মেও ফারসি ধাঁচের সাহিত্যশৈলী নজরে আসে। বাংলার অপরাপর অনেক কবি যেমন-কবি হাজী মুহম্মদ (১৫৫০-১৬২০ খ্রি.), কবি শেখ চাঁদ (১৫৬০-১৬২৫ খ্রি.), কবি মুহম্মদ খাঁন (১৫৮০-১৬৫০ খ্রি.), কবি হেয়াত মামুদ (১৬৮০-১৭৬০ খ্রি.) নিজের কবিতায় ইরানি স্টাইল গ্রহণ করেন।[১২০]

৫. বিশ শতক ও তৎপরবর্তীকালে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় কবি-সাহিত্যিকরা

বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ও সম্পর্ক বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে তৎপরবর্তী সময়ে নবতররূপে পরিলক্ষিত হয়। কেননা, এ সময়ের মুসলিম লেখকগণ যেমন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১ খ্রি.), ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০ খ্রি.), শাহাদাৎ হোসাইন (১৮৯৩-১৯৫৩ খ্রি.), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি.), কাজী মাজহার হোসাইন, গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রি.), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি.), আখতারুল আলম, সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮ খ্রি.), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২ খ্রি.), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২ খ্রি.), জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রি.) সহ আরো অনেকে বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেছেন যেগুলোতে ফারসি শব্দসম্ভার ব্যবহারের সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ।[১২১]

বাংলায় অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ এ ফারসি সাহিত্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে এমন আরো অনেক গ্রন্থ (রচিত ও অনূদিত) হয়েছে। এরকম কিছু গ্রন্থের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (ফেব্রুয়ারি-১৯৯৪): *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

২. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (অক্টোবর, ১৯৮৩): *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩. মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী (১৯৯৯): *বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা*, আর, আই, এস পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ।

৪. মনিরউদ্দীন ইউসুফ (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১): *ফেরদৌসীর শাহনামা* (অনূদিত), প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইসহাক (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪): *বিশ্ব প্রেমিক রুমী*, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, সিফাত প্রকাশনী।

৬. ড. আমিনুল ইসলাম (১৯৯২): *জগত জীবন দর্শন*, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ* (জুন, ১৯৯৫): প্রথম খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৮. অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (জানুয়ারি-১৯৭৮): *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমী।

৯. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১): *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, সম্পাদিত, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১০. আবদুল কাদির (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪): *ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক বক্তৃতামালা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১. রশিদ আহমদ জৌনপুরি (জানুয়ারি-২০০৫): *কোরআন, হাদিস ও সূফীতত্ত্বের ভূমিকা*, সৈয়দ রশিদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশন।

১২. আশরাফ আলী থানবী (ফেব্রুয়ারি-১৯৯৩): *সূফিয়ায়ে কেরামের বাণী*, অনুবাদ-কারামত আলী নিযামী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী।

১৩. সাসান বালেগিযাদে (অক্টোবর, ২০০৫): *মাওলানা রুমীর গল্প*, খলিফা সাইফুল ইসলাম (অনূদিত), প্রথম প্রকাশ, ঢাকা।

১৪. জাহান-আরা বেগম (এপ্রিল, ১৯৭৬): *বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৫. সাখাওয়াত হোসেন মজনু, মণি, মর্জিনা আখতার (অক্টোবর-১৯৯৭): *সুফীতত্ত্বের গবেষক ছৈয়দ আহমদুল হক*, সৃজনী প্রকাশনী সংস্থা।

১৬. আবদুল মজীদ (২০০২): *মসনবীয়ে রুমী*, এমদাদিয়া পুস্তকালয় ঢাকা।

১৭. আব্দুল মওদুদ (১৯৯৪): *মুসলিম মনীষা*, ৪র্থ মুদ্রণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ।

১৮. গোলাম রসুল (১৯৭৭): *বিশ্ব মরমী চিন্তাধারায় রূমী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৯. সাইদুর রহমান (১৯৮৪): *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, আমিনুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

২০. আহমদ শরীফ (১৯৬৯): *বাঙলার সূফী সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

২১. আহমদ শরীফ (জুলাই, ২০০৩): *বাঙলার সূফী সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, সময় প্রকাশন।

২২. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (ফেব্রুয়ারি, ২০০৮): মসনবী শরীফ (প্রথম খন্ডের প্রথমার্ধ), খায়রুন প্রকাশনী।

২৩. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার (জুন-১৯৮৪): *ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী*, বাংলা একাডেমী।

২৪. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (জুন, ১৯৯৫)*:* প্রথম খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৫. খালিদ সাইফ (ফেব্রুয়ারি, ২০০৮): *জালালুদ্দিন রুমি প্রেমের কবিতা*, বাঙলায়ন, ঢাকা।

২৬. সৈয়দা তাকলিমা সুলতানা (জানুয়ারি, ২০০৭): *সূফীবাদের আত্মপরিচয় ও ক্রমবিকাশের অন্তরায়*, সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৭. ছৈয়দ আহমদুল হক (নভেম্বর-১৯৯০): *প্রবন্ধ বিচিত্রা*, প্রকাশক-সৈয়দ মাহমুদুল হক ও নজরুল ইসলাম চৌধুরী।

২৮. ছৈয়দ আহমদুল হক (২০০৩): *ফার্সী গজল সংকলন*, আল্লামা রুমী সোসাইটি।

২৯. ছৈয়দ আহমদুল হক (জুন-২০০৭): *বাংলাদেশের সুফী সাহিত্য*, আল্লামা রুমী সোসাইটি।

৩০. ছৈয়দ আহমদুল হক (আগষ্ট-২০০০): *মসনবী শরীফের কাহিনী ও মর্মবাণী*, আল্লামা রুমী সোসাইটি।

৩১. ছৈয়দ আহমদুল হক (আগষ্ট-২০০৪): *মসনবী শরীফের পয়গাম ও তফসির: বাণী ও ভাষ্য*, আল্লামা রুমী সোসাইটি।

৩২. ছৈয়দ আহমদুল হক (আগষ্ট-১৯৯৬): *মুরলীর বিলাপ*, আল্লামা রুমী সোসাইটি।

৩৩.মুহম্মদ এনামুল হক (১৯৩৫): *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, মহসীন এন্ড কোম্পানি, কলিকাতা।

৩৪.মুহম্মদ এনামুল হক (ফেব্রুয়ারি, ২০০৬): *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব, বঙ্গীয় মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের এক অধ্যায়*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

৩৫.মোঃ আবদুল হামিদ ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই (জানুয়ারি, ২০০১): *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অনন্যা প্রকাশনী।

৩৬.আসগর হোসাইন (১৯৪৩): *মাওলাভীয়ে মা'নাভী*, সাহারানপুর।

৩৭.কাজী সাজ্জাদ হোসেন (১৯৬১): *বোস্তান-এ-সাদী*, সরবরঙ্গ কিতাব ঘর, দিল্লী, ভারত।

৩৮.মনিরউদ্দীন ইউসুফ (জুন-১৯৬৭): *রুমীর মসনবী*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

৩৯.জেহাদুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম খান (সেপ্টেম্বর-২০০৩): *দিওয়ান-ই-মুইনুদ্দিন*, খাজা মঞ্জিল, ৫৯২, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

৪০.আহমাদ তামীমদারী, (ফেব্রুয়ারি-২০০৭): *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, অনুবাদ- তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা।

৪১.আবদুল মালেক নূরী (ফেব্রুয়ারি-২০০৪): *সুফীবাদ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।

৪২.মোহাম্মদ গোলাম রসূল (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪): *মওলানা জালালুদ্দীন রুমী*, প্রথম প্রকাশ, বগুড়া।

৪৩.চৌধুরী, শামসুর রহমান (ফেব্রুয়ারি-২০০২): *সুফিদর্শন*, দিব্য প্রকাশ।

৪৪.এম নূরুর রহমান (১৯৭৯): *কিমিয়ায়ে সাআদত*, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

৪৫.জালালউদ্দিন রুমী (জুন-২০০৬): *দিওয়ান ই শামস্ ই তাবরিজ*, অনুবাদ- এস খলিলউল্লাহ, র‍্যামন পাবলিশার্স।

৪৬.আবদুস সাত্তার (জুন, ১৯৮৭): *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ২য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ফারসি ভাষার প্রয়োগ কেবলমাত্র শিল্প ও সাহিত্য অঙ্গনেই হয়নি বরং কুরআন-হাদীস, ইতিহাস এবং অন্যান্য ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে।[১২২] এ বিষয়টি অস্বীকার করার সুযোগ নেই।[১২৩] কিন্তু, বাংলায় মুসলিমদেও বিজেতাদের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলের হিন্দু রাজাদের শাসনকালে তাদের এবং তাদের ব্রাহ্মণ ধর্ম গুরুদের প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত থাকায় বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারে তাদের কেনো উদ্যোগ কিংবা আগ্রহ কেনোটিই

প্রত্যক্ষ করা যায় না। একই সঙ্গে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার ও বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ফারসি সাহিত্যের উপাদানের প্রবেশও বাংলায় ছিল সীমিত। হিন্দু রাজা এবং ব্রাহ্মণেরা বাংলা ভাষায় কথা বলাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো।[১২৪] কিন্তু বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তনের ফলে এর পটপরিবর্তিত হয়।

উল্লেখ্য যে,

'মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক বাংলা বিজিত হওয়ার পর, তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে। তাঁরা মনে করেন এ দেশের মানুষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের জন্য এ ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করা অত্যন্ত জরুরী। তাই মুসলিম শাসকগণ বাংলা ভাষার প্রচার, প্রসার এবং পরিচর্যার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যদিও এ সময়ের বাংলার অধিকাংশ শাসকই তুর্কী ও মুঘল ছিলেন। তা সত্ত্বেও ফারসি ভাষার ব্যবহার এককভাবে তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। এ কারণে দু'টি ভাষার কোনোটিকেই তাঁরা খাটো করে দেখেননি। এ সুবাদে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফারসি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে; যার মাধ্যমে এ দু'ভাষার মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।'[১২৫]

ফলস্বরূপ উত্তরকালে এবং অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষার অনেক শব্দাবলি আমাদের নিজস্ব উৎস ও মূলগত শব্দের মতোই ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং ফারসি সাহিত্যের অসংখ্য উপাদান ও নিদর্শনাবলি পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গীয় অঞ্চলে ফারসি সাহিত্যের সূচনা, বিকাশ ও বিস্তৃতি

সুপ্রাচীনকাল হতেই বঙ্গভূমির সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক, এবং সাংস্কৃতিক কারণগুলোই এ নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বৃটিশ প্রাচ্যবিদ গোতনারের মতে গুপ্ত যুগে ইরানি ও ভারতীয়দের এই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল শীর্ষ পর্যায়ের।[১২৬] এপ্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু বলেন,

"Among the many nations and people that have come into with India and left their mark on her life and culture, the oldest and the most consistent are the Iranians."[১২৭]

'ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে বঙ্গভূমি তথা এ উপমহাদেশের সাথে ইরানি জাতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সুগভীর সম্পর্কের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ইরান ও ভারতের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই যে

অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তার বেশ কিছু নিদর্শন আমরা খুঁজে পাই ইরানের প্রাচীন স্থাপত্য তাখ্‌তে জামশীদ (Persepolis)-এর দেয়ালগাত্রে খোদাইকৃত বর্ণনায়।'[১২৮]

১. ইরানিদের ভারত শাসন ও মুসলিমদের সিন্ধু বিজয়

'খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে ইরানের সাসানিগণ ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত চলে আসে এমনকি গুপ্তদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র 'মালাভে' দখল করে নেয়। ..... প্রথম খসরু বা বাদশাহ আনুশিরওয়ান (৫৩১-৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দ)-এর শাসনকালে সিন্ধু, পাঞ্জাব এমনকি হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অঞ্চল সাসানি রাজত্বের অন্তর্ভূক্ত হয়। ..... এই সময়ে ইরানি সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে তেমনি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিও ইরানে প্রবেশ করে।'[১২৯]

ইসলাম পরবর্তী সময়ে ইরান ও ভারতবর্ষের মধ্যকার এ ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরো বেগবান হয়। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে (২১ হিজরি) আরব সেনাবহিনী ও পারস্যের সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্লাদিসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সেরিসফোন বা আর মাদায়েন অঞ্চলটি দখলের মাধ্যমে আরবরা পারস্য বিজয় সম্পন্ন করে।[১৩০] ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে (২৩ হিজরি) আরবরা মাকরান (বর্তমান বেলুচিস্তান) অঞ্চল পর্যন্ত, যা ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়।[১৩১] আর এ অঞ্চলটি বিজয়ের ফলেই ভারতবর্ষে ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। ইরানের সর্বশেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদ গারদ ৬৫১/৬৫২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইরান পুরোপুরি আরব শাসকদের অধীনে চলে আসে।[১৩২] ফলে পরবর্তীতে ইরানিরাও সহজেই ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে S.H.S.K. Haj Seyyed Javadi বলেন,

Iranian's embraced Islam with an open heart left no stone unturned in then efforts for the spread and propagation of this divine faith.[133]

সাসানি রাজবংশের পতনের পর নানা স্তরের বিপুল সংখ্যক ইরানি ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে পাড়ি জমায়।[১৩৪] উত্তরকালে এরাই ইরান ও উপমহাদেশের অভিন্ন সংস্কৃতির সূচনালগ্নের ধ্বজাধারী হিসেবে এদঞ্চলে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাসানি রাজবংশের পতনোত্তর ইরান ও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জীবনের সামগ্রিক কার্যকলাপ ও জীবনাচরনের মাধ্যমেও এ অভিন্নতা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ইরানিরা আরব সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে তারা মাহলাব বিন আলী সাফরাহ্-এর মুসলিম বাহিনীর অধীনে পেশোয়ার, খোরাসান, আফগানিস্তান ও খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন।[১৩৫]

পারস্যের সেনাবাহিনীর এই অংশটি পরবর্তীকালে মুহাম্মদ বিন কাসিম সাক্বাফী'র বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু আক্রমণ করে।[১৩৬] তারা সিন্ধু এলাকা ও ভারত মহাসাগর থেকে মূলতান পর্যন্ত দখল করে এবং ভারতের একটি অংশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে।[১৩৭] মুহাম্মদ বিন ক্বাসিম সাক্বাফী সিন্ধু অঞ্চল আক্রমণের পূর্বে ইরানের সিরাজ নগরীতে দীর্ঘ ছয় মাস অবস্থান করেন, ফলে তাঁর সেনাবাহিনীতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং দার্শনিক চিন্তা-চেতনায় পারদর্শী লোকদের প্রাধান্য দেখা যায়।[১৩৮]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের প্রেক্ষাপটে বঙ্গভূমিতে ইসলামের প্রবেশ ঘটে এবং তৎপরবর্তী সময়ে আরব ও ইরানিদের মাধ্যমে আরবি ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার, প্রচার, প্রচলন ও চর্চা শুরু হয়। আরবি ও ফারসি সাহিত্যের ইসলামি ভাবধারার গ্রন্থগুলো পঠন, পাঠন, চর্চা ও অনুবাদের কাজটিও এর সাথে সাথে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করার ফলে ইসলাম প্রচারের পথটিও সুগম হয়ে যায়। ঐসময়ের একটি বিখ্যাত *'মিহাজুল মাসালেক'* যা খাজা ইমাম ইব্রাহীম সংকলন করেন। এটি আরবী ভাষায় লিখিত, বইটির মূল অংশগুলো কালের আবর্তে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।[১৩৯]

২. মুসলিম শাসকদের আমলে ফারসির চর্চা ও বিকাশ

বাংলায় মুসলিম শাসনামলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা, প্রচার ও প্রসার ঘটে। ফারসির এ ব্যাপক বিস্তার, বিস্তৃতি, উৎকর্ষ ও বিকাশের পেছনে বিভিন্ন মুসলিম শাসনকাল ও শাসকদের অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

গজনবী আমলে ফারসি চর্চা

উল্লেখ্য যে, গজনবী সুলতানদের সময় বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। গজনবী যুগের প্রথম বাদশাহ আলে সাবুকতাগিন ভারতবর্ষে ইসালাম প্রবেশের পর আগমন করেন।[১৪০]

এ প্রসঙ্গে আবদুস সাত্তার বলেন,

'আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে যেমন আব্বাসীয় খলীফা হারুন অল-রশীদ এবং তাঁ পুত্র আল-মামুনের ভূমিকা ছিল অসামান্য তেমনি ফারসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তৃতিতেও গজনবী শাসক সুবক্তগীন (মৃত্যু ৯৯৭ খ্রীঃ) ও তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদ (মৃত্যু ১০৩০ খ্রীঃ)-এর অবদান নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র ইরানীয়

ভূখণ্ড, তুর্কিস্তান এবং সুদূর ভারতবর্ষ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, ফারসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্রময় ধারাও তাঁরা সমানভাবে প্রবাহিত করেন।'[১৪১]

'সুলতান মাহমুদের সেনাবাহিনীতে অগণিত ফারসি পণ্ডিত, বিদ্বান, কবি-সাহিত্যিকসহ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যারা ইরানের ভাষা ও সাহিত্য এবং রীতি নীতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। ফলে দেখা যায় ঐ সময় থেকেই ইরানি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামি চিন্তা-চেতনা হিন্দুস্তানে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ..... ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়-এই অঞ্চলে Intellectual tradition বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রথা, সূফীবাদ ও আধ্যাত্মবাদ ইরানের প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'[১৪২]

ঐ সময়ের বুদ্ধিজীবীরা ফারসি ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।[১৪৩] এইসময়ের একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও সূফী শেখ আলী ইব্ন ওসমান হাজভেরী[১৪৪] ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে গজনী থেকে লাহোরে পৌঁছান এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী আধ্যাত্মবাদের ওপরে *কাশ্ফুল মাহজূব* নামক ফারসি গদ্য গ্রন্থটি রচনা করেন।[১৪৫]

আবুল ফারজ রুনী হচ্ছেন গজনবী সময়ের প্রথম কবি যিনি ফারসি ভাষায় একটি কাব্য সমগ্র সংকলন করেন, তার জন্ম ও বিকাশ লাহোরেই ঘটে।[১৪৬] এই সময়ের প্রথম মহিলা কবি রাবেয়া, যিনি ইরানের তৎকালীন সময়ের বরেণ্য ব্যক্তি কাব কাযভীনীর কন্যা ছিলেন। পারস্যের খ্যাতিমান কবি আব্দুর রহমান জামী তাঁর সময়কার মহিলা সূফী কবি হিসাবে তাকে উল্লেখ করেছেন।[১৪৭] কবি রাবেয়া কিছুদিন বালখ্ নগরীর উপকণ্ঠে বসবাস করেছিলেন।[১৪৮] তবে এখন অঞ্চলটি সিন্ধু এলাকার কুজদার এলাকা হিসেবেই পরিচিত।[১৪৯]

এ সময়ের একজন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক হলেন খাজা মুঈনউদ্দীন চিশ্তি। যিনি ভারতীয় উপমহাদেশে আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদের মধ্যমণি হিসেবে পরিগণিত। ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার সংকলিতরূপ হিসেবে একটি *দিওয়ান*-এর সন্ধান পাওয়া যা *দিওয়ান-ই-মঈনুদ্দিন* নামে পরিচিত। আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদ বিষয়ে এ উপমহাদেশে তাঁর বহুল জনশ্রুতি ও ভক্ত অনুরাগী রয়েছে।

'১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বজাহানের অন্যতম সূফী সাধক খাজা মুঈনউদ্দীন চিশ্তি বোখারার চিশ্ত নগর থেকে আজমীরে পদার্পণ করেন এবং দিক-নির্দেশনা মূলক (আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা সম্বলিত) পথ প্রদর্শন করেন। অতঃপর ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে আজমীরেই স্রষ্টার সান্নিধ্যে মিলিত হন।'[১৫০]

ঘোরী রাজত্বকালে ফারসি চর্চা

গজনবী শাসনের পরবর্তীকালেও এতদঞ্চলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এবং ফারসি সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য যে, গজনবী শাসনের অবসানের পরপরই ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে ঘোরী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫১] ইতিহাসের তথ্যমতে জানা যায় যে, এই রাজবংশটি বাংলা তথা এ উপমহাদেশে একটি দীর্ঘ ও সফল শাসনকাল অতিবাহিত করে। আফগানিস্তানের এ রাজবংশটি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে শাসনব্যবস্থা বহাল রাখে।[১৫২] তারা তাদের রাজত্ব বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করে।[১৫৩] ঘোরী সুলতানের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির ১২০৩-৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড় বা নদীয়া জয় করে বাংলাভাষী অঞ্চলে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটান।[১৫৪]

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মঈজুদ্দিন মুহাম্মদ সামের (শিহাবুদ্দিন ঘুরী) সিপাহসালার ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকেই এদেশে ফারসি চর্চা ইতিহাসে স্বীকৃত স্থান লাভ করে এবং এতদঞ্চলের লোকজন ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে শুরু করে।[১৫৫]

সুলতান অব দিল্লীর শাসনকালে ফারসির চর্চা ও বিকাশ

ঘোরী পরবর্তী যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে 'সুলতান অব দিল্লী'র শাসনকালেও ফারসি ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা, সংকলন, অনুবাদ পরিলক্ষিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট যুগের শাসকগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। এ অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনাকারী পাঁচটি রাজবংশকে একত্রে সুলতান অব দিল্লী[১৫৬] নামে অভিহিত করা হয়।[১৫৭] নিম্নে সুলতান অব দিল্লীর শাসনকালে ফারসির চর্চা ও বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ক. মামলুক রাজত্বকালে ফারসি চর্চা

ঘোরী রাজত্ব অবসানের পরপরই ভারতীয় উপমহাদেশে মামলুক সাম্রাজ্য (১২০৬-১২৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়েই এ অঞ্চলে মোহাম্মদ আওফী নামক একজন বিখ্যাত লেখক দুটি অমূল্য গ্রন্থ রচিত হয়। বই দু'টি হচ্ছে যথাক্রমে '*লুবাবুল আলবাব*' (কবি- সাহিত্যিকদের জীবনী সংকলন) এবং '*জামেউল হেকায়াত*'।[১৫৮]

গ্রন্থ দু'টি সুলতান নাসিরুদ্দীন কুবাচার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়।[১৫৯] ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষায় অনূদিত সর্বপ্রথম সাহিত্যকর্ম রচিত হয় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক সময়েই এবং তা শুরু হয় সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে। আর, ফারসিতে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় '*বাহরুল হায়াত*'।[১৬০] আলী মর্দান খলজীর শাসনামলে (১২০৯-১২১৬ খ্রি.) প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী ব্রাহ্মন পরিব্রাজক ভোজর[১৬১] কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ অমৃতকুণ্ড গ্রন্থটি *বাহরুল হায়াত* নামে ফারসি অনুবাদ করেন।[১৬২]

'এ গ্রন্থটি মুসলিম সুফি সাধকদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে জানা যায়। এ গ্রন্থে মানব দেহকে একটি ক্ষুদ্র জগতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানবদেহ সম্পর্কে জ্ঞান, মানবহের রহস্য, আত্মা এবং তার রহস্য, যোগসাধনার রীতিনীতি, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ ও এ সম্পর্কে জ্ঞান, শুক্র সংরক্ষণ, ইচ্ছাশক্তি, মৃত্যুর লক্ষণ ও মৃত্যুকে এড়াবার উপায়, রিপু দমন এবং আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অনুমিত হয় যে, সেই সময় থেকেই বাঙালি সংস্কৃতিতে অধ্যাত্মবাদ তথা সুফিতত্ত্বের চর্চা ছিল এবং এ নিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিয়মিত বাহাসও হতো। মুসলমানদের আগমনে এ চর্চায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয়।'[১৬৩]

উল্লেখ্য যে, এযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ফারসি-হিন্দি অভিধান '*ফারহাঙ্গে ক্বোবাস*' প্রকাশিত হয়। এটির লেখক ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ক্বোবাস গজনবী।[১৬৪]

খ. খলজি আমলে ফারসি চর্চা

মামলুক পরবর্তী খলজি আমলে (১২৯০-১৩২০ খ্রিস্টাব্দ) এতদঞ্চলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা ও এর প্রসারেরও ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে ফারসি ভাষা ও ইরানি সভ্যতা-সংস্কৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[১৬৫] দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র নাসিরউদ্দিন বুগরা খানের আমলে (১২৮১-১২৮৭ খ্রি.) বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়।[১৬৬]

গিয়াসুদ্দিন বলবনের পুত্র আলাউদ্দিন খলজির পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময়ে ভারতবর্ষে দুজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব হয়। এদের একজন হলেন 'ভারতের তোতা ' নামে অধিক পরিচিত আমির খসরু দেহলভী[১৬৭] (১২৫৩-১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ)। যিনি ফারসি, হিন্দি ও উর্দুতে সমান দক্ষ ছিলেন।[১৬৮] তিনি পারস্যের বিখ্যাত কবি নিযামী গানজুবী[১৬৯] (১১৪১-১২০৩/১২০৯) কর্তৃক লিখিত খামছা'র[১৭০] জবাবে খামছা লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।[১৭১]

আরো একজন বিখ্যাত কবি হলেন 'হিন্দুস্থানের সাদী' খ্যাত নাজমুদ্দিন হাসান দেহলভী (১২৫১/৫২-১৩৩৭/১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ)।[১৭২] *নুজহাতুল খাওয়াতির* এর গ্রন্থকার বলেন, খলজি শাসক আলাউদ্দিন মোহাম্মদ পারস্যের কবি শেখ সাদীকে[১৭৩] (১২১৩/১৯-১২৯১) মুলতানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[১৭৪] তাঁর রাজসভায় প্রত্যহ ফেরদৌসি'র[১৭৫] (৯৩২/৯৬৩-১০২০/১০২৫খ্রিস্টাব্দ) *শাহনামা*[১৭৬] থেকে, আনওয়ারী'র[১৭৭] (১১২৬-১১৮৯/১১৯০ খ্রিস্টাব্দ) ক্বাসীদা থেকে, নিজামী গানজুবী'র (১১৪১-১২০৩/১২০৯ খ্রিস্টাব্দ) খামছা থেকে এবং আমির খসরুর কবিতা থেকে আবৃত্তি করা হত।[১৭৮] এ সময় ইরানের তাবরীজ, ইস্ফাহান ও রেই অঞ্চল থেকে অসংখ্য নামীদামী কবি, সাহিত্যিক, বিদ্বান খলজী রাজসভায় জড়ো হন এবং মূল্যবান উপঢৌকন ও পুরস্কার গ্রহণ করেন।[১৭৯]

দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র নাসিরউদ্দিন বুগরা খানের আমলে (১২৮১-১২৮৭ খ্রি.) বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সময়টিতেও অসংখ্য খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের পদচারণায় বঙ্গীয় অঞ্চল মুখরিত থাকতে দেখা যায়। এ সময় দিল্লী থেকে বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শামসুদ্দীন দাবীর (মৃ. ১২৬৮খ্রি.), ও আমির খসরু দেহলভী (১২৫৩-১৩২৪ খ্রি.) বঙ্গে আগমন করে ফারসি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশে করেন।[১৮০] 'শামসুদ্দীন দাবীর, বুগরা খানের মীর মুনশী তথা প্রধান সচিব হিসেবে স্থায়ী ভাবে বাংলায় বসবাস করেন। তিনি বুগরা খানের প্রশংসায় বেশ কিছু ফারসি *কাসীদা*[১৮১] রচনা করেন।'[১৮২]

বুগরা খানের পুত্র রুকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে (১২৯১-১৩০১ খ্রি.) সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত হাম্বলী ধর্মতত্ত্ববিদ শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা[১৮৩] (মৃ.৭০০ হি.) ফিকহ শাস্ত্র বিষয়ে একশ আশিটি বায়ত সম্বলিত *নাম-এ-হক* শীর্ষক ফারসি গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।[১৮৪] ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই থেকে এর প্রথম সংস্করণ এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে কানপুর থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৮৫]

'এ গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। তিনটি ভূমিকা সংক্রান্ত অধ্যায়ে হামদ বা খোদার প্রশংসা, নাত বা রাসূল (সা.) এর প্রশস্তি স্থান পেয়েছে। বাকি দশটি অধ্যায় অযু, গোসল, নামাজ এবং রমজান মাসের রোযার মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এতে ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব, মুস্তাহাব এবং মাকরূহ ইত্যাদি বিধানবলিরও আলোচনা রয়েছে এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পালনের ক্ষেত্রে দোষত্রুটি সংশোধনের নিয়ম সম্পর্কে উপদেশ দেয়া হয়েছে। মূলত পয়গম্বরের শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপন অনুশীলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল।'[১৮৬]

বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী উৎকর্ষ সাধিত হয় গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ)। এটি ছিল বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।[১৮৭] 'সুলতান গিয়াসুদ্দিন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে বাংলাদেশের সোনারগাঁও লেখক ও ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এসময় এখান থেকে অসংখ্য ফারসি পদ্য ও গদ্য সংকলন বের হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ্ নিজে যেমন ফারসি চর্চা করতেন, তাঁর রাজ-দরবারেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের আগমন ঘটতো। তিনি ইরানের মহাকবি হাফিজ শিরজির[১৮৮] কাব্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।'[১৮৯] সুলতান গিয়াসুদ্দিন আযম একটি গযল রচনা করতে গিয়ে প্রথম শ্লোকের অর্ধেক রচনার পর অবশিষ্ট অংশ লিখতে অসমর্থ হওয়ায় এটিকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য হাফিজের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।[১৯০] কবি স্বয়ং আসতে অপারগ হওয়ায় সুলতানের জন্য স্বরচিত একটি গযল উপহার হিসেবে

পাঠিয়েছিলেন।[১৯১] সিরাজির দেয়া গযলটি[১৯২] বাংলার ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাবধি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।[১৯৩]

এ সম্পর্কে ই. জি ব্রাউন বলেন:

Two wings of India also sought to persuade Hafiz visit their courts. One of these was Muhammad Shah Bhahmani of the Decean, a liberal patron of poets, who, through his favourite Mir Fadullah invited Hafiz to his capital, and sent money to him for his journey.[১৯৪]

সুলতানের বন্ধু ও সহপাঠী সুফি নূরুল হক নূর কুতুব-এ-আলম পাণ্ডুবী[১৯৫] বিশিষ্ট ফারসি কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন।[১৯৬] তিনি রাসূল (সা:) এর চল্লিশটি হাদীসের ফারসি তরজমা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাসহ *আনীসুল গুরাবা*, শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৯৭]

'রুকনুদ্দীন বারবক শাহের আমলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) মওলানা ইব্রাহীম কাওয়াম ফারুকী সংকতি *ফারহাঙ্গে ইব্রাহীমী* শীর্ষক অভিধানটি এতদঞ্চলে রচিত প্রথম ফারসি অভিধান। ..... এ গ্রন্থটি ফারুকী তাঁর মুর্শিদ বিহারের প্রখ্যাত সুফি শেখ শরফুদ্দিন আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া মানীরীর নামে উৎসর্গ করেছিলেন বলে এটি *শর্ফনামা* বলেও অভিহিত। ..... বাংলায় ফারসিচর্চার ইতিহাসে *শরফনামা* একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র উপমহাদেশে ফারসি চর্চা ও জ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ বড় রকমের কৃতিত্বের দাবিদার। এ গ্রন্থটি আরো একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এত লেখকের সমকালীন বাংলার কিছু পণ্ডিত ও কবিদের নাম পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে অসমান্য প্রতিভাবান লেখক ও যশস্বী চিকিৎসক আমির শাহাবুদ্দিন হাকিম কিরমানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ফারুকীর উস্তাদ শেখ ওয়াহেদী ফারসি ভাষায় *হাবলুল মাতিন* শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।'[১৯৮]

সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ কবি-সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন এবং ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে তাঁর দরবারে খ্যাতনামা কবিদের সমাগম ছিল। যাঁরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনন্য অবদান রাখেন। বারবক শাহের দরবারের সবচেয়ে খ্যাতনামা কবি আমীর যয়নুদ্দীন মালিকুশ শুয়ারা বা কবি সম্রাট উপাধি পেয়েছিলেন।[১৯৯] তার দরবারের অপর প্রতিভাধর লেখক ও যশস্বী চিকিৎসক আমীর শিহাবুদ্দীন *ফারহাঙ্গে আমীর শিহাবুদ্দীন* নামে একটি ফারসি অভিধান সংকলন করেন।[২০০]

সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) মুসলিম পণ্ডিতদের তার রাজ্যে বসতি স্থাপনের আমন্ত্রণ জানান। তিনি ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের[২০১] *গুররা-এ-শহীদ* নামক স্থানে একটি উচ্চমানের মাদরাসা এবং পাণ্ডুয়ায়[২০২] একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[২০৩] এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে আরবি ও ফারসি চর্চা হতো।

এখানকার সৌধরাজির গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ[২০৪] সে সময়ে বঙ্গে আরবি-ফারসিচর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করে। মুসলিম শাসনামলে ফারসি সাহিত্যচর্চা যে গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের বাংলা কাব্যে[২০৫]; বিশেষ করে চৈতন্যমঙ্গল-এ অসংখ্য ফারসি শব্দ ও বয়াতের ব্যবহার দেখে। যেমন-চৈতন্য মঙ্গলের একটি শ্লোক নিম্নরূপ:[২০৬]

মসনবী আবৃত্তি করে থাকে নবলনে

মহা পাপী জগাই-মাধাই দুই জনে।

গ. তুঘলক রাজত্বকালে ফারসি চর্চা

ভারতবর্ষে খলজি সাম্রাজ্যের পরে তুঘলক রাজবংশ (১২২০-১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এসময় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিখ্যাত ফারসি গবেষক এস, এ, ইকরাম-এর মতে এ সময়ই বাংলায় ফারসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ ছিল।[২০৭] বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্ন বতুতা এ সময়ে দিল্লী ভ্রমণে আসেন (১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে) এবং শহরের কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২০৮] তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী *সফরনামাতে*[২০৯] অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে এতদঞ্চলে ফারসি ভাষার প্রভাবের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।[২১০]

উল্লেখ্য যে, তুঘলকদের সময়েই প্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচারকারী মিশনারী এবং এদেশের ফারসি পণ্ডিতদের অগ্রদূত সাইয়্যেদ শরীফুদ্দিন বুলবুল শাহ তুর্কিস্তানী, যিনি বুলবুল শাহ সোহ্‌রাওয়ার্দী (মৃত্যু ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দ) নামেই অধিক পরিচিত, কাশ্মিরে আগমন করেন।[২১১] কাশ্মিরে আগমনকালে সাইয়্যেদ আলী হামদানী (১৩১৩-১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দ) এর সঙ্গে ছিল ৭০০ লোকের এক বিশাল বহর, সে বহরে ছিল তাঁর শিষ্য, বন্ধু ও এমন সব ব্যক্তি যারা শিল্পে, বাণিজ্যে ও ধর্মীয় বিষয়াবলিতে বিশেষভাবে দক্ষতা সম্পন্ন। তাঁরা ধর্মীয় বিষয়াবলীর অভিভাবক হিসেবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই সর্ববৃহৎ পরিসরে ফারসি ভাষার অগ্রপথিক হিসেবে জনগণের মাঝে নিজেদের উপস্থাপনে সক্ষম হন, এমনকি কাশ্মিরে শাসকবর্গের ওপরেও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করেন।[২১২]

ঘ. লোদী ও সাদাত শাসনকালে ফারসিচর্চা

তৎকালীন সাদাত ও লোদী বংশীয় শাসনামলে উপমহাদেশের ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসটি ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল কৃতিত্বের দাবিদার। 'দিল্লী সালতানাতের চতুর্থ ও পঞ্চম রাজবংশ ছিল সাদাত (শাসনকাল ১৪১৪-১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ) ও লোদী (শাসনকাল ১৪১৫-১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ)। এসময়ে কাশ্মিরে হিন্দুদের ফারসি শিক্ষার

ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব ঘটে যায়। বিশেষ করে সেকন্দোর লোদীর সময়ে হিন্দুরা ফারসি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যা পূর্বে ছিল না।'[২১৩]

ইতিহাসবিদ বাদায়ূনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '*মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ*' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ সময়ে কাশ্মিরে দুঙ্গার মল নামক একজন হিন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি ফারসি ও আরবীতে অনর্গল কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন এবং ফারসি কবিতা লিখতেন।[২১৪]কাশ্মিরের শাসক সুলতান জয়নুল আবেদনী বুদ শাহ্ কাশ্মিরীর শাসনামলে (১৪২০ খ্রি.) 'বুদী বোত' নামে একজন হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। যিনি *শাহনামা*'র হাফিজ ছিলেন বলে জানা যায়, তিনি *শাহনামা*'র হিন্দি অনুবাদ করেছিলেন।[২১৫] মোল্লা আহমদ কাশ্মিরী 'বুদী বোত'-এর সাহায্যে *মহাভারত* ও *রাজ তারাঙ্গীনী* (পণ্ডিত কালামনের এক চতুর্থাংশ প্রসিদ্ধ ইতিহাস)-এর ফারসি অনুবাদ করেন এবং *কাঁটাসুর স'গুব* নামের বিখ্যাত কাহিনীটি *বাহরুল আসমা* নামে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।[২১৬]

মোঘল ও নবাবী আমলে ফারসি চর্চা

'এ উপমহাদেশে 'ফারসির স্বর্ণযুগ' শুরু হয় মোঘল সম্রাটদের (শাসনকাল ১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায়। মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন বাবর ছিলেন ফারসি অনুরাগী। বাবর মাঝে মাঝে ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করতেন।'[২১৭] বাবরের রাজসভায় অগণিত কবি-সাহিত্যিকদের পদচারণা ছিল, যারা ফারসিতে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।[২১৮]

দ্বিতীয় মোঘল সম্রাট নাসিরুদ্দিন হুমায়ুন শেরশাহ সুরী আফগানির নিকট পরাজিত হয়ে তৎকালীন সাফাভি বাদশাহ শাহ্ তাহ্মাসপ-এর আনুকূল্যে ইরানে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর সেনাবহিনীর সহায়তায় ভারতে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন। ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে ইরানি বিদ্বান-ব্যক্তিবর্গ ও কবি-সাহিত্যিকদের একটি বিশাল বহর তাঁর সঙ্গী হয়। তৎপরবর্তীকালে যাঁরা সম্রাট হুমায়ুনের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে অভিবাসিত হবার ফলে এতদঞ্চলে ফারসি ভাষার চর্চা, উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনে অনন্য ভূমিকা রাখেন। সম্রাট হুমায়ুন ফারসি অনুরাগী ছিলেন। ফারসিতে তাঁর একটি *দিওয়ান* (কাব্য সংকলন) রয়েছে।[২১৯]

'সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) অনেক ফারসি কবি ও সাহিত্যিক বাংলার অভিবাসী হন। তাদের অন্যতম মীর্জা জাফর বেগ কাজবীনি (মৃ. ১০২১ হি.) ইরানের বিখ্যাত কবি নিযামী গানজুভীর কাব্যরীতি অনুসরণ করে *শিরিন ও খসরু* শীর্ষক একটি মসনবী[২২০] রচনা করেন।'[২২১] আকবরের রাজসভা অগণিত প্রসিদ্ধ কবি-সহিত্যিক ও ব্যক্তিদের দ্বারা অলংকৃত ছিল। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুর রহিম খান-এ খানান, যিনি ফারসি ভাষা ও পারস্য সভ্যতা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[২২২]

আবদুস সাত্তার বলেন,

'মোঘল শাসন আমলে আকবর-এর সময়ই শিল্প-সাহিত্যের সুবর্ণ সময় বলে চিহ্নিত করা যায়। আকবরের প্রধান মন্ত্রী এবং প্রখ্যাত কবি ফৈজীর ভাই আবুল ফজলের 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। গ্রন্থ দুটিতে আকবর শাসন আমলের সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত হয়েছে। আকবরের আদেশে রচিত হয় সচিত্র 'তারিখ-ই-হামজা'। বারো খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটিতে এমন সব চিত্র শোভিত হয়েছে যে যা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদুপরি সম্রাট আকবরের আদেশে সম্পাদকীয় বোর্ড কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হয় তৈমূরের বিজয় সংক্রান্ত 'জাফর নামা' (বিজয় পুস্তক), চেংগীজ খানের কীর্তি-কাহিনী সম্বলিত 'চেংগীজ নামা', মহাভারতের ফারসী অনুবাদ 'রাজম-নামা'; 'আয়ার দানিশ (জ্ঞানেরপরশ পাথর), 'আনওয়ার-ই-সোহেলী'র আধুনিক ও পরিবর্তিত সংস্করণ ইত্যাদি। এসব ছাড়াও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, কৃষ্ণ ও লীলাবতীর মূল সংস্কৃতে লিখিত কাহিনী সমূহ ফারসীতে অনুবাদ করানো হয়। এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'তারিখ-ই-আলফী' বা হাজার বছরের ইতিহাস। বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিভিন্ন অধ্যায় লেখার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল এবং পরে এটি নাসরুল্লাহ-এর পুত্র আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়।'[২২৩]

আকবরের দরবারে রাজা টোডরমল[২২৪] নামক প্রভাবশালী একজন হিন্দু ছিলেন।[২২৫] ৯৯০ হিজরীতে ঘোষণা দেন এখন থেকে সমস্ত সরকারী কাজ হবে ফারসি ভাষায়।[২২৬] এই ঘোষণা প্রমাণ করে যে, পূর্বে হিন্দিতে কাজ কর্ম চলত।[২২৭]

মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন,

'মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসী, মসজিদ-গাত্রে ফারসী, গৃহ নির্মাণ লিপিতে ফারসী, শাহী ফরমানে ফারসী, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফারসী, রাজস্ব বিভাগে ফারসী, শিক্ষা দীক্ষায় ও আলাপ আলোচনায় ফারসী দেদার চলিতে লাগিল। বিদ্যাবত্তা, চাকরী-বাকরী এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসী হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু মুসলমান সবাই ফারসী শিখিতে শুরু করিল।'[২২৮]

এ সময়ে দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত যার নাম ছিল 'ভবেন', তিনি *আঠহারুদা* নামে একটি গ্রন্থ ফারসিতে অনুবাদ করেন।[২২৯] এ ছাড়া হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ *রামায়ন* ও *মহাভারত* অত্যন্ত বর্ধিত কলেবরে পুনরায় সংস্কৃত ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।[২৩০]

মোঘল সাম্রাজ্যের সুবাদারগণও ফারসি সাহিত্য চর্চা করতেন এবং ফারসি কবি সাহিত্যিকদের ব্যাপক সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 'সুবেদার আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করলে

উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফারসি কবি সাহিত্যিকগণ এখানে আগমন করে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাদে মধ্যে আবুল বারাকাত মুনীর লাহোরী[২৩১] (১৬০৯-১৬৪৫ খ্রি.) সুবাদার সায়েফ খাঁর সভাকবির মর্যদা লাভ করেন। ..... তার কাব্যগ্রন্থ *কাওয়ায়েদে উরফী* ও *গুলদাস্তে* সূধীমহলে বেশ সমাদৃত হয়।'[২৩২] তিনি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও তার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে ফারসি ভাষায় একলক্ষ শে'র রচনা করেন।[২৩৩] এছাড়া বিভিন্ন শিরোনামে তাঁর চমৎকার কিছু *মসনবী* রয়েছে; যা পরবর্তীকালে *মসনবী দার সিফাতে বাঙাল* নামে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[২৩৪]

সুবাদার নওয়াব কাসিম খাঁ জুয়াইনীও (মৃ. ১৬৩২ খ্রি.) ফারসি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 'তাঁর দরবারের বিখ্যাত সাহিত্যিক মির্জা মুহাম্মদ সাদিক *সুবহে সাদিক* শিরোনমে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও জীবনচরিত রচনা করেন। এছাড়া *শাহেদ সাদেক* শীর্ষক অপর একটি ফারসি গ্রন্থে তিনি প্রবাদ-প্রবচন, বিভিন্ন ফারসি কবির কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন।'[২৩৫] সুবাদার নওয়াব কাসিম খাঁ জুয়াইনী (মৃ. ১৬৩২ খ্রি.) ফারসি ভাষায় একটি *দিওয়ান* রচনা করেন।[২৩৬]

সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ শূজা বাহাদুরের আমলে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.) বাংলায় ইরান ও ভারত থেকে অসংখ্য ফারসি কবি ও সাহিত্যিক আগমন করে।[২৩৭] এ প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার বলেন,

Names of the many of his officers in Bengal suggest they were Persians and Shias…… The prince could not help appreciating the highly cultured and intellectual society of many able Persian scholars and administrators whom he met in Bengal.[238]

বাংলার মহাকবি আলাওল (১৬০৭-১৬৮০ খ্রি.) এক সময় সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ শূজা বাহাদুরের সভাকবি ছিলেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় ইরানের কবি নিযামী গানজুবীর *এসকান্দার নামা*[২৩৯] ও *হাফত পেইকার*[২৪০] এর বাংলা অনুবাদ করেন। তাছাড়া বিষয়বস্তু, উপমা ও বাণী চয়নের দিক থেকে আলাওলের কবিতায় ফারসি কাব্যের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত তাঁর হামদ- না'ত ছিল হুবহু ফারসিরই অনুকরণ।[২৪১] শাহজাদা শূজার প্রবীণ কর্মচারী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহচর মুহাম্মদ মা'সুন বি হাসান বিশিষ্ট ফারসি লেখক ও ঐতিহাসিক ছিলেন।[২৪২] তিনি রাজদরবারের অভিজ্ঞতা নিয়ে *তারিখে শাহ শূজাই* শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।[২৪৩] 'এর মূল পাণ্ডুলিপির মাত্র তিনটি কপি ভারতের বাঙ্কিপুরে লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি এবং লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এর মূল পাণ্ডুলিপির জেরক্স কপি সংরক্ষিত রয়েছে।

আবেদা হাফিজ এ গ্রন্থটির সম্পাদনা করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।'[২৪৪]

বাংলার সুবাদার সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.) এবং শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৩-১৬৭৭ খ্রি.) মুঘল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ফারসি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার সাথে সাথে নিজেরাও সাহিত্যচর্চা করতেন।[২৪৫] মীর জুমলা বিশ হাজার ফারসি পংক্তি সম্বলিত একখানি *কুল্লিয়াত* রচনা করেন।[২৪৬]

অন্যদিকে শাহাবুদ্দীন তালিশ ফারসি ভাষায় ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেও ফারসি সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ স্বাক্ষর রেখেছেন। 'শাহাবুদ্দীন তালিশ ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে *ফাতহে ইবরিয়া* শীর্ষক আসামের একটি ইতিহাস গ্রন্থ বরচনা করেন। এত আসামে সংঘটিত ঘটনাবলির প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এটিকে বাংলার বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়।'[২৪৭]

শাহাবুদ্দীন তালিশের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রভাব তার অনুসারী, নিকটজন এমনকি তার সৈনিকদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছিল। তার এক সৈনিক মির্জা নাথান[২৪৮] সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) বাংলা ও আসামে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা সম্বলিত *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* শীর্ষক এক চমৎকার প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন।[২৪৯] তাঁর এ গ্রন্থে বাংলায় পালিত আচার অনুষ্ঠানাদি এবং সেসব পালনের রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

'সম্ভবত মীর্জা নাথানের *বাহারিস্তান-ই-গায়বীই* এ অঞ্চলে রচিত প্রথম ফারসি গ্রন্থ যাতে বাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সে আমলে কীভাবে পালিত হতো তার মোটামুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে সে আমলে বাংলার মুসলিম সমাজে পবিত্র রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা কিভাবে উদযাপিত হতো তারও বর্ণনা পাওয়া যায়। ঈদুল ফিতরের নতুন চাঁদ দর্শনে মুসলমানদের আনন্দ উৎসরের ইঙ্গিতও মীর্জা নাথানের এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। নাথানের এ গ্রন্থে সন্তান জন্মের পর সেকালে বাংলায় কী ধরনের উৎসব উদযাপিত হতো তারও বর্ণনা পাওয়া যায়। ..... সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলাকে পদানত করার সমসাময়িক বর্ণনা একমাত্র *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*তে পাওয়া যায়। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল সম্পর্কে যেমন বিশদভাবে জানা যায়, বাংলার অন্য কোনো সময়ের ইতিহাস তত ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। এ সত্য থেকেই *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*র গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়।'[২৫০]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ফারসিতে অবদানের বিষয়ে আবদুস সাত্তার বলেন,

আকবরের উত্তরাধিকার সম্রাট জাহাঙ্গীর 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী' নামে একটি স্মৃতিকথা রচনা করেন এবং ফারসী ভাষার অভিধান 'ফারহাংগ-ই-জাহাঙ্গিরী'ও তাঁর পরিশ্রমসাধ্য কাজ।[২৫১]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পরবর্তী মোঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলেও ফারসির ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাঁর সময়ের বিভিন্ন স্থাপত্য নিদর্শন ও নির্মাণশৈলীতে এসবের ছাপ স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শনগুলো হলো: আগ্রার তাজমহল, দিল্লী জামে মসজিদ, লাহোরের শালিমার গার্ডেন, ময়ূর সিংহাসন ইত্যাদি। 'সম্রাট শাহজাহান শাহাবুদ্দিনের যুগটি ভারতীয় উপমহাদেশে ইরানি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পনৈপুণ্যের কারণে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পারস্যে স্থাপত্যশৈলীর অনুকরণে পাথরে খোদাইকৃত হরেক রকম লেখা এসময়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। অসংখ্য কেল্লা, গার্ডেন ও মসজিদ নির্মিত হয় পারস্য নির্মাণশৈলীতে।'[২৫২]

সম্রাট শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেবও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফারসি চর্চা ও এর প্রসারে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। সম্রাট হিসেবে সফলতার স্বাক্ষর রাখার পাশাপাশি ফারসি গদ্যে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। পত্র সংকলন ফারসির প্রতি তাঁর অনুরাগের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। তিনি ফারসিতে *রুক্বআত-এ-আলমগীরী* নামে একটি অসামান্য পত্র সংকলন করেন।[২৫৩]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসাও ফারসির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং নিজেও ফারসি চর্চা করতেন। এ প্রসঙ্গে আবদুস সাত্তার বলেন,

'সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসা ফারসী কাব্য জগতে মখফী নামে খ্যাত। তিনি কাব্য-রচনায় অত্যধিক শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর গজল ফারসি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।'[২৫৪]

বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থাকাকালে এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ফারসি সাহিত্যচর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। 'এ সময় ইরান ও ইরাকের বহু কবি সাহিত্যিক বাংলায় আগমন করে ফারসি সাধনায় রত হন। অধিকন্তু অনেক হিন্দু পণ্ডিতও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করে সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।'[২৫৫]

এ প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেন,

Under Murshid Quli Khan and the succeeding Nawabs, Bengali Hindus, by the force of their talents and mastery of Persian, came to occupy the highest civil posts under the faujdars. There

had been Bengali Hindu diwans and qanungoes, well-versed in the Persian language and in Muslim court etiquette, as early as the days of Husain Shah (C. 1510).[২৫৬]

'তৎকালীন বাংলার বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭১৩-১৭২৭ খ্রি.) সুবাদার শূজাউদ্দীন খাঁ (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) ও আলীবর্দী খাঁর শাসনামলে (১৭৪০-১৭৫৭ খ্রি.) মুর্শিদাবাদ, আজমাবাদ, হুগলী ও ঢাকা মুসলিম সংস্কৃতি ও ফারসি সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।'[২৫৭]

বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলাও (শাসনকাল ১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.) ফারসি সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দানের মাধ্যমে ফারসির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর দরবার ফারসি কবি সাহিত্যিকদের পদচারণায় মুখর ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সুষমা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে উপজীব্য করে ফারসি ভাষায় *দিওয়ান* রচনা করেন।[২৫৮] তন্মধ্যে শাহ কুদরতুল্লাহ কুদরত (মৃ. ১৭৯০ খ্রি.) ও ফারহাতুল্লাহ ফারহত খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।[২৫৯]

৩. ইংরেজ আমলে ফারসি চর্চা

ভারতীয় উপমহাদেশে আঠারো শতক ফারসি সাহিত্যের জন্য এক ক্রান্তিকাল রূপে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে আবদুস সাত্তার বলেন,

'আঠারো শতক ফারসী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অনুর্বর কাল বলে কথিত। রাজনৈতিক বিবর্তনই এই অনুর্বরতার মূলে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। মোঘল সাম্রজ্যের পতন এবং ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের পর ফারসী সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে ভারতের আর কোনো স্থান রইলো না। তখন ফারসী সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো আফগানিস্তান ও পারশ্য। পারশ্যের কাজার শাসন একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাজার শাসনের সময় একদল প্রতিভাবান কবির প্রচেষ্টায় ফারসী সাহিত্যের গৌরব আবার বৃদ্ধি হতে থাকলো। এই সময়ে কাব্য-জগতে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইস্পাহানের সায়্যীদ মোহাম্মদ, কবি-নাম সাহাব (মৃত্যুঃ ১৮০৭-৮); আরদিস্তানের সায়্যীদ হোসাইন-ই-তাবাতাবী, কবি-নাম মীজমার (মৃত্যু ঃ ১৮১০-১১); কাসান অঞ্চলের ফতেহ্ আলী খান, কবি-নাম সাবা (মৃত্যু ঃ ১৮২২-২৩); ইস্পাহানের নাশাত (মৃত্যু ঃ ১৮২৮-২৯); সিরাজের বিসাল (মৃত্যু ঃ ১৮৪৬); সিরাজের কানী (মৃত্যুঃ ১৮৫৩-৫৪); বিস্তানের ফারোগী (মৃত্যু ঃ ১৮৮৫); জামাদাকের ইয়াগমা, ইস্পাহানের সোরোশ, আফগানিস্তানের মেহের দীল খান, কবি-নাম মাশরেকী; একই অঞ্চলের গোলাম মোহাম্মদ খান, কবি-নাম তারজী; একই অঞ্চলের ওয়াসী; কাশ্মীরের হামিদ; আফগানিস্তানের ওয়াসিল এবং আরো অনেকে।'[২৬০]

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শেষ নওয়াব সিরাউদ্দৌলার পতনের পর ইংরেজরা বাংলা উড়িষ্যার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে।[২৬১] দীর্ঘদিন এতদঞ্চলের অফিস-আদালতের ভাষা ও রাজভাষা ফারসি থাকায় এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে ইংরেজরা ফারসি, উর্দু ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থ দিয়েই ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থগারটি গড়ে তোলেন।[২৬২] ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ফারসি, উর্দু ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় চর্চা আরো বেড়ে যায়।[২৬৩] তৎকালীন বাংলার সমাজে ফারসির এ গুরুত্ব বিবেচনা করেই ইংরেজ সরকার এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পরও ১৭৫৭-১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আশি বছর ফারসিকেই রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়।[২৬৪] এ সুদীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলের অনেক কবি-সাহিত্যিক ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন এবং প্রচুর গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।[২৬৫]

এ সম্পর্কে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দিল্লীস্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এম. বি কারিমিয়ান বলেন:

Many Iranian books were translated into Persian and similarly books were published in India. So much so that the number of Persian books published in India was sometimes larger than the number of Persian books published in Iran in particular period of time. Even the number of books brought out by some publishing house in India like the munshi naval Kishore printing press, Lucknow, was larger than that of the publications of the biggest publishing centres in Iran and what is more important is the fact that the first editions of some Persian texts were published in India.[২৬৬]

এসময়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে-

ইকবাল নামায়ে জাহাঙ্গীরী, *আকবরনামা*, *তারিখে ফিরোজশাহী*, *তারিখে মোবারকশাহী*, *তারিখে ফেরেশতা*, *তারিখে আদেলশাহী*, *জাওয়াহিরুল আজায়েব*, *লুবাবুল আলবাব*, *নাফায়েসুল মা'সার*, *মাজমাউল ফুযালা*, *খুলাসাতুল আশয়ার*, *রিয়াদুস শুআরা*, *মাকামাতুস শু'আরা*, *সুহুফে ইবারাহীমী*, *মাখযানুল গারায়েব*, *হাফতে আকলীমা*, *গিয়াসুল লুগাত*, *ফারহাঙ্গে আনন্দ রাজ*, *ফিরুযুললুগাত*, *জাওয়াহিরুল মাসাদের*, *বুরহানে কাতে*, *ফারহাঙ্গে জাহাঙ্গীরী*, *ফারহাঙ্গে রশীদী*, *দাস্তানহায়ে ফারসি ও আরবী*, *উলূমে পেযেশকী*, *ফালসাফা ও মানাতেক*, *হুনারেখুশনাবেসী* প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায়। বর্তমানে এ সমস্ত কর্মের নিদর্শনাবলি বা মুদ্রিত গ্রন্থের আকারে উপমহাদেশের লাইব্রেরীসমূহে সংরক্ষিত আছে।[২৬৭]

বৃটিশ শাসকগণ ফারসিকে মুসলিম শাসন ও মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতীক মনে করে তাদের শাসনামলের গোড়া থেকেই এ ভাষাকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা করেছিল।[২৬৮] এই চেষ্টারই বাস্তবায়ন স্বরূপ, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০

নভেম্বর কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট একটি অধ্যাদেশ (Act No. XXIX. 1837 AD) জারির মাধ্যমে অফিস আদালত তথা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ফারসির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন।[২৬৯] এতদসত্ত্বেও ফারসি ভাষায় সাহিত্যচর্চা ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফারসি ভাষায় সাহিত্যচর্চা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এ অঞ্চলের একটি বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে ফারসি অনুরাগী জনগোষ্ঠী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ফারসি সাহিত্যচর্চায় ব্যক্তি ছাড়াও কিছু কিছু সাহিত্যমোদী পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য; তন্মধ্যে ঢাকার খাজা পরিবার, ফরিদপুরের কাজী পরিবার এবং সিলেটের মজুমদার পরিবার অন্যতম।[২৭০]

৪. পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ফারসি চর্চা

পাকিস্তান আমলেও ফারসি ভাষায় সাহিত্যচর্চার এধারা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে যাঁরা সীমিত আকারে ফারসি চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুল মোকাররম সলিমুল্লাহ ফাহমী, খাজা মঈনুদ্দীন, জামিল ইব্রাহীম আলী, হাজী মোহাম্মদ হোসাইন, হুরমুযুল্লাহ শায়দা (জ. ১৯০৩ খ্রি.), মালেক রিয়াযুদ্দীন হায়দার, মাওলানা ফযলুল্লাহ ফযল (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.), প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৭১]

স্বাধীনতা উত্তরকালে এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রভাবেও বাংলায় ফারসি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়; এসব গ্রন্থের মধ্যে বেশ কিছু অনূদিত গ্রন্থও রয়েছে। এসময় ফারসি ভাষায় সাহিত্যচর্চায় কয়েকজন সাহিত্যমোদী অবদান রাখেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্যচর্চায় যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে মনিরউদ্দিন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭ খ্রি.), আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, কালীম সাহসারামী (১৯৩০-২০০৭ খ্রি.), আবদুল করিম, আবদুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০ খ্রি.), আবেদা হাফিজ, মুহম্মদ আব্দুল্লাহ (১৯৩২-২০০৮ খ্রি.), উম্মে সালমা (১৯৪৭-২০০৮ খ্রি.), কুলসুম আবুল বাশার (১৯৪৭ খ্রি.-) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭২]

স্বাধীনতা উত্তরকালে ও ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রভাবে এবং একুশ শতকে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

রিয়াজ-উস-সালাতিন, সিয়ারুল মুতায়াখখিরীন, বাহারিস্তান-ই-গায়বী, হুমায়ুননামা, তাবকাতে আকবরী, আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী, তারিখে ফিরেশ্‌তা, ফেরদৌসির শাহনামার অনুবাদ, রুবাঈয়াতে ওমর খৈয়াম, শেখ সা'দীর গল্প, শায়খ সাদী (র.)-এর গুলিস্তাঁ, গুলিস্তানের বঙ্গানুবাদ, বুস্তানের বঙ্গানুবাদ, মসনবীয়ে রুমি, মসনবীর কাহিনী, মসনবীর গল্প, মাওলানা রুমির মাছনবী শরীফ, হাফিজের গজলগুচ্ছ, হাফিজের কবিতা, ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বিলায়েত নামা, তারিখে ফিরোজশাহী, তবকাত ই নাসেরী, চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, ইমাম

খোমেনীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, *ইমাম খোমেনীর বাণী*, *শহীদ*, *জাতিসমূহের আগামী দিনের পথ ইসালামী বিপ্লব*, *জাগো-সাক্ষ্য দাও*, *জিহাদ ইসলামের পবিত্র যুদ্ধ ও তার কুরআনী বৈধতা*, *ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শুরা*, *ইসলাম পরিচিতি*, *আধুনিক আরবী ফার্সী তুর্কী কবিতা*, *ফুতুহাতে ফিরোজ শাহী*, *তাহেরেহ্ সফরজাদেহ: স্বনির্বাচিত কবিতা*, *ইমাম খোমেনীর কবিতা*, *নারী নির্যাতন: যুগে যুগে*, *ইসলামী বিপ্লব কি ও কেন*, *শিক্ষাঙ্গনের নৈতিকতা*, *সিয়াসতনামা*, *কারবালা ও হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাত*, *হজ্জ আমাদের কি শেখায়*, *ইন্তেখাব আয্ গুলিস্তান ও পান্দনামা*, *আল মুরতাজা ইমাম আলী ইবনে আবি তালেব (আ.)*, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী*, *মোজাফ্ফরনামা*, *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি*, *আইন-ই-আকবরী*, *তাযকিরাতুল ওয়াকিয়াত সম্রাট হুমায়ুনের কাহিনী*, *মীযান*, *পাঞ্জগাঞ্জ*, *ফুসূলে আকবরী*, *নাহ্বেমীর*, *ইলমুসসীগাহ্*, *আল্লাহ রাসূল ও রিসালাত*, *মহাকালের ত্রাণকর্তা*, *বিহারুল আনওয়ার কাহিনী সম্ভার*, *আহকামে মুমিনাত*, *মালা বুদ্দা মিনহু* ইত্যাদি।[২৭৩]

এছাড়া বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর নানা বিষয়ে গবেষণা, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, প্রকাশক-ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৫২।

২. **মরমিবাদ:** ইংরেজি 'মিস্টিসিজম' (Mysticism) শব্দের বাংলা রূপান্তর 'মরমিবাদ'। মরমিবাদ বলতে অস্পষ্ট গূঢ় অর্থপূর্ণ গুপ্ত রহস্যমণ্ডিত হৃদয় দ্বারা অনুভূত বিষয় বুঝায়। স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে সক্ষম ব্যক্তিকেও মরমি বলা হয়। অর্থাৎ পরম সত্যেও সাথে যাঁর মর্ম বা অন্তঃকরণ সংযুক্ত, তিনিই মরমি এবং দার্শনিক প্রমাণাদি দ্বারা নির্ণীত তাঁর সিদ্ধান্ত বা মানস তত্ত্ব 'মরমিবাদ' নামে অভিহিত। [দ্রষ্টব্য: বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, প্রকাশক-ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৩১-৩২।]

৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব (বঙ্গীয় মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের এক অধ্যায়)*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃ. ১৮।

৪. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫৭।

৫. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৮৭।

৬. Chottopadhay, D. P Lokayata, *A Study in Ancient Indian Materalism*, People's Publishing House, New Delhi, 2nd edition, 1954, p. 13.

৭. বেগম, জাহান-আরা, *বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৭৬, পৃ. ৩-৫।
৮. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫০।
৯. রহিম, এম.এ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১২৭৬ খ্রি.)* ১ম খণ্ড, (বঙ্গানুবাদ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৮২, পৃ. ৮৮-১১৫।
১০. ঐ, পৃ. ৪০-৪৯।
১১. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫৭।
১২. সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, *লালন শাহের মরমী দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪, পৃ. ২৬৮।
১৩. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৪৯।
১৪. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অন্যন্যা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৭৫।
১৫. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫৭।
১৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য* ১৯৭১-২০০৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ২৩।
১৭. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য সং-৩য়*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১৫৭; চৌধুরী, মোমেন (সম্পাদিত), *মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী খণ্ড* ১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৩৮।
১৮. সরকার, মো. আবুল কালাম, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য* ১৯৭১-২০০৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৪২।
১৯. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য খণ্ড* ১, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৮৯।
২০. আহমদ, ওয়াকিল "সুফী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা খণ্ড* ৭, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৫।
২১. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ২৩।
২২. হামিদ, মোঃ আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঐ, পৃ. ৭৬।
২৩. হক, ছৈয়দ আহমদুল, *বাংলাদেশের সুফী সাহিত্য*, আল্লামা রুমী সোসাইটি, জুন, ২০০৭, পৃ. ১০-১১।
২৪. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৮৪।
২৫. খান, কে এম সাইফুল ইসলাম, *বাংলা ভাষায় রূমী চর্চা: ছৈয়দ আহমদুল হকের অবদান*, আল্লামা রুমী সোসাইটি ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৪, পৃ. ৫।
২৬. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫২।
২৭. হক, ছৈয়দ আহমদুল, ঐ, পৃ. ভূমিকা।
২৮. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৮৬-৮৭।
২৯. ঐ।
৩০. ঐ, পৃ. ৮৫।
৩১. আনিসুজ্জামান, ড. (সম্পাদিত), *আন্তর্জাতিক রূমী সম্মেলন'০৭ স্মারকগ্রন্থ*, আল্লামা রূমী সোসাইটি ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৫৩।
৩২. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৮৫।
৩৩. রহিম, এম.এ, ঐ, পৃ. ২৬৫-২৬৬।
৩৪. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫৬।
৩৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ.
৩৬. ঐ, পৃ. ২৭।
৩৭. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা. ১৯৮৬, পৃ. ১।
৩৮. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan Dacca. Vol. XIII,* no. 1, April, 1968, p. 122.
৩৯. ফরিদী, আবদুল হক, *মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২৬।

৪০. Ikram, S. M. and Spear, P., (ed), *Cultural Heritage of Pakistan*, Oxford University Press, London, 1955, p. 3.
৪১. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৫৭।
৪২. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৯।
৪৩. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১৬।
৪৪. আখুন্দজাদে, মোহাম্মদ মাহদী, *তাজযিয়ায়ে শিবহেকাররে হিন্দ ও ইসতেকলালে বাংলাদেশ*, দাফতারে মোতালেয়াতে সিয়াসি ও বাইনাল মিলাল, তেহরান, ১৩৬৫ সৌরবর্ষ, পৃ. ১১।
৪৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১৭।
৪৬. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য সং-৩য়*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২০৮-২০৯।
৪৭. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১১২।
৪৮. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৯১।
৪৯. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১২৫।
৫০. আহমদ, ওয়াকিল "সুফী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা খণ্ড ৭*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৩।
৫১. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৪।
৫২. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৯৯।
৫৩. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৩৯।
৫৪. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১০-১২৫।
৫৫. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩৮-১৩৯; হোসেন, শেখ তোফাজ্জল, (সম্পা.), *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩০।
৫৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৪।
৫৭. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ২৩৩-২৩৫।
৫৮. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
৫৯. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ২১৩; মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, *কবি আলাউল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১।
৬০. সুলতানা, রাজিয়া (সম্পা.), *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ভূমিকা।
৬১. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা ১৯৬৭, পৃ. ২৪৮-২৪৯।
৬২. ঐ, পৃ. ২৫২-২৫৫।
৬৩. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* ১ম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৫২।
৬৪. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, ঐ, পৃ. ২৫৭-২৫৯।
৬৫. হক, খন্দকার মুজাম্মিল, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১১২।
৬৬. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, ঐ, পৃ. ২৬০।
৬৭. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৪-৫।
৬৮. আহমদ, আলী, (সংক.), *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০৭-১০৮।
৬৯. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৫।
৭০. আহমদ, আলী, (সংক.), *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, ঐ, পৃ. ২১৬।
৭১. হাই, মুহাম্মদ আবদুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ১৩৪।
৭২. বাশার, কুলসুম আবুল, *আত্তার ওয়া আসারে উ দার বাঙ্গাগাল*, ইয়াদ বূদে হাফতাদ ওয়া পানজুমিন সালে তা'সীসে বাখসে ফারসি ওয়া উর্দু দার দানেশগাহে দাকা, বাখশে ফারসি ও উর্দু, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬।
৭৩. হাই, মুহাম্মদ আবদুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঐ, পৃ. ১৫১।
৭৪. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।

৭৫. চট্টোপাধ্যায়, সুধাকর, *অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৮ বাংলা ; কাদির, মো. আবদুল, "সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভারসিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ২০০৬।
৭৬. হাই, মুহাম্মদ আবদুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঐ, পৃ. ১৫৯।
৭৭. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬।
৭৮. হাই, মুহাম্মদ আবদুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঐ, পৃ. ৪৪৩।
৭৯. আহমদ, আলী, (সংক.), *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, ঐ, পৃ. ২৩১।
৮০. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
৮১. রহমান, সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৪০।
৮২. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬-৭।
৮৩. রহমান, সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঐ, পৃ. ৩৪১।
৮৪. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৭।
৮৫. আহমদ, আলী, (সংক.), ঐ, পৃ. ৫৬৩।
৮৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
৮৭. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *নজরুল ইসলাম হায়াত আওর কারনামে*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৪৫।
৮৮. রহমান, সাঈদ-উর-রহমান, ঐ, পৃ. ৩৪৪।
৮৯. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ৫ম মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৫।
৯০. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৩৬।
৯১. উদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা ২০০২, পৃ. ১২৭।
৯২. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৩৭।
৯৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য সং-৩য়*, ঐ, পৃ. ১৪২-১৪৩।
৯৪. সাত্তার, আবদুস, *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ভূমিকা।
৯৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ২৭।
৯৬. সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য*, , পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃ. ১।
৯৭. মিয়া, ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান (সম্পা.), *মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত সংগ্রাম হুসন*, জ্যোতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ভূমিকা।
৯৮. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৪৫-৪৬।
৯৯. ঐ, পৃ. ৪১।
১০০. সাকলায়েন, গোলাম, ঐ।
১০১. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ২৩।
১০২. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ২৮০-২৯২।
১০৩. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৮২।
১০৪. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, ঐ, পৃ. ২৭০-২৭১।
১০৫. করিম, আবদুল, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবন ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫৪।
১০৬. শরীফ, আহমদ, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৬।
১০৭. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ড*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৫৩।
১০৮. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৪৪।
১০৯. মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার ও খান, মুহাম্মদ আব্দুস সবুর, *ফারসি সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫৭৪।
১১০. আলী, শাহেদ, *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান*, জিলা কাউন্সিল বই, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ. ১২৮।
১১১. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৪৩।
১১২. শরীফ আহমদ শরীফ (সম্পা.), *সওয়াল সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ভূমিকা।

১১৩. হক, খন্দকার মুজাম্মিল, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*, ঐ, পৃ. ২৫।
১১৪. মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার ও খান, মুহাম্মদ আব্দুস সবুর, ঐ।
১১৫. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ড*, ঐ, পৃ. ৩৪২।
১১৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১৭।
১১৭. বিল্লাহ, আবু মূসা মো. আরিফ, বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসি শব্দ অভিধান, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্বদ্যািলয়, ৩৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪০২ বাংলা, পৃ. ১৭১।
১১৮. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১৭-১৮।
১১৯. চৌধুরী, আবদুল মুকীত, *নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২৩৬।
১২০. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ২৯।
১২১. ঐ, পৃ. ২৯-৩০।
১২২. ঐ, পৃ. ২৭।
১২৩. মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার, *পেইভান্দহায়ে মাওজুদ দরমিয়ানে দু'যাবান ফারসি ওয়া বাঙালী*, ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ইসলামাবাদ, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৯।
১২৪. হাই, আবদুল, আহসান, আলী ও শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ, *বাংলা আদবকী তারীখ*, ঢাকা বিশ্বদ্যািলয়, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ. ১৭।
১২৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ২৭।
১২৬. ঐ, পৃ. ১৪।
১২৭. নাইনী, এস.এম. আর, *যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার শেব্বে ক্বারেহ হেন্দ ২য় খণ্ড*, প্রকাশনায়-মাহমুদ আফসার, তেহরান, ইরান, তা.বি, পৃ. ৭৩৩; M.SHOJAKHANI and M.R RIKHTEHGARAN, Article *`Indo-Iranian Thought: A World Heritage'* 1995, p. 5.
১২৮. নাইনী, এস.এম. আর, *যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার শেব্বে ক্বারেহ হেন্দ ২য় খণ্ড*, ঐ, পৃ. ৭।
১২৯. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
১৩০. স্বপন, আনিসুর রহমান, *বাংলাদেশে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য*, বুক ভিউ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩।
১৩১. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ৭৮।
১৩২. ঐ।
১৩৩. Javadi, S. H.S K. Haj Seyyed, *Dialouge Among Civilization,* New Delhi, November, 2000, p.16-21; *Journal Echo of Islam*, No-197, Tehran, Iran. March April 2001, p.47.
১৩৪. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১৫।
১৩৫. আকরাম, ড. সাইয়েদ মোহাম্মদ, *মাক্বলাতে ফারসি*, লাহোর, ১৯৭১, পৃ. ৩৬।
১৩৬. কুফী, আলী, *ফাত্‌হ নামেয়ে সিন্দ*, দিলী, ১৯৩৯, পৃ. ১৭৪; ওলামা, মাওলানা মোহাম্মদ জাকা উল্লাহ শামসুল, *তারিখে হেন্দ* (উর্দু) *প্রথম খণ্ড*, দিল্লী, ১৯০৭, পৃ. ১৮৬।
১৩৭. মোস্তাকি, হামদুল্লাহ, *নুযহাতুল কুলূব*, তেহরান, ১৯৫৭, পৃ. ১১১; ইব্‌ন, খোরদায্‌বে, *আল মাছালিক আল মামালিক*, লেইডেন, ১৯০৬, পৃ. ১৩১।
১৩৮. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঐ।*
১৩৯. ঐ, পৃ. ৭৯।
১৪০. ঐ, পৃ. ৮০।
১৪১. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, পৃ. ১৩।
১৪২. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঐ।*
১৪৩. আওফি, মোহাম্মদ, *লুবাবুল আলবাব*, তেহরান, ১৯৫৮, পৃ. ৭১; আহমদ, ড. জহুরুদ্দিন, *পাকিস্তান মেয়ানে ফারসি আদাব*, লাহোর, ১৯৬৪, পৃ. ৩৮।

১৪৪. **হাজভেরীঃ** শেখ আলী ইব্ন ওসমান হাজভেরী আল হাজভেরী আল জাল্লাবী, আবু হাসান সাইয়েদ আলী ইব্ন ওসমান। উপনাম দাতা গানজ্ বখ্শ। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামের এই মহান সাধকের মাযার শরীফ লাহোরে অবস্থিত। এখান প্রচুরসংখ্যক পাথরে খোদিত ফারসি শিলালিপি রয়েছে। এখনও প্রতিদিন অগনিত ভক্ত-অনুরাগী ও পর্যটক এখানে ছুটে আসেন। [দ্রষ্টব্য: আলী, রাহমান, *তাজকেরায়ে ওলামায়ে হেন্দ*, লক্ষ্ণৌ, ১৯১৬, পৃ. ৫৯।]
১৪৫. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮০-৮১।
১৪৬. সাফা, ড. জাবি উলাহ, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান ২য় খণ্ড*, তেহরান, ১৯৮৪, পৃ. ৪৭০-৪৭১।
১৪৭. সাফা, ড. জাবি উলাহ, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান ২য় খণ্ড*, তেহরান, ১৯৮৪, পৃ. ৪৪৯।
১৪৮. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮১।
১৪৯. আহসান, ড. আব্দুল শাকুর, প্রবন্ধ 'ফারসি সারমায়ে ফারহাঙ্গিয়ে ম' *ফারসি দার পাকিস্তান*, ইরান-পাকিস্তান পারসিয়ান সেন্টার, লাহোর, ১৯৭১, পৃ. ২২।
১৫০. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ।
১৫১. ঐ।
১৫২. ঐ।
১৫৩. আহমদ, খাজা নিজামউদ্দিন, *তাবাক্বাত-এ-আকবরী ১ম খণ্ড*, কলকাতা, ১৯২৭-৩১, পৃ. ৩৭।
১৫৪. স্বপন, আনিসুর রহমান, ঐ, পৃ. ২১।
১৫৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ১৬।
১৫৬. **সুলতান অব দিল্লীঃ** সুলতান অব দিল্লীর পাঁচটি রাজবংশ হচ্ছে যথাক্রমে মামলুক (শাসনকাল ১২০৬-১২৯০ খ্রিস্টাব্দ), খলজি (১২৯০-১৩২০ খ্রিস্টাব্দ), তুঘলক (১৩২০-১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ), সাদাত (১৪১৪-১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ) ও লোদি (১৪১৫-১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। [দ্রষ্টব্য: আওফী, মোহাম্মদ, *জামেউল হেকায়াত*, তেহরান বিশ্বদ্যিালয়, তেহরান, ১৯৫৬, পৃ. ড. মঈন কর্তৃক লিখিত ভূমিকা অংশ।]
১৫৭. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮২।
১৫৮. ঐ।
১৫৯. আওফী, মোহাম্মদ, *জামেউল হেকায়াত*, তেহরান বিশ্বদ্যিালয়, তেহরান, ১৯৫৬, পৃ. ড. মঈন কর্তৃক লিখিত ভূমিকা অংশ।
১৬০. *বাংলা পিডিয়া খণ্ড ৬*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৫।
১৬১. **ভোজরঃ** কাজী রুকন উদ্দিন সমরকন্দি ছিলেন মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিক যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের অন্যতম। আলী মর্দান খিলজির শাসনামলে (১২১০-১২১৩ খ্রি.) লক্ষ্ণৌ শিক্ষা দীক্ষায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যার ফলে দূর দূরান্ত থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এখানে লোকজনের আগমন ঘটে। লক্ষ্ণৌর দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজী রুকন উদ্দিন আগত লোকদের সাথে ধর্মীয় ও দার্শনিক বিষয়ে আলোকপাত করতেন। এ ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ধর্মীয় বিষয়ে বোঝাপড়া করার লক্ষ্যে কামরূপ থেকে নৌ পথে বঙ্গের রাজধানী লক্ষ্ণৌ আগমনকারী ব্যক্তিটিই হলেন ভোজর নামক ব্রাহ্মণ। ভোজর কাজী রুকন উদ্দীনের সাথে আলোচনা করে নবী (সা.) এর মোরাকাবা-মুশাহাদা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ভোজর তাঁর যোগশাস্ত্রীয় অমৃতকুণ্ড গ্রন্থটি কাজীকে উপহার দেন। যা পরবর্তীকালে কাজী ফারসি ভাষায় *বাহারুল হায়াত* ও আরবি ভাষায় *হাউজুল হায়াত* নামে অনুবাদ করেন। [দ্রষ্টব্য: সরকার, মো. আবুল কালাম, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য* ১৯৭১-২০০৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ১০২।]
১৬২. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৮৮।
১৬৩. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৫৮।
১৬৪. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮৩।
১৬৫. আমিরী, কেইমারছ, *যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার হেন্দ*, তেহরান, ১৯৯৫, পৃ. ১২।
১৬৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৫৯।
১৬৭. **আমির খসরু দেহলভীঃ** তিনি ১২৫৩ খ্রি. ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত ইতাহ জিলার পাতিয়ালী (মুমিনাবাদ)-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। কর্মজীবনে আমীর খসরু আমীর মালিক কিসলু খাঁন ও দিল্লির সুলতান

কায়কোবাদ-এর পিতা বোগরা খাঁন-এর অধীনে কর্শরত ছিলেন। থাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো *দীওয়ান ও কিরান-উস-সাদাইন*। তিনি একজন ঐতিহসিক দার্শনিক কবির পাশাপাশি একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। [দ্রষ্টব্য: বাদাখশানী, মীর্যা মকবুল বেগ, *আদব নামেয়ে ইরান*, এস ডি প্রিন্টার্স, লাহোর, তা.বি., পৃ. ৪৮৫; নোমানী, আল্লামা শিবলী, *শেরুল আযম।*]

১৬৮. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ।

১৬৯. **নিযামী গানজুবী:** তাঁর পুরো নাম হাকীম আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস ইবন ইউসুফ নিযামী। ৫৩০/ ৫৩৫ হি. তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মাত্র সতের বছর বয়সে আধ্যাত্মিক সফলতা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আলী আসকর যাদেহ ৬০৫ হি.,কাজবীনী তাঁর *আসারে বেলাদ* গ্রন্থে ৫৯০ হি. মুহাম্মদ মুঈন ও যবীহউল্লাহ সাফা ৬১৪ হি. বলে উল্লেখ করেন। তিনি গাঞ্জ শহরেই মৃত্যুবরণ করেন। নিযামীর পাঁচটি মসনবী গ্রন্থ রয়েছে যা পাঞ্জেগাঞ্জে নিযামী বা পঞ্চরত্ন হিসেবে সমধিক পরিচিত। এ পঞ্চরত্ন ছাড়াও দিওয়ানে নিযামী নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন রয়েছে। [দ্রষ্টব্য: যানযানি, বারায়াৎ, *আহওয়ার ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, মুআসেসেয়ে এন্তেশারাত ভা চাপে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭২ সৌরবর্ষ, পৃ. ১-২, ১৩-১৪; Brown, Edward G., *A Literary History of Persia vol. II,* Cambridge University Press, London, 1928, p. 401.]

১৭০. **খামছা:** খামছা শব্দটি আরবি, এর অর্থ হচ্ছে পঞ্চক বা পাঁচ। আরবি বা ফারসিতে পঞ্চপদী কবিতাকে খামছা বলা হয়।

১৭১. Brown, Edward G., *A Literary History of Persia,* Cambridge, 1929, p. 109.

১৭২. আনুশেহ্, হাসান (সম্পা.), *দানেশ নামেয়ে আদাবে ফারসি দার শেব্বে ক্বারেহ (হিন্দ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) ২য় অধ্যায়: হে-এইন ৪র্থ খণ্ড*, কেতাব খানেয়ে মিলিয়ে ইরান, তেহরান, ১৯৯৬, পৃ. ৯৭৫।

১৭৩. **সাদি শিরাজি:** ফারসি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। যিনি মানবতাবাদী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। তবে তাঁর দার্শনিক, পর্যটক ও জনসেবক হিসেবেও পরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে। তাঁর পুরো নাম আবু মুহাম্মদ মুশাররফ উদ্দিন (শারপুদ্দিন) মুসলেহ বিন আবদুল্লাহ বিন মুশাররফ আস্ সা'দি আশ শিরাজী। তবে সর্ব সাধারণের কাছে সা'দি নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ১১৮৪ খ্রি. মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১ ও ১১৯৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।সা'দ ইবন জঙ্গী (৫৯৯-৬৩২ হি.) কবির প্রতি অনুগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ সাদী কাব্যনাম গ্রহণ করেন। ৬৯১ হি. মোতাবেক ১২৯২ খ্রি. শিরাজ নগরে মৃত্যুবরণ করেন। সাদীর রচনাবলীর মধ্যে কারীমা, বুস্তান ও গুলিস্তান অন্যতম। [দ্রষ্টব্য: Brown, E. G., *A literary History of Persia Vol. II,* The Syndics of Cambridge University Press, 1969, pp. 526-528; সাফা', যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান*, এন্তেশারাতে ফেরদৌস, চাপখানেয়ে রামীন, তেহরান, ১১তম সংস্করণ, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ, পৃ. ৫৮৪-৫৮৫।]

১৭৪. নওশাহরভী, আবূ ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান, *নুজহাতুল খাওয়াতির*, লাহোর, ১৯৬৭, পৃ. ৩৩।

১৭৫. **ফেরদৌসি:** বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি এবং ইরানের জাতীয় কবি। তাঁর উপনাম আবুল কাসেম এবং উপাধি ফেরদৌসি। তিনি ৩২৯/৩৩০ হি. মোতাবেক ৯৪০/৯৪১ খ্রি. ইরানের 'তুস' নগরের 'তাবরান' এলাকার 'বায' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪১১ হি. মোতাবেক ১০২০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে *শাহনামা* ও *ইউসূফ-জোলেখা* অন্যতম। বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য *শাহনামার* মাধ্যমে তিনি ইরানিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে সুরক্ষিত ও কালজয়ী করে নিজেও কালজয়ী হয়েছেন। [দ্রষ্টব্য: সাফা', যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান ১ম খণ্ড*, এন্তেশারাতে ফেরদৌস, তেহরান, ১২তম সংস্করণ, ১৩৭১ সৌরবর্ষ, পৃ. ৪৫৮-৪৫৯;

শাফাক, রেজা যাদেহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১ম সংস্করণ, তেহরান, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ, পৃ.৭৯; নোমানী, আল্লামা শিবলী, সাইয়েদ মোহাম্মদ তাকী খরদায়ী গিলানী (অনু.) *শেরুল আজম ২য় খণ্ড*, দুনিয়ায়ে কিতাব, তেহরান, ১৩৬৩ সৌরবর্ষ, পৃ. ৭১।]

১৭৬. **শাহনামা:** বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি এবং ইরানের জাতীয় কবি ফেরদৌসি রচিত বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য গ্রন্থের নাম *শাহনামা।* শাহ অর্থ শাহ বা শাহানশাহ বা বাদশাহ আর না'মে শব্দের ফারসি অর্থ চিঠি অর্থাৎ, শাহনামে শব্দটি দ্বারা বুঝায় রাজা-বাদশাহদের চিঠি বা রাজা বাদশাহদের বর্ণনা সম্পর্কিত বিষয় যে গ্রন্থে বা চিঠিতে বা স্থান পায়। ফেরদৌসির শাহনামায় রাজা-বাদশাহদের প্রশংসা ও কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য *শাহনামার* মাধ্যমে তিনি ইরানিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে সুরক্ষিত ও কালজয়ী করেছেন।

১৭৭. **আনওয়ারী:** ইরানের অন্যতম নামকরা কবি; যিনি কাসিদা রচয়িতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না তবে তাঁর মৃত্যু ৫৮৩ হিজরি / ১১৮৭ অথবা ১১২৬-১১৮৯/১১৯০ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর রচিত কাসিদাগুলোর বিষয়বস্তু হলো আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা। তাঁকে হিজরী সপ্তম শতকের (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) শেখ সা'দীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। [দ্রষ্টব্য: শাফেয়ী কাদকানী, মুফলেসে কিমীয়া' ফোরুশ, পৃ. ৫৬; তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, (অনুবাদ-তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও ঈসা শাহেদী), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, পৃ. ৮৪-৮৫।]

১৭৮. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮৪।

১৭৯. সিরাজ, আরিফ শামস্, *তারিখে ফিরোজশাহী*, জামেয়া উসমানিয়া, ১৯৩৮, পৃ. ৩৫২।

১৮০. নুমানী, আল্লামা শিবলী, *শে'রুল আযম খণ্ড ৫*, আল ফয়সাল, লাহোর, ১৩৮৫ হিজরি, পৃ. ৬৯।

১৮১. **কাসিদা:** এমন সব কবিতাকে কাসিদা বলা হয় যার মাধ্যমে কেনো ব্যক্তি বিশেষ বা রাজা-বাদশাহর গুণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। [দ্রষ্টব্য: ময়েজউদ্দীন, মোহাম্মদ, *রাহনুমায়ে সুখান*, (: কুরআন মনযিল, ঢাকা, তা.বি., পৃ. ৫৭।]

১৮২. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৫৯।

১৮৩. **শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা:** ১৩শ শতকের বিখ্যাত হাম্বলী ধর্মতত্ত্ববিদ শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.) দিল্লীতে আগমন করেন (১২২৬ খ্রি.)। বিদ্বান, আমীর, সাধারণ লোক সকলেই বহুগুণে গুণান্বিত তাওয়ামার প্রতিআকৃষ্ট হন। এত সুলতান ঈর্ষান্বিত হয়ে সুকৌশলে তাঁকে সোনারগাঁয়ে প্রেরণ করেন (১২৭৭ খ্রি.) । তাওয়ামার তত্ত্বাবধানে সোনার গাঁ তৎকালীন সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দে হিসেবে গণ্য হতো। শায়খ শারফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানোরী (র) (১২৬৩- ১৩৭১ খ্রি.) তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। [দ্রষ্টব্য: রহিম, এম.এ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১২৭৬ খ্রি.) ১ম খণ্ড*, (বঙ্গানুবাদ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১১৭; রশীদ, আ. ন. ম রজলুর, *আমাদের সূফীসাধক*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪০৯]

১৮৪. করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪০৯।

১৮৫. ঐ, পৃ. ৪৫১।

১৮৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।

১৮৭. *বাংলা পিডিয়া খণ্ড ৬*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৭।

১৮৮. **হাফেজ শিরাজি:** তাঁর পুরোনাম শামসুদ্দিন মুহম্মদ হাফেজ শিরাজি। তিনি ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে শিরাজ নগরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁকে শিরাজী বলা হয়। তিনি *দিওয়ানে হাফেজ* রচনার জন্য বিখ্যাত। তাঁর মধ্যে এশকে এলাহির প্রেম ছিল গভীর। সুফিবাদের যে ধারা তাঁর রচনার মধ্যে দেখা যায় সেটি অত্যন্ত পরিপূর্ণ ও খুবই শক্তিশালী। আবদুর রহমান জামি তাঁকে '*লিসানুল গায়েব*' (অদৃশ্যের ভাষ্যকার) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে গযলকাব্যের রচয়িতা হিসেবে তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে *তরজমানুল আসরার* (রহস্যের মর্মসন্ধানী) উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বাল্যকালে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করে হাফিজ উপাধি অর্জন করেন। হাফিজের কাব্য প্রতিভার একমাত্র নিদর্শন *দীওয়ান* (কাব্য সমগ্র) যা *গযল*, *কাসীদা*, *রবাঈ* ও *মসনবী*র সমাহার। [দ্রষ্টব্য: শাফাক, রেজা যাদেহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, চাপ খানে আরমান, তেহরান, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ, পৃ. ৩০৭; Arberry, A. J., *Classical Persian Literature*, Geprge Allen And Unwin ltd. London, p. 330; নোমানী, আল্লামা শিবলী, *শেরুল আজম*, আল ফয়সাল, লাহোর, ১৩২৫ হিজরী, পৃ. ১৬৯।]

১৮৯. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮৫।

১৯০. *বাংলা পিডিয়া খণ্ড ৬*, ঐ।

১৯১. নুমানী, আল্লামা শিবলী, *শে'রুল আযম খণ্ড ৫*, ঐ, পৃ. ১৩৭।

১৯২.

'হে সাকী ! দেবদারু, ফুল টিউলিপের আলোচনা চলছে
পান-পেয়ালাসহ তিন প্রেয়সীকে নিয়ে এ আলোচনা চলছে।
আজকে পাঠায় বাংলায় ইরানের এই ইক্ষু শাখা
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টি মাখা

কাদির, আব্দুল (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড* (কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনঃমুদ্রণ ১৯৯৬, পৃ. ৪৫।

১৯৩. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।

১৯৪. E. G. Brown, *A literary History of Persia, Vol. 3,* The Cambridge University Press, Cambridge, 1969, P. 285

১৯৫. **শায়খ নুর কুতুবুল আলমঃ** তিনি ছিলেন শেখ আলাউল হকের পুত্র। শেখ আলাউল হক সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহের সমসাময়িক ছিলেন আর নুর কুতুব আলম ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সমসাময়িক। বিনয় আয়ত্ত্ব করার মানসে তিনি তাঁর পিতারকাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত হন এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস-এর ভাষ্যানুযায়ী তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা একশত একুশটি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো রাজা গণেশের নিপীড়ন থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করে বাংলায় মুসলিম শাসন বহাল রাখা। তিনি ৮১৮ হি. মোতাবেক ১৪১৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দরগাহকে শশহাজারী বা ছয় হাজারী বলা হয়ে থাকে।

[দ্রষ্টব্যঃ *বাংলা পিডিয়া খণ্ড ৯*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৫৪; করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৯৬-২২৪; খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব,* বাংলা একাডমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১০০।]

১৯৬. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬০।

১৯৭. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২২-২৩।

১৯৮. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬০-৬১।

১৯৯. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬১।

২০০. *বাংলা পিডিয়া খণ্ড ৬*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৭; করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫১৮-৫১৯।

২০১. **গৌড়ঃ** ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় অন্যতম বৃহৎ নগরী। আনুমানিক ১৪৫০ খ্রি. থেকে ১৫৬৫ খ্রি. পর্যন্ত এটি বাংলার রাজধানী ছিল। নগরটি বর্তমান ভারতের মালদা শহরের দক্ষিণে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের পূর্বাংশে ২৪ক্র৫২ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮ক্র১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় চার মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। [দ্রষ্টব্যঃ *বাংলা পিডিয়া খণ্ড ৩*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১৭।]

২০২. **পাণ্ডুয়াঃ** ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের গৌড় থেকে প্রায় ২০ মাইল এবং বর্তমান মালদা শহর থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি শহর। শহরটি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময়ে (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রি.) টাকশাল এবং রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৪২ খ্রি. রাজধানীর মর্যাদা লাভের পূর্বেই পাণ্ডুয়া উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এখানে প্রাপ্ত বহু হিন্দু ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন এটির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ১৩৫৩ খ্রি. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সম্ভবত বাংলার প্রথম দিকের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ-এর (১৩০১-১৩২২ খ্রি.) নামানুসারে শহরটির নতুন নাম দেন ফিরুজাবাদ। পঞ্চদশ শতাব্দরি মাঝামাঝি পর্যন্ত এটি প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল। টাকশাল শহর হিসেবে এর মর্যাদা শেরশাহ এর আমল (১৫৪০-৪৫ খ্রি.) পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। পাণ্ডুয়ার শহরতলী শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজি (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং নুর কুতুব আলম প্রমুখ বিখ্যাত দরবেশদের আকৃষ্ট করে। তাঁরা এখানে খানকাহ (ধর্মশালা) স্থাপন করেন। এ কারণে শহরটি হজরত পাণ্ডুয়া নামেও পরিচিত। মহানন্দা নদীর গতি পরিবর্তন এবং ১৪৫০ খ্রি. গৌড়ের রাজধানী স্থানান্তরকরণের কারণে পাণ্ডুয়ার পতন হয়। [দ্রষ্টব্যঃ *বাংলা পিডিয়া খণ্ড ৫*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪০; ইসলাম, কাজী মো. শহীদুল, ও ভূইয়া, মো. আবুল কাসেম (অনু.), *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৬।]

২০৩. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৬।

২০৪. **বড় আরআইন খানাঃ** লক্ষণসেনী দালান, ভাণ্ডার খানা, তনুর খানা বা পাক ঘর, কুতুব শাহী মসজিদ, আদিনা মসজিদ।

২০৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।

২০৬. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য সং-৩য়*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৪৩।

২০৭. Ikram, S. M. and Spear, P., (ed), *Cultural Heritage of Pakistan*, Ibid**,** p. 112. উদ্ধৃতঃ আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ঐ, পৃ. ২১।

২০৮. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮৪।

২০৯. বতুতা, ইব্ন, *সফরনামেহ ২য় খণ্ড*, (ফারসি অনুবাদ মোহাম্মদ আলী মোঃ আহ্হেদ), তেহরান, ১৯৫৮, পৃ. ৪৬২।

২১০. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ।

২১১. মোহাম্মদ, ড. রিয়াজ, *আহওয়াল ওয়া আশ্আরে মির সাইয়্যেব আলী হামদানী*, ইরান-পাকিস্তান পারসিয়ান সেন্টার, ইসলামাবাদ, ১৯৯১, পৃ. ৪৬।

২১২. ঐ।

২১৩. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮৬।

২১৪. জামেয়ি, আহমদ মাস্জিদ (সম্পা.), *নামেহে্ পারসি*, প্রবন্ধ, 'পারসি সারায়ানে হিন্দু' ড. গোলাম আলী আরিয়া, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪, শুরায়ে গোস্তারেসে যাবান ওয়া আদাবিয়্যাতে ফারসি, তেহরান, ২০০১, পৃ. ৯৭।

২১৫. আবদুল্লাহ, ড. সাইয়েদ, *আদাবিয়্যাতে ফারসি মেয়নে হিন্দু কা হেস্সে*, আনজুমানে তারাক্কী উর্দু (হিন্দ), নয়াদিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৩৭।

২১৬. তাভাস্সোলী, ড. এম. এম. (সম্পা.), *দানেশ*, প্রবন্ধ, 'ফারসি সারায়ানে হিন্দু দার কাশ্মির' ড. আসফা যামানী, সিরিয়াল নং ৫০ ,ইরান-পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ পার্শিয়ান স্টাডিজ সেন্টার, ইসলামাবাদ, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৭-১৭৮।

২১৭. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮৬।

২১৮. Brown, Edward G., *A Literary History of Persia*, Cambride, 1956, p.445-448

২১৯. রেজাভী, ড. সাইয়্যেদ শিবলী হাসান, *ফারসিগুইয়ানে পাকিস্তান* ***১ম*** *খণ্ড*, ইরান-পাকিস্তান পার্শিয়ান স্টাডিজ, ইসলামাবাদ, ১৯৭৪, পৃ. ২৫।

২২০. **মসনবীঃ** মসনবী দ্বিপদী বিশিষ্ট মোটামুটি দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য। যার প্রতিটি শ্লোকেরই ভিন্নতর অন্তমিল বিদ্যমান থাকে এবং ধ্বনি/মাত্রা একই হয়ে থাকে। এধরনের কবিতার বিষয়বস্তু কাহিনী, আধ্যাত্মবাদ বা চরিত্র বিষয়ক হয়ে থাকে। [দ্রষ্টব্যঃ ময়েজউদ্দীন, মোহাম্মদ, *রাহনুমায়ে সুখান*, কোরআন মঞ্জিল, ঢাকা, তা. বি., পৃ. ৫৯।]

২২১. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬২।

২২২. ইস্ফাহানী, মির্জা মোহাম্মদ তাহের, *তাজকেরায়ে নাসরাবাদী*, তেহরান, ১৯৩৮, পৃ. ৫৫-৫৬।

২২৩. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৭৯, পৃ. ১০৯।

২২৪. **রাজা টোডরমলঃ** জন্ম লাহোরে , ১৮ রছর বয়সে বাদশা আকবরের দরবারে প্রথম চাকরি জীবন শুরু করেন। ২২ বছর বয়সে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ২৭ বছর বয়সে দেওয়ান-এর পদ লাভ করেন। ৯৯৮ হিজরিতে মৃত্যুরণ করেন। সরকারী কাজে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার হত, সেটি তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি *খাজান আস্রার* নামে ফারসিতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। [দ্রষ্টব্যঃ আবদুল্লাহ, ড. সাইয়েদ, *আদাবিয়্যাতে ফারসি মেয়নে হিন্দু কা হেস্সে*, আনজুমানে তারাক্কী উর্দু (হিন্দ), নয়াদিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৬১।]

২২৫. আবদুল্লাহ, ড. সাইয়েদ, *আদাবিয়্যাতে ফারসি মেয়নে হিন্দু কা হেস্সে*, আনজুমানে তারাক্কী উর্দু (হিন্দ), নয়াদিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৬১।

২২৬. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮৭।

২২৭. আবদুল্লাহ, ড. সাইয়েদ, *আদাবিয়্যাতে ফারসি মেয়নে হিন্দু কা হেস্সে*, ঐ, পৃ. ৫৪।

২২৮. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য সং-৩য়*, ঐ, পৃ. ১৩১-১৩২।

২২৯. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ।

২৩০. জামেয়ি, আহমদ মাস্‌জিদ (সম্পা.), *নামেহে্ পারসি*, ঐ, পৃ. ৯৮-৯৯; *মুন্‌তাখাবুত তাওয়ারিখ ২য় খণ্ড*, পৃ. ১৮৩-২১৪-২৬৬-৩২০।

২৩১. **আবুল বারাকাত মুনীর লাহোরী:** তিনি ১৬০৯খি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল জলিল তিনি তাঁর ভাই সায়েফ খাঁর কর্মচারী জমিরের সাথে সুবাদার সায়েফ খাঁর শাসনামলে (১৬৩৯ খ্রি.) ঢাকায় আগমন করেন। সায়েফ খাঁর মৃত্যুর পর তারা এদেশ ছেড়ে চলে যান। ১৬৪৫ খ্রি. তিনি আগ্রায় মৃত্যুবরণ করলে লাহোরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। [দ্রষ্টব্য: আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৯।]

২৩২. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।

২৩৩. দ্রষ্টব্য: ঐ।

২৩৪. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ঐ, পৃ. ২৯।

২৩৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬২।

২৩৬. বিল্লাহ, আবু মূসা মো. আরিফ, 'ফারসি দার বাংলাদেশ', *রাহ আভারদ*, গুজারেশে নাখুস্তিনে মাজমায়ে বাইনাল মিলালী উস্তাদানে যবানে ফারসি ইরান, তেহরান, ১৩৭৬ সৌরবর্ষ, পৃ. ৩০৫।

২৩৭. করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস: মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৬।

২৩৮. Sarkar, J. N., *History of Bengal,* vol. II, Dacca University, 1948, p. 335.

২৩৯. **সিকান্দারনামা:** এর মূল ফারসি উচ্চারণ এসকান্দার না'মে। গ্রন্থটি দু'টি অংশে বিন্যস্ত। প্রথম অংশের নাম ইকাবাল নামে বা ইকবালনামা দ্বিতীয় অংশের নাম খেরাদ নামে গ্রন্থটি ৫৯৭ হি. অনুযায়ী ১২০০ খ্রি. রচনা করা হয়। [দ্রষ্টব্য: বাদাখশানী, মির্যা মকবুল বেগ, *আদাব নামায়ে ইরান*, এইচ ডি প্রিন্টার্স, তা. বি., লাহোর, পৃ. ৩৮৪।]

২৪০. ***হাফ্‌ত পেইকার: হপ্ত পয়কর*** নামের মূল গ্রন্থটির ফারসি উচ্চারণ, হাফ্‌ত পেইকার-এর বাংলা অর্থ সপ্তদেহ। *বাহরামনামা* নামেও গ্রন্থটির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। বইটি মসনবী বা দ্বিপদী কবিতাকারে রচিত। নিযামী গাঞ্জাবী ৫৯৩ হি. মোতাবেক১১৯৬ খ্রি. গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে মোট ৪৭০০ টি পংক্তি রয়েছে। [দ্রষ্টব্য: বাদাখশানী, মির্যা মকবুল বেগ, *আদাব নামায়ে ইরান*, এইচ ডি প্রিন্টার্স, তা. বি., লাহোর, পৃ. ৩৮৪; শাকিবা, পারভীন, *শে'রে ফারসি আ'য আ'গা'য তা এমরোয*, এন্তেশারাতে হিরমান্দ, তেহরান, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ১০৬।]

২৪১. মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার ও খান, মুহাম্মদ আব্দুস সবুর, ঐ, পৃ. ৫৭৩।

২৪২. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬৩।

২৪৩. হাফিজ, আবেদা *'তারীখে শাহ শুজাই,'* অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, ১৯৬৮, পৃ.১।

২৪৪. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।

২৪৫. ঐ।

২৪৬. মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার ও খান, মুহাম্মদ আব্দুস সবুর, ঐ, পৃ. ৫৬৪।

২৪৭. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।

২৪৮. **মির্জা নাথান:** আলাউদ্দীন ইসফাহান ওরফে মির্জা নাথান ছিলেন মীর জুমলার শাসনামলের (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.) একজন সৈনিক কবি। তাঁর পিতা মালিক আলী (পরবর্তীকালে ইহতিমাম খান) রাজকীয় নৌবহরের মীর বহর বা এডমিরাল হিসাবে ১৬০৮ খ্রি. সুবাহদার ইসলাম খান চিশতীর সাথে বাংলায় আগমন করেন। মির্জা নাথান পিতার সাথে এসে রাজকীয় প্রশাসনে যোগদান করে প্রায় বিশ বছর বাংলায় চাকুরী করেন। [দ্রষ্টব্য:*বাংলা পিডিয়া খণ্ড* ৭, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬৪-৬৫।]

২৪৯. মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার ও খান, মুহাম্মদ আব্দুস সবুর, ঐ, পৃ. ৫৬৫।

২৫০. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬৪।

২৫১. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ঐ, পৃ. ১০৯।

২৫২. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঐ, পৃ. ৮৮।

২৫৩. ঐ।

২৫৪. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ঐ, পৃ. ৯৮।

২৫৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
২৫৬. Sarkar, J. N., *History of Bengal,* Ibid, p. 410.
২৫৭. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ।
২৫৮. ঐ, পৃ. ৬৫।
২৫৯. রাশেদী, ওফা, *বাঙ্গাল মে উর্দূ*, ইশাআতে উর্দূ প্রেস, হায়দারাবাদ, ১৯৫৫, পৃ. ৩০।
২৬০. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ঐ, পৃ. ৯৯-১০১।
২৬১. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬৫।
২৬২. বানূ, শামীম, *তারীখচেহ অ'মুযাশে যবানে ফারসি দর বাংলাদেশ ভা মুশকিলাতে কানুনীয়ে অ'ন*, রাহ আভারদ, গুজারিশে নাখুস্তিনে মাজমায়ে বাইনাল মিলালী উস্তাদানে যবানে ফারসি, তেহরান, ১৩৭৬ সৌরবর্ষ, পৃ. ৭১।
২৬৩. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬৫।
২৬৪. *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৮।
২৬৫. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬৯-৭০।
২৬৬. Shojakhani, M. and Rikhtehgaran, M.R, *Indo-Iranian Thought: A World Heritage*, Dilhi, 1995, pp. 5-6.
২৬৭. বিল্লাহ, আবু মূসা মো. আরিফ, 'খিদমাতে দানেশ মান্দানে শিবহে ক্বারেহ বেযাবানে আদাবিয়তে ফারসি', *মাজমুয়ায়ে সুখানরানীহায়ে নাখুস্তীনে সেমিনার পেইওয়াস্তেগীহায়ে ফারহাঙ্গীয়ে ইরান ওয়া শিবহে ক্বারেহ*, ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ইসলামাবাদ, ১৯৯৩, পৃ. ১৮৮-১৮৯।
২৬৮. বিল্লাহ, আবু মূসা মো. আরিফ, বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসি শব্দ অভিধান, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, ৩৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪০২ বাংলা, পৃ. ১৬৩।
২৬৯. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৬৮।
২৭০. সরকার, মো. আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ৭০।
২৭১. ঐ, পৃ. ৮৫।
২৭২. ঐ, পৃ. ৮৫।
২৭৩. ঐ, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২

১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫

১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০
২০১
২০২
২০৩
২০৪
২০৫
২০৬
২০৭
২০৮

২০৯
২১০
২১১
২১২
২১৩
২১৪
২১৫
২১৬
২১৭
২১৮
২১৯
২২০
২২১
২২২
২২৩
২২৪
২২৫
২২৬
২২৭
২২৮
২২৯
২৩০
২৩১
২৩২
২৩৩
২৩৪
২৩৫
২৩৬
২৩৭
২৩৮
২৩৯
২৪০
২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪
২৪৫
২৪৬
২৪৭
২৪৮
২৪৯
২৫০
২৫১
২৫২
২৫৩
২৫৪
২৫৫
২৫৬
২৫৭
২৫৮
২৫৯
২৬০
২৬১

২৬২

২৬৩

২৬৪

২৬৫

২৬৬

২৬৭

২৬৮

২৬৯

২৭০

২৭১

২৭২

২৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

মানব সভ্যতার ইতিহাস যখন থেকে লেখা শুরু হয় তখন থেকেই ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ মানব সভ্যতার প্রতিটি বিষয়ের কোন না ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাক্ষ্যের অপেক্ষা না করেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার গোড়া পত্তন হয় মানব জাতির সূচনালগ্ন হতেই। তার কারণ, আধ্যাত্মিকতা মানুষের সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে ঠিক তেমনিভাবে জড়িত; যেমনিভাবে ষড়রিপু তাঁর সত্তার সাথে জড়িত রয়েছে; আর তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মানব জীবনের কোন না পর্যায়ে কোনো না কোনো সময়ে প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় সত্তার মাঝে এ অধ্যাত্মবাদী মানস ও অনুভূতির সন্ধান লাভ করতে পারে। ষড়রিপু যেমন সৃষ্টির আদি থেকেই মানব সত্তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত–ঠিক তেমনি তার এই অধ্যাত্মবাদী সত্তা তার জীবন ও চরিত্রের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তাই চিরায়ত ধারায় মানুষের অধ্যাত্মবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্নভাবে। ধর্মের মৌল অনুভূতি মানুষ এই আধ্যাত্মিক মানস দ্বারাই অনুধাবন করতে শিখেছে।[১] ফলে গড়ে ওঠেছে এক সুস্পষ্ট চিন্তাধারা, একটি বিষয়বস্তু (Subject matter) সম্পূর্ণ স্বাধীন (Independent-অন্যদিকের সাথে সমন্বয় নিরপেক্ষ) এক জীবনধারা যাকে অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) নামে অভিহিত করা হয় এবং যা মুসলিম সমাজে সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতা বা অধ্যাত্মবাদী জীবনধারা হিসেবে পরিচিত।

তাসাউফত্ত্ব ইসলামের একটি রহস্যমন্ডিত আধ্যাত্মিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য গূঢ় অনুভূতির অন্বেষণ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান। ষড়রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে স্রষ্টার পরম সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থানের মাধ্যমে প্রেম ও নৈকট্য লাভের ইলম ও পথ-পদ্ধতি অবলম্বনকে তাসাউফ বলে। অধ্যাত্মবাদী অনুভূতি মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন এক অনুভূতি। সে এমন এক অনুভূতি যার সঙ্গে কুরআন মজীদের শিক্ষার আর হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপদেশমালার সঙ্গতি রয়েছে আর এ মিলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে সেই ধ্যানমূলক বা আদর্শবাদী দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা সূফীবাদ (ইলমে-ই-তাসাউফ)।[২] আর এ অনুভূতির উদ্দেশ্য হলো আত্মা ও হৃদয়ের প্রেম ও বাহ্যিক জীবনের কর্মকাণ্ড এবং সাধনার দ্বারা অসীম সত্তা তথা মহান ও পবিত্র রবের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করা।

এ অনুভূতির প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে যুগে যুগে বিভিন্ন স্থান ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন সাধক, তাপস ও স্রষ্টার সান্নিধ্যপ্রেমী অধ্যাত্মবাদীরা বিভিন্ন ও বিশেষ ধরনের সুশৃঙ্খল জীবন যাপন, ধ্যান ও সাধনায় রত থেকেছেন।

ক্ষেত্রবিশেষে এসব সাধকগণ তাঁদের অধ্যাত্মবাদী এসব অনুভূতির উৎকর্ষতার চরম প্রকাশ হিসেবে এগুলো লিপিবদ্ধ করে সেগুলোর সাহিত্যিকরূপও দিয়েছেন। আর, সেসব সাহিত্যকর্ম 'অধ্যাত্মবাদী সাহিত্য' হিসেবে বিবেচিত এবং এগুলোর গভীর তাৎপর্য ও প্রভাব রয়েছে। হিজরি দশম শতকে আধ্যাত্মিক সাধনার সুবিখ্যাত পীর, কুতুব ও প্রোজ্জ্বল পুরুষ ও মুরশিদগণ বিভিন্ন তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন সাহিত্য ও কাব্যকর্ম সৃষ্টি করেন যা আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ। ফারসি সাহিত্যও অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ একটি সাহিত্য। ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখায় এ আধ্যাত্মিক ধারা সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের ফারসি সাহিত্যে চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। আর এ উৎকর্ষতাই ফারসি সাহিত্যে উত্তরোত্তর বিকাশ সাধন করে এবং এর প্রসারের পথকে অধিকতর সুগম করে তোলে। ফলে ফারসি সাহিত্যে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়।

'মধ্যযুগে ফারসি সাহিত্য উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছে। এ যুগে আবুল কাসেম ফেরদৌসী, ফারসি ভাষায় শাহনামা রচনা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছড়ান। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ওমর খইয়াম, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, হাফেজ সিরাজী, জালাল উদ্দিন রুমী প্রমুখের ন্যায় বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতিমান কবিদের আগমন ঘটে।'[৩]

এসময় বিশেষত ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখায় অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক কবিতা রচনার দ্বারা পারস্যের কবিগণ বিশেষ সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হন। আর, ফারসি সাহিত্যের উৎকর্ষ, বিকাশ ও প্রসারে এ অধ্যত্মবাদী কাব্য ধারা এবং এর রচয়িতা কবিগণই সবচেয়ে অগ্রগণ্য। কেননা, ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত। ফারসি সাহিত্যের বিস্তৃতি, বিকাশ, উৎকর্ষ ও প্রসারে ফারসি সাহিত্যের সমৃদ্ধ কাব্য শাখায় অধ্যাত্মবাদী ধারার শ্রেষ্ঠতম কবিগণের মূল্যবান সাহিত্যকর্ম যুগ যুগে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও অনসৃত হয়ে আসছে। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব কাব্যকর্মের ভাবরসের প্রভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যমোদীদের দ্বারা রচিত হয়েছে অগণিত গ্রন্থ এবং ফারসি অধ্যাত্মবাদী ধারার রচনা শৈলীর অনুবাদও হয়েছে। এসবের ফলে ফারসি কাব্য সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী ধারার কবিদের সুখ্যাতি ও এর প্রচার-প্রসার অধিকতর উচ্চ মার্গে পৌঁছে যায়। ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখার যুগশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবিগণের মধ্যে শীর্ষেই রয়েছেন আবু সাঈদ আবুল খায়ের, হাকিম সানায়ি গানঞ্জুবি, ফরিদুদ্দিন আত্তার, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি, হাফেজ শিরাজি, আল্লামা আবদুর রহমান জামি প্রমুখ।

'আরবী সাহিত্যের মতো ফারসী সাহিত্যের কাব্য শাখাই সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইরানীয় ভূখণ্ডে ইসলামী শাসন কায়েম হয় তখন থেকেই ফারসী সাহিত্যের নবজন্মের সূত্রপাত হয়

এবং কবি-সাহিত্যিকগণও নব উন্মাদনায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ফারসী সাহিত্যের আসলরূপ ইসলামীয় শাসন আমল থেকেই আরম্ভ হয় বলা চলে।'[৪]

ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যকর্মের মূলে রয়েছে ইসলামের প্রভাব। প্রকৃতপক্ষে, পারস্যে ইসলামি সভ্যতা ও শাসনের পত্তনই এর প্রধান কারণ। ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক সাহিত্যকর্মগুলোর মূল সারমর্ম পবিত্র কুরআন ও হাদিস হতেই লব্ধ। মুসলিমগণ ইসলাম প্রচারার্থে পারস্যে অবস্থান করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণকারী পারসিক কবি-সাহিত্যিকদের অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যের ভাবরস দ্বারা প্রভাবিত হন। শুধু তাই নয়, ফারসি মতো মিষ্টি-মধুর ভাষায় রচিত এসব অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যকর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য সহায়ক হওয়ায় তাঁরা এসব সাহিত্যকর্ম প্রচার ও প্রসারেও ভূমিকা রেখেছেন।

ইসলাম প্রচারের অংশ হিসেবে এ উপমহাদেশে আগমনকালের প্রাক্কালে ইসলাম প্রচারক সেসব মুসলমানদের বিরাট একটি জনগোষ্ঠী পারস্য তথা ইরানে অবস্থান করার ফলে; তাঁদের ওপর থাকা পারস্যের ফারসি ভাষায় রচিত আধ্যাত্মিক সাহিত্যকর্মের প্রভাব এতদঞ্চলের মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করে। আর, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীও তা সাদরে গ্রহণ করে। বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব ও সংসারত্যাগী ধর্মপরায়ণ ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, ও মরমি সাধকদের ধর্মপ্রচার, মানবসেবা, শিক্ষাদান, প্রেম, সাম্য, উদারতা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, ইত্যাদির ফলে বাংলার অগণিত বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৫] আর, ইসলাম 'খিদমতে খালক্ব' (সৃষ্টির সেবা), মানবতাবোধ, শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে তাসাউফ হলো সৃষ্টির সেবা ও চরিত্র গঠনের নাম।[৬] আর, সাহিত্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলা সাহিত্যিকের বড় দায়িত্ব।[৭] ফারসি সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার মানব কল্যাণ, সেবা, মহব্বত, সৌহার্দ্যের বাণী প্রভৃতির সমন্বয়েই সৃজিত হয়েছে। আর, অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে বিশেষত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়গুলোর সমন্বয়ে নতুনভাবে সাহিত্যকর্ম রচিত হয়।

বঙ্গীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকগণ মানবতার কবি শেখ সাদি (১১৮৪-১২৯২ খ্রি.) রচিত গুলিস্তান, বুস্তান, দার্শনিক কবি রুমির মসনভি এবং প্রেমের কবি হাফিজ শিরাযির (১৩১৫-১৩৯১ খ্রি.) 'দিওয়ান' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী এতদাঞ্চলে নিয়ে আসেন এবং এসবের চর্চা অব্যাহত রাখেন।[৮]

বঙ্গীয় অঞ্চলে মূলত ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমেই এ অধ্যাত্মবাদের সাধনা চর্চার সূচনা ও বিকাশ শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সৈয়দ বাশার শাহ (তিরোভাব ১০৩৯ খ্রি.) এবং পশ্চিম ভারতের (লাহোরে) দাতা গাঞ্জ বকশ (তিরোভাব ১০৭২ খ্রি.) অন্যতম। তাঁরা ছাড়াও আরো অন্যান্য অনেকের নাম ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির

তথ্যমতে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে বাবা আদম শহিদ, শাহ সুলতান মাহি সওয়ার, মখদুম শাহদৌলা শহিদ, মখদুম শাহ মামুদ গজনভি, বায়েজিদ বোস্তামি, শেখ ফরিদ, শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি, শাহ জালাল ইয়ামেনি, শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা প্রমুখ বিশেষ স্মরণীয়।[৯]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অধ্যাত্মবাদী ধারার সাহিত্যকর্মের রচনা প্রত্যক্ষ করা যায়। অধ্যাত্মবাদসমৃদ্ধ এসব সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এধারার কবিদের মধ্যে মুসলমান কবিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান চৈতিষা' ও 'জ্ঞান প্রদীপ' হাজি মুহম্মদের 'নূরজামাল,' শেখ মনসুরের 'সিররনামা,' সৈয়দ মুর্তজার 'যোগকলন্দর,' আবদুল হাকিমের 'চারি মোকাম ভেদ,' শেখ চাঁদের 'হরগৌরি সম্পদ,' মুহম্মদ শফির 'নূরনামা,' ও আলি রাজার 'জ্ঞানসাগর,' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজির মধ্যে কয়েকটি এবং এসব গ্রন্থে সেযুগের মুসলমান সমাজে মিশ্র অতীন্দ্রিয়বাদের প্রচলন প্রতিফলিত হয়।[১০]

ইসলাম প্রচারক মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং কালক্রমে তাঁদের নির্দেশে ফারসি এ অঞ্চলের রাজ-ভাষা হয়ে ওঠায় এ ভাষার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও এর সাহিত্যরীতি এ অঞ্চলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। যার প্রভাব বর্তমানকালেও পরিলক্ষিত হয়। ফলে অদ্যাবধি এ অঞ্চলে ফারসি ভাষা, সাহিত্য এবং এর অধ্যাত্মবাদী সাহিত্য ধারার ভাবরস অনুসন্ধানে গবেষক, লেখক ও সাহিত্যমোদীরা নিরত সচেষ্ট রয়েছেন। আর এতে পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধ হবে এ অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের সম্ভার; আর এটিই প্রত্যাশিত।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম*, (সংকলন), ইফাবা প্রকাশনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০১, পৃ. ১৪২।
২. Ali, Sayed Amir, `T*he Spirit of Islam'*, Kutub Khana-ul-Islam (Regd) Churi Walan, Delhi, P. 456.
৩. খান, আবদুস সবুর, *ফারসি উপন্যাসে জীবন ও মানবিকতা*, রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বই মেলা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ভূমিকা।
৪. সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ডিসেম্বর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, পৃ. ৩।
৫. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, প্রকাশক-ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৫৭।
৬. ঐ, (সংকলন), পৃ. ৬৭।
৭. হাসেম, মো. আবুল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব*, পি.এইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪, পৃ. ৩১৮।
৮. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৮৫।
৯. রহিম, এম.এ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১২৭৬ খ্রি.) ১ম খণ্ড*, (বঙ্গানুবাদ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৮২, পৃ. ৮৮-১১৫।
১০. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ঐ, পৃ. ৫৬।

গ্রন্থপঞ্জি

ফারসি গ্রন্থাবলি

নিশাবুরী, শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার, *মুসীবত নামা*, নূরানী বেসাল (সম্পা.), তেহরানঃ কিতাবফোরূশীয়ে যাওয়্যার, ১৩৬৪ সৌরবর্ষ ।

শাফাক, রেজা যাদেহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, তেহরানঃ চাপ খানে আরমান, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ।

শাফাক, রেজা যাদেহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১ম সংস্করণ ১৩৬৯ সৌরবর্ষ।

নোমানী, আল্লামা শিবলী, সাইয়েদ মোহাম্মদ তাকী খরদায়ী গিলানী (অনু.) *শেরুল আজম ২য় খণ্ড*, তেহরানঃ দুনিয়ায়ে কিতাব, ১৩৬৩ সৌরবর্ষ।

শামীসা, সিরুস, *আনওয়া ই আদাবি*, তেহরানঃ নাশরে মিতরা, ১৩৮৬ সৌরবর্ষ।

সায়ফ, আবদুর রেযা, ও মারাকাবি, গোলাম হোসাইন, *মাসনাভীহায়ে সানাঈ*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৮৯,

ফোরূযানফার, বদীউয্যামান, *শারহে আহওয়াল ওয়া নাখদ ওয়া তাহলীলে আসারে শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার নিশাবুরী*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে আন্ জুমানে আসার ওয়া মাফাখেরে ফারহাঙ্গী, ১৩৭৪ সৌরবর্ষ ।

সাফা, যবীউল্লাহ, *গানজ ওয়া গানজিনে*, তেহরানঃ মোআসসেসেয়ে এন্েশারাতে আমির কাবির, ১৩৬৩ সৌরবর্ষ।

সাফা, ড. জাবি উলাহ, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান প্রথম খণ্ড*, তেহরানঃ ১৯৮৪ ।

সাফা, যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান ১ম খণ্ড*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে কোকনুস, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ।

সাফা', যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান ১ম খণ্ড*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১২তম সংস্করণ ১৩৭১ সৌরবর্ষ।

সাফা', যবীউল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে ফেরদৌস, চাপখানেয়ে রামীন, ১১তম সংস্করণ ১৩৭৩ সৌরবর্ষ।

সাফা, যাবিউল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান ৪র্থ খণ্ড*, তেহরানঃ ফেরদৌসি পাবলিকেশন্স, ১৩৮৫ সৌরবর্ষ।

সাফা, যবীউল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান ২য় খণ্ড*, তেহরানঃ রামীন প্রকাশনী, দশম মুদ্রণ ১৯৯৫ ।

সাফা, ড. জাবি উলাহ, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান ২য় খণ্ড*, তেহরানঃ ১৯৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

কেয়া, যাহরা খানলারি, *রাহনুমায়ে আদাবিয়াতে ফারসি*, তেহরান: কিতাব খানেয়ে ইবনে সিনা, ১৩৪০ সৌরবর্ষ ।

আনুশেহ, হাসান, *দানেশনামায়ে আদবে ফারসি*, তেহরান: ওয়াযারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাদে ইসলামী, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ।

শাকিব, নে'মাতুল্লাহ কাজী, *বেসূয়ে সীমোরগ*, তেহরান: মোআসসেসেয়ে এন্তেশারাতে সিক্কে, ১৩৮০-১৩৮১ সৌরবর্ষ।

সুবহানী, তাওফিক হা. *তারীখে আদাবিয়্যাত*, তেহরান: প্রথম মুদ্রণ, পায়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ১৯৯০।

আখুন্দজাদে, মোহাম্মদ মাহদী, *তাজযিয়ায়ে শিবহেকাররে হিন্দ ও ইসতেকলালে বাংলাদেশ*, তেহরান: দাফতারে মোতালেয়াতে সিয়াসি ও বাইনাল মিলাল, ১৩৬৫ সৌরবর্ষ।

বাশার, কুলসুম আবুল, *আত্তার ওয়া আসারে উ দার বাঙ্গাগাল*, ইয়াদ বূদে হাফতাদ ওয়া পানজুমিন সালে তা'সীসে বাখসে ফারসি ওয়া উর্দু দার দানেশগাহে দাকা, ঢাকা: বাখশে ফারসি ও উর্দু, ১৯৯৬।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *নজরুল ইসলাম হায়াত আওর কারনামে*, ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০০৬।

নাইনী, এস.এম. আর, *যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার শেব্বে ক্বারেহ হেন্দ ২য় খণ্ড*, ইরান: প্রকাশনায়-মাহমুদ আফসার, তা.বি.

আকরাম, ড. সাইয়েদ মোহাম্মদ, *মাক্বলাতে ফারসি*, লাহোর: ১৯৭১।

কুফী, আলী, *ফাত্হ নামেয়ে সিন্দ*, দিল্লী: ১৯৩৯।

মোস্তাকি, হামদুল্লাহ, *নুযহাতুল কুলূব*, তেহরান: ১৯৫৭।

খোরদায্বে, ইব্ন, *আল মাছালিক আল মামালিক*, লেইডেন: ১৯০৬।

আহমদ, ড. জহুরুদ্দিন, *পাকিস্তান মেয়ানে ফারসি আদাব*, লাহোর: ১৯৬৪।

আহমদ, খাজা নিজামউদ্দিন, *তাবাক্বাত-এ-আকবরী ১ম খণ্ড*, কলকাতা: ১৯২৭-৩১।

আওফি, মোহাম্মদ, *জামেউল হেকায়াত*, ড. মঈন কর্তৃক লিখিত ভূমিকা অংশ, তেহরান: তেহরান বিশ্বদ্যিালয়, ১৯৫৬।

আওফি, মোহাম্মদ, *লুবাবুল আলবাব*, তেহরান: ১৯৫৮।

আমিরী, কেইমারছ, *যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার হেন্দ*, তেহরান: ১৯৯৫।

আনুশেহ্, হাসান (সম্পা.), *দানেশ নামেয়ে আদাবে ফারসি দার শেব্বে ক্বারেহ (হিন্দ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) ২য় অধ্যায়: হে-এইন ৪র্থ খণ্ড*, ইরান: কেতাব খানেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৯৯৬।

নওশাহরভী, আবূ ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান, *নুজহাতুল খাওয়াতির*, লাহোর: ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজ, আরিফ শামস্, *তারিখে ফিরোজশাহী*, জামেয়া উসমানিয়া: ১৯৩৮।

মোহাম্মদ, ড. রিয়াজ, *আহওয়াল ওয়া আশ্আরে মির সাইয়্যেব আলী হামদানী*, ইসলামাবাদ: ইরান-পাকিস্তান পারসিয়ান সেন্টার, ১৯৯১।

রেজাভী, ড. সাইয়্যেদ শিবলী হাসান, *ফারসিগুইয়ানে পাকিস্তান* ১ম খণ্ড, ইসলামাবাদ: ইরান-পাকিস্তান পার্শিয়ান স্টাডিজ, ১৯৭৪।

ইস্ফাহানী, মির্জা মোহাম্মদ তাহের, *তাজকেরায়ে নাসরাবাদী*, তেহরান: ১৯৩৮।

হাফিজ, আবেদা *'তারীখে শাহ শুজাই,'* অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, ১৯৬৮।

আলী, রাহমান, *তাজকেরায়ে ওলামায়ে হেন্দ*, লক্ষ্ণৌ: ১৯১৬।

যানযানি, বারায়াৎ, *আহওয়ার ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, তেহরান: মুআসেসেয়ে এন্তেশারাত ভা চাপে দানেশগাহে তেহরান, ৩য় সংস্করণ ১৩৭২ সৌরবর্ষ ।

শাকিবা, পারভীন, *শে'রে ফারসি আ'য অ'গা'য তা এমরোয*, তেহরান: এন্তেশারাতে হিরমান্দ, ২য় সংস্করণ ১৯৯৪।

শাকিবা, পারভিন, *শেরে ফারসি আয আগায তা এমরুয*, তেহরান: এন্তেশারাতে হীরমান্দ, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ।

উর্দু গ্রন্থাবলি

ময়েজউদ্দীন, মোহাম্মদ, *রাহনুমায়ে সুখান*, ঢাকা: কুরআন মনযিল, তা.বি.

ওলামা, মাওলানা মোহাম্মদ জাকা উল্লাহ শামসুল, *তারিখে হেন্দ প্রথম খণ্ড* (উর্দু), দিল্লী: ১৯০৭।

আবদুল্লাহ, ড. সাইয়েদ, *আদাবিয়্যাতে ফারসি মেয়নে হিন্দু কা হেস্সে*, নয়াদিল্লী: আনজুমানে তারাক্কী উর্দু (হিন্দ), ১৯৯২।

হাই, আবদুল, আহসান, আলী ও শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ, *বাংলা আদবকী তারীখ*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, ১৯৫৭।

নুমানী, আল্লামা শিবলী, *শে'রুল আযম খণ্ড ৫*, লাহোর: আল ফয়সাল, ১৩২৫ হিজরী।

নোমানী, আল্লামা শিবলী, *শেরুল আজম*, আল ফয়সাল, লাহোর, ১৩২৫ হিজরী

রাশেদী, ওফা, *বাঙ্গাল মে উর্দূ*, হায়দারাবাদ: ইশাআতে উর্দূ প্রেস, ১৯৫৫।

বাদাখশানী, মীর্যা মকবুল বেগ, *আদব নামেয়ে ইরান*, লাহোর: এস ডি প্রিন্টার্স, তা.বি.

হাই, আবদুল, আহসান, আলী ও শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ, *বাংলা আদবকী তারীখ*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, ১৯৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গ্রন্থাবলি

আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম (সংকলন), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১।

ইসলামী বিশ্বকোষ ১*ম খন্ড*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

কুশাইরী, আল্লামা কুশাইরী, *রিসালায়ে কুশাইরিয়া*, মিশর।

হুসাইন (র.), মাওলানা মুহাম্মদ, *সাবীলুন নাজাত* ২*য় খন্ড*, ঢাকা: আল এমদাদ প্রেস, তারিখবিহীন।

নোমানী, মাওলানা মনুযুর, *তাসাউফ কাহাকে বলে*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

আফিফী, আবুল আলা, *ফী-তাসাউফিল ইসলামী*, কায়রো: ১৯৬৯, তারিখবিহীন।

হুজবেরী, আলী ইবন উসমান, দাতা গঞ্জেবখশ, *কাশফুল মাহযুব*, ভারত: মাকতাবা থানভী, দেওবন্দ, ইউ, পি. তারিখবিহীন।

ইকবাল, ড. মুহাম্মদ, *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১।

বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ, *পারস্য প্রতিভা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৫।

সাত্তার, আবদুস, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৯।

সাত্তার, আবদুস, *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ*, ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯২।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

চৌধুরী, আবদুল মুকীত, *নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

হোসেন, শেখ তোফাজ্জল, (সম্পা.), *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।

আহমদ (র.), মাওলানা নিসার উদ্দীন, *হাকীকাতু মারিফাতুর রব্বানীয়া*, দিল্লী: ছারছীনা দারুস সুন্নাত প্রেস, তারিখবিহীন।

আহমদ, আলী, (সংক.), *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ২০০৬।

আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ, জালালে আলে, *জালালে আলে আহমদের নির্বাচিত ছোটগল্প*, অনুবাদ-আবদুস সবুর খান, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬।

আ. ন. ম রজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭।

রশিদ, ফকির আবদুর, *সূফী দর্শন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪।

খান, অধ্যাপক দরবেশ আলী, অনূদিত, '*ইসলামের মর্মবাণী*', ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

খান, আবদুস সবুর, *ফারসি উপন্যাসে জীবন ও মানবিকতা*, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৩।

খান, মনজুরুল আলম, *আধুনিক ইরান*, ঢাকা: পঞ্চম প্রকাশ ১৯৯৩।

খান, আবদুস সবুর, *আধনিক ফারসি ছোট গল্প*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

বাংলা পিডিয়া, খণ্ড ৩, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

বাংলা পিডিয়া, খণ্ড ৫ ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

বাংলা পিডিয়া, খণ্ড ৬, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

বাংলা পিডিয়া, খণ্ড ৭ ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

বাংলা পিডিয়া, খণ্ড ৯, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ড* ৩, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩।

ইসলাম, জেহাদুল ও খান, সাইফুল ইসলাম, (অনূদিত), *দিওয়ান-ই-মুইননুদ্দিন*, ঢাকা: খাজা মঞ্জিল, ২০০৩।

ইসলাম, কাজী মো. শহীদুল ও ভূইয়া, মো. আবুল কাসেম, (অনু.), *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

সরকার, মো. আবুল কালাম, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য* ১৯৭১-২০০৫, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫।

সরকার, মো: সোলায়মান আলী, *ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দিন রুমী*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, *লালন শাহের মরমী দর্শন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

রহমান, সাইদুর, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

রহমান, সাঈদ-উর, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, ফজলুর ও আহমদ, নাজির উদ্দীন, *আখসাফে ইসলামী*, রেইনবো প্রিন্টার্স, ১ম সংস্করণ ১৯৬৭।

রহমান, চৌধুরী শামসুর, *সুফিদর্শন*, দিব্য প্রকাশ, ২০০২।

খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

তারাচাঁদ, ড., *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদ-করুনাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

ইউসুফ, মনিরউদ্দীন, *ফেরদৌসীর শাহনামা*, (অনূদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

বেগম, জাহান-আরা, *বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

ফরিদী, আবদুল হক, *মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ*, ঢাকা: বাংলাদেশ একাডেমী, ১৯৮৬।

চৌধুরী, মোমেন (সম্পাদিত), *মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী খণ্ড ১*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

রহিম, এম.এ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১২৭৬ খ্রি.)*, বঙ্গানুবাদ *১ম খণ্ড*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮২।

হক, খন্দকার মুজাম্মিল, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

হক, খোন্দকার রিয়াজুল, *মরমী কবি খোদা বক্শ শাহ: জীবন ও সঙ্গীত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

হক, মুহাম্মদ এনামুল, *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব: বঙ্গীয় মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের এক অধ্যায়*, ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৬।

হক, খোন্দকার রিয়াজুল, *মরমী কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী*, ঢাকা: লালন কেন্দীয় সংসদ, ঢাকা ও বাংলাদেশ মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ১৯৯৩।

হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য সং-৩য়*, ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫।

হক, ছৈয়দ আহমদুল, *বাংলাদেশের সুফী সাহিত্য*, আল্লামা রুমী সোসাইটি, ২০০৭।

শরীফ,আহমদ, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

শরীফ, শরীফ আহমদ, (সম্পা.), *সওয়াল সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য খণ্ড ১*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮।

শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য খণ্ড ২*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮।

কাদির, আব্দুল (সম্পা.) *নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড*, ঢাকা বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনঃমুদ্রণ ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

কাদির, মো. আবদুল, "*সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা*", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, পাকিস্তান: ইসলামাবাদ, আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভারসিটি, ২০০৬।

করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

করিম, আবদুল, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবন ও কর্ম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস: মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*, ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯।

করিম, ফজলুল, *মানবধর্ম ১ম সংখ্যা*, ঢাকা: ১৯৪৩।

রূমী, জালালুদ্দীন, *মসনভী*, কলিকাতা: হিজরী ১৩৩১।

হামিদ, মো: আবদুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অনন্যা প্রকাশনী, ২০০১।

হামিদ, মো: আবদুল *সুফী দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, মনন রা: বি: ১৯৭৩।

আলম, ড. রশিদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা ৮ম সংখ্যা*, বগুড়া: প্রীতি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮১।

মিয়া, ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান (সম্পা.), *মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত সংগ্রাম হুসন*, ঢাকা: জ্যোতি প্রকাশন, ২০০২।

উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর, *ইরানের কবি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৩।

উদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা: হাসি প্রকাশনালয়, ২০০২।

শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, , ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৫ম মুদ্রণ ২০১০।

শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭।

চন্দ্রগুপ্ত, কল্যাণ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ, *ধর্ম-দর্শন*, কলিকাতা: ১৯৮১।

নিযামী, খালীক আহমদ, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, দিল্লী: ১৯৬৩।

হাযারী, মাওলানা আবদুর রাহীম, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, ঢাকা: নবরাণ প্রকাশনী, ১৯৮৮।

নূরী, আবদুল মালেক, *সুফীবাদ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৪।

জামী, আল্লামা, *নাফাহাতুল উন্‌স*, করাচী: মদীনা পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৮২।

আল-কারী, *মাশারেউল উশ্‌শাক*, কনস্টান্টিনোপল: জাওয়ায়েয প্রেস, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা ও বরিশাল: গ্লোব লাইব্রেরী প্রা: লি: ১৯৮৭।

সাইফ, খালিদ, *জালালুদ্দিন রুমি প্রেমের কবিতা*, ঢাকা: বাঙলায়ন, ২০০৮।

ইসহাক, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, *বিশ্ব প্রেমিক রুমী প্রথম খন্ড*, সিফাত প্রকাশনী, ১৯৭৪।

শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা, *মসনবী শরীফ প্রথম খন্ডের প্রথমার্ধ*, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮।

তামীমদারী, ড. আহমাদ, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, অনুবাদ-তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও ঈসা শাহেদী, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭।

বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, ঢাকা: প্রকাশক-ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

সুলতানা, রাজিয়া (সম্পা.), *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

আশরাফী, মোঃ ফজলুর রহমান, *বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা*, আর, আই, এস, পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৯।

হাই, মুহাম্মদ আবদুল, ও আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪।

সুধাকর, চট্টোপাধ্যায়, *অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ* কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বাংলা ১৩৬৮।

সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য*, , ঢাকা: পাকিস্তান বুক করপোরেশন, সংস্করণ ২ ১৯৬৯

আলী, শাহেদ, *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান*, চট্টগ্রাম: জিলা কাউন্সিল বই, ১৯৬৫।

স্বপন, আনিসুর রহমান, *বাংলাদেশে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য*, ঢাকা: বুক ভিউ, ১৯৯৫।

বতুতা, ইব্ন, *সফরনামেহ*, ফারসি অনুবাদ-মোহাম্মদ আলী মোঃ আহ্হেদ ২য় খণ্ড, তেহরান: ১৯৫৮।

হোসাইন, আসগর, *মাওলাভীয়ে মা'নাভী*, সাহারানপুর: ১৯৪৩।

তাফসির ও হাদিসগ্রন্থ

খাযিন, ইমাম আলাউদ্দিন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল বাগদাদী আল, *তাফসীরুল খাযিন ৭ম খন্ড*, মিশর: মাকতাবা তিজারিয়া আর কুবরা, তারিখবিহীন।

বাগদাদী (র.), আবুল ফযল শিহাব-উদ্দীন আল-সাইয়দি মাহমুদ আল-আলুসী আল, *তাফসীরে রূহুল মা'আনী*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

দিমাশ্‌কী (র.), ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর, আল ইমামুল জালাল আল-হাফিয, *দারুল ফিকর ৪র্থ খন্ড*, তারিখবিহীন।

ওয়ালিউদ্দীন, শায়খ, *আল মিশকাতুল মাসাবিহ ইলম পর্ব*, দিল্লী: ভারত, তা. বি.

খাতীব (র.), শাইখ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল (মৃ.৭৩৭ হি.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়া, ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

ইমাম বুখারী (র.), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী (ওফাত ২৫৬ হি. / ৮৭৮খ্রি.), *সহিহ আল-বুখারি*, দিল্লী: কুতুবখানা রাশিদিয়াহ, হিজরী ১৩০৫।

ইমাম তিরমিযি (র.), আল ইমামূল হাফিজ আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে সাওয়াতা ইবনে মূসা ইবনে জাহাকুস সুলামী আত (ওফাত ২৭৯/৮৯৩), *শামায়েলে তিরমিযি*, দিল্লী।

আদাভি, আবু আব্দুল্লাহ মুস্তফা আল, আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (সংক.), অনুবাদ-সানাউল্লাহ নজির আহমদ, ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.), *সহিহ হাদিসে কুদসি*, প্রকাশনী-ইসলাম হাউস ডট কম থেকে সংগৃহীত।

ইংরেজি গ্রন্থাবলি

Ahsan, Sayed Ali, *Songs of Lalon Shah*, Dhaka: Bangla Academy, 1964

Arnold, Sir, *The Legacy of Islam*, Oxford Press, 1st edition, 1965

A.J. Arberry, *Sufism*, London: Geprge Allen And Unwin ltd. 1969.

Arberry, A. J., *Classical Persian Literature*, London: Geprge Allen And Unwin ltd.

Ali, Sayed Amir, `T*he Spirit of Islam'*, Delhi: Kutub Khana-ul-Islam (Regd) Churi Walan.

Armajani, Yahya, *Middle East Past and Present*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood cliffs, 1970.

M. M. Sharif, *Muslim Thoughts: Its Origin and Achievements*, London: 1959.

Hai, Sayed Abdul, *Muslim Philosophy*, Islamic Foundation, 1982.

Nicolson, Dr. R. A, *The idea of personality in Sufism*, London: Cambridge university press, First Edition, 1923.

Nicholson, Dr. R.A, *The Mystics of Islam,* Beirut-Khayats, 1966.

Nicholson, Dr. R.A, *Studies in Islamic Mysticism*, Cambridge, 1967.

Dr. T. J. Deboar, *History of Philosophy in Islam*, London: 1961.

Rahman, Sayedur, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy,* Dacca: Mullick Brothers, 3/1 Banglabazar, 1963.

Dasgupta, S.N., *History of Indian Philosophy vol.1*, Cambridge, 1959.

Iqbal, Dr. Mohammad, '*The Development of Metaphysics in Persia*,' Lahore: Ashaf press, 7 Aibak Road, , 1965.

Smith, M., *History of Mysticism*, 1933

Iqbal, Dr. Mohammad, `*The Reconstruction of Religious Thought in Islam*,' Lahore: Ashraf Press, 7 Aibak Road, , 1965.

Hakim, Khalifa Abdul, *The Metaphysics of Rumi,* Lahore: The Institute of Islamic Culture, 4th impression, 1956.

Chottopadhay, D. P Lokayata, *A Study in Ancient Indian Materalism,* New Delhi: People's Publishing House, *2nd edition*, 1954.

Ikram, S. M. and Spear, P., (ed), *Cultural Heritage of Pakistan*, London: Oxford University Press, 1955.

M.SHOJAKHANI and M.R RIKHTEHGARAN,`*Indo-Iranian Thought: A World Heritage*', Delhi: 1995.

Javadi, S. H.S K. Haj Seyyed, *Dialouge Among Civilization,* New Delhi: 2000.

Sarkar, J. N., *History of Bengal vol. II*, Dacca University, 1948.

Brown, Edward G., *A Literary History of Persia,* Cambridge, 1929.

E. G. Brown, *A literary History of Persia,* Vol. 3, Cambridge: The Cambridge University Press, 1969.

Brown, Edward G., *A Literary History of Persia*, Cambridge, 1956.

Brown, Edward G., *A Literary History of Persia vol.2*, London: Cambridge University Press, 1928.

Brown, E. G., *A literary History of Persia Vol. II,* The Syndics of Cambridge University Press, 1969.

ফারসি প্রবন্ধ

মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার, *পেইভান্দহায়ে মাওজুদ দরমিয়ানে দু'যাবান ফারসি ওয়া বাঙালী*, ইসলামাবাদ: ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩।

বিল্লাহ, আবু মূসা মো. আরিফ, '*ফারসি দর বাংলাদেশ*', রাহ আভারদ, তেহরান: গুজারেশে নাখুস্তিনে মাজমায়ে বাইনাল মিলালী উস্তাদানে যবানে ফারসি ইরান, ১৩৭৬ সৌরবর্ষ।

Dhaka University Institutional Repository

বানু, শামীম, *তারীখচেহ অ'মুযাশে যবানে ফারসি দর বাংলাদেশ ভা মুশকিলাতে কানুনীয়ে অ'ন*, রাহ আভারদ, তেহরান: গুজারিশে নাখুস্তিনে মাজমায়ে বাইনাল মিলালী উস্তাদানে যবানে ফারসি, ১৩৭৬ সৌরবর্ষ।

বিল্লাহ, আবু মূসা মো. আরিফ, '*খিদমাতে দানেশ মান্দানে শিবহে ক্বারেহ বেযাবানে আদাবিয়তে ফারসি*', মাজমুয়ায়ে সুখানরানীহায়ে নাখুস্তীনে সেমিনার পেইওয়াস্তেগীহায়ে ফারহাঙ্গীয়ে ইরান ওয়া শিবহে ক্বারেহ, ইসলামাবাদ: ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩।

তাভাস্সোলী, ড. এম.এম., (সম্পা.), *দানেশ*, প্রবন্ধ, '*ফারসি সারায়ানে হিন্দু দার কাশ্মির*' ড. আসফা যামানী, সিরিয়াল নং ৫০, ইসলামাবাদ: ইরান-পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ পার্শিয়ান স্টাডিজ সেন্টার, ১৯৯৭।

জামেয়ি, আহমদ মাস্জিদ, (সম্পা.), *নামেহে্ পারসি*, প্রবন্ধ, '*পারসি সারায়ানে হিন্দু*' ড. গোলাম আলী আরিয়া, তেহরান: শুরায়ে গোস্তারেসে যাবান ওয়া আদাবিয়্যাতে ফারসি, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪, ২০০১।

আহসান, ড. আব্দুল শাকুর, প্রবন্ধ '*ফারসি সারমায়ে ফারহাঙ্গিয়ে ম' ফারসি দার পাকিস্তান*, লাহোর: ইরান-পাকিস্তান পারসিয়ান সেন্টার, ১৯৭১।

বাংলা প্রবন্ধ

মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার ও খান, মুহাম্মদ আব্দুস সবুর, *ফারসি সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।

আহমদ, ওয়াকিল "*সুফী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*," *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* খণ্ড ৭, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

বিল্লাহ, আবু মূসা মো. আরিফ, বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসি শব্দ অভিধান, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ৩, বাংলা ১৪০২।

স্মারক গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান, ড., (সম্পাদিত), *আন্তর্জাতিক রূমী সম্মেলন' ০৭ স্মারকগ্রন্থ*, আল্লামা রূমী সোসাইটি ঢাকা, ২০০৮।

খান, কে এম সাইফুল ইসলাম, *বাংলা ভাষায় রূমী চর্চা: ছৈয়দ আহমদুল হকের অবদান*, আল্লামা রুমী সোসাইটি ঢাকা, ২০০৪।

বাংলা জার্নাল

জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি জার্নাল

Everyman's Encyclopedia vol. XI, London: 1978.

Journal Echo of Islam, No-197 Tehran, Iran, March-April 2001.

Journal of the Asiatic Society of Pakistan Dacca vol. XIII, No.1, April, 1968.

পত্র-পত্রিকা

দৈনিক সংগ্রাম, প্রিন্ট সংস্করণ, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ সংখ্যা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮০ সংখ্যা।

Web References

https://bn. www.wikipedia.org